ব্যাচেলর অব এডুকেশন

মাধ্যমিক শিক্ষা
Secondary Education

EDBN 1401

রচনা

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া
প্রফেসর ড. এম. এ ওহাব
মোঃ আরিফ হাসান চৌধুরী
ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্
শেখ মোহাম্মদ আলী
মো: সাজ্জাদ হোসেন খান

মূল্যায়ন

প্রফেসর মোঃ আশরাফুল আলম
আব্দুল্লাহ আবু তারেক
ফিরোজা ইয়াসমিন

সম্পাদনা

ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মাধ্যমিক শিক্ষা
EDBN 1401
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0103-8

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ইউনিট ১ : মাধ্যমিক শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ		
ক্রমিক	**শিরোনাম**	**পৃষ্ঠা**
১.১	শিক্ষার স্বরূপ, ব্যাপক ও বিশেষ অর্থে শিক্ষা	০১
১.২	শিক্ষার পরিসর ও ধরন	০৪
১.৩	উপমহাদেশে শিক্ষার বিকাশ ধারা	১০
১.৪	এডাম-এর রিপোর্ট (১৮৩৫)	১১
১.৫	উড-এর ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)	১৪
১.৬	শরীফ কমিশন (১৯৫৯) ও বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)	১৮
১.৭	জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৯৭)	২৩
১.৮	জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০)	২৪
ইউনিট ২: বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি		
২.১	ভাববাদ বা আদর্শবাদ (Idealism)	৩১
২.২	বাস্তববাদ (Realism)	৩৬
২.৩	প্রয়োগবাদ (Pragmitism)	৩৯
২.৪	প্রকৃতিবাদ (Naturalism)	৪৫
ইউনিট ৩: মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ প্রক্রিয়া		
৩.১	বর্ধন-বিকাশ-পরিণমন	৫২
৩.২	বয়ঃসন্ধিকাল ও দৈহিক বিকাশ : শিক্ষার্থীর শারীরিক পরিবর্তন	৫৩
৩.৩	মানসিক বিকাশঃ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব-এরিকসন ও গার্ডনারের তত্ত্ব	৫৫
৩.৪	আগ্রহ ও মনোযোগ,ক্লান্তি ও অবসাদ, শিক্ষার্থীর মানসিক পরিবর্তনে শিক্ষক ও পরিবারের ভূমিকা	৫৮
৩.৫	আবেগিক বিকাশ : আবেগ ও উদ্বিগ্নতা, আবেগ ওঠা-নামা, নিয়ন্ত্রণ কৌশল	৬৪
৩.৬	সামাজিক বিকাশঃ পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, বন্ধু ও স্বজন, বন্ধু নির্বাচন প্রক্রিয়া	৬৫
৩.৭	এলএসবিই (LSBE-Life Skills Based Education), মাদকাসক্তি HIV, AIDS, SRHR (Sex and Reproductive Health Rights) সম্পর্কে সচেতনতা	৬৫
ইউনিট ৪ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম		
৪.১	শিক্ষাক্রমের ধারণা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি	৭১
৪.২	শিক্ষাক্রম প্রনয়ণের যৌক্তিকতা	৭৩
৪.৩	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল	৭৫
৪.৪	জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২: কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৮০
৪.৫	শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন	৮৫

ইউনিট ৫ : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা		
৫.১	বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো	৯০
৫.২	বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা: মৌলিক তথ্যসমূহ	৯২
৫.৩	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoE) ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE)	৯৪
৫.৪	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (EED) এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (DIA)	৯৯
৫.৫	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (BISE)	১০২
৫.৬	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থপনা একাডেমি (NAEM), টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (TTC) ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (HSTTI)	১০৬
৫.৭	বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS), জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ (NTRCA) ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC)	১১৩
৫.৮	জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC) ও শিক্ষা প্রকল্পসমূহ	১২১
ইউনিট ৬ : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা		
৬.১	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিধি-বিধান	১৩০
৬.২	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব	১৪৩
৬.৩	অভিভাবক- শিক্ষক সমিতি	১৪৯
৬.৪	একাডেমিক পরিকল্পনা	১৫৩
ইউনিট ৭ : বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জসমূহ		
৭.১	জেন্ডার ন্যাযতা ও সমতা টেকসইকরণ এবং গ্রামীন ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠি	১৫৯
৭.২	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী	১৬৪
৭.৩	পথশিশু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	১৬৯
৭.৪	ঝড়ে পড়া ও গুণগতশিক্ষা	১৭৪

ইউনিট ১ : মাধ্যমিক শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষাস্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে এবং উচ্চ শিক্ষার পূর্বে যে স্তর তাই মাধ্যমিক স্তর। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ শিক্ষাস্তরের পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত স্তরগুলো হলো- প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর এবং এরপরবর্তী স্তর হলো উচ্চশিক্ষা। শিক্ষাস্তরে এই স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে অনেকের জন্যই এটা প্রান্তিক শিক্ষা (Terminal Education)। ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে (বৌদ্ধিক শিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা,মুসলিম শিক্ষা ও হিন্দু শিক্ষা) নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ আমল হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে তথ্যের আলোকে নিম্নের ৭টি পাঠে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে–

১.১ শিক্ষার স্বরূপ, ব্যাপক ও বিশেষ অর্থে শিক্ষা
১.২ শিক্ষার পরিসর ও ধরন
১.৩ উপমহাদেশে শিক্ষার বিকাশ ধারা
১.৪ এডাম-এর রিপোর্ট (১৮৩৫)
১.৫ উড-এর ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)
১.৬ শরীফ কমিশন (১৯৫৯) ও বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)
১.৭ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৯৭) ও জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০)

১.১ শিক্ষার স্বরূপ, ব্যাপক ও বিশেষ অর্থে শিক্ষা

শিক্ষা(Education)

শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু উদ্ভূত যার অর্থ হলো শাসন, নির্দেশ, আজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, তিরস্কার, শাস্তিদান ইত্যাদি। শিক্ষার অন্য একটি যথার্থ শব্দ হলো 'বিদ্যা'। এটি 'বিদ' ধাতু থেকে এসেছে। 'বিদ' বলতে 'জানা' জ্ঞান আহরণ করাকে বোঝায়। শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Education যা এসেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা সংক্রান্ত ৩টি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা: Educare, Educere ও Educatum.Educare শব্দের অর্থ হলো লালন পালন করা (to bring up), পরিচর্যা করা (to nourish), প্রতিপালন করা (to rear up)। অর্থাৎ শিশুকে আদর-যত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

Educere শব্দের অর্থ হলো, E- মানে মধ্য হতে (out of বা from) এবং 'ducere' মানে বাইরে আনা, বাইরে পরিচালিত করা। সুতরাং Educere শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ হলো ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা (to lead out, to draw out) বা অন্তর্নিহিত শক্তি বা গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। আর Educatum শব্দের অর্থ হলো শিক্ষক বা শিক্ষাদান সংক্রান্ত (Teaching). এ শব্দ তিনটির মধ্যে Educare ও Educatum শব্দ দুটির মধ্যে কিছুটা সংকীর্ণতা রয়েছে। এদিক দিয়ে Educere শব্দটি বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষালাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞানার্জন। এই জ্ঞান অর্জন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই হতে পারে, আবার অনানুষ্ঠানিকভাবে হতে পারে। মানব জন্মের ঊষালগ্ন থেকেই জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া চলে আসছে। প্রাথমিক যুগে মানুষকে খাদ্য, বাসস্থান, দুর্যোগ, বন্যপশুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের বিভিন্ন প্রকার কলাকৌশল, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হত। শিশুরা সাধারণত বয়স্কদের নিকট থেকে এই সমস্ত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করত। এই অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমেই তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ফলে মানব জাতি এখনও টিকে আছে। মানুষের এই সমস্ত অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও এক প্রকার শিক্ষা। নিরক্ষর চাষী চাষাবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ, নিরক্ষর তাঁতী সুন্দরভাবে তার কাপড় বোনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, শ্রমিক বিভিন্ন জিনিস তৈরি সম্পর্কে, শিল্পী বিভিন্ন প্রকার শিল্প নৈপুণ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এরাও এক ধরনের শিক্ষিত। পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াই এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বয়স্ক ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করছে। নিরক্ষর লোকের এ সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় রূপ লাভ করেছে।

শিক্ষার বুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning of Education)

বাংলায় 'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'শাস' ধাতু থেকে। 'শাস' ধাতুর অর্থ হচ্ছে 'শাসন করা' 'নিয়ন্ত্রণ করা', 'নির্দেশ দান করা', 'উপদেশ দান করা', ইত্যাদি। আবার সাধারণভাবে আমরা শিক্ষার সমার্থক শব্দ 'বিদ্যা অর্জন বা আহরণ' শব্দও ব্যবহার করে থাকি। এই বিদ্যা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে। এর অর্থ হচ্ছে জানা বা জ্ঞান আহরণ করা।

আবার শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Education এসেছে লাটিন শব্দ থেকে। ল্যাটিন ভাষায় Education সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়-এডুকেয়ার (Educare), এডুকিরি (Educere) এবং এডুকেটাম (Educatum)।

Education সংক্রান্ত তিনটি শব্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ এডিসনের (Addison) উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, "Education when it works upon a noble mind, draws out to view every latent virtue and perfection, which without such help are never able to make appearance"। অর্থাৎ শিক্ষা যখন মানুষের মনে কাজ করে তখন তার মনের অন্তর্নিহিত প্রদেশ থেকে সমস্ত অব্যক্ত গুণাবলি ও পূর্ণতাকে বের করে আনে। কারণ শিক্ষার সাহায্য ছাড়া এ কাজ কখনও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Education is the manifestation of the perfection already in man" অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাগুলোর প্রকাশ।

শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থ (Narrow and wide meaning of Education)

জন্মের পর থেকেই মানুষের শিক্ষা শুরু হয় এবং আমৃত্যু ব্যাপৃত থাকে। মানুষের জীবনে যে অবিচ্ছিন্ন ও অজস্র অভিজ্ঞতা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে তা থেকে সে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শিক্ষা গ্রহণ করে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হচ্ছে এই বহুমুখী অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কিন্তু বর্তমান সমাজে প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদান করা যায়। এ হচ্ছে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। নিম্নের শিক্ষায় এ দুটি অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক. শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ (Narrow meaning of Education)

প্রাচীনকালে মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এবং জীবন সংগ্রামের জন্য যে সমস্ত কলাকৌশল আয়ত্ত করতো, তাকেই শিক্ষা বলা হয়। মাছ ধরা, শিকার করা, চাষবাস করা, ফলমূল সংগ্রহ করা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা প্রভৃতি কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতা তারা পিতামাতা এবং বয়স্কদের কাছ থেকেই অর্জন করতো। সমাজের বিবর্তনের ফলে এবং সভ্যতার উন্মেষ ও অগ্রগতির সাথে সাথে এসব কলাকৌশল, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানদানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষালাভ করতে শুরু করে। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যালয়ে কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, সমাজে তাদেরকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। আর যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে না, তাদেরকে অশিক্ষিত বলে গণ্য করে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে কোনো বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের সমার্থক। বস্তুত সভ্য সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে ব্যবধান করা হয়, তা শিক্ষার এ সংকীর্ণ ব্যাখ্যাকেই ভিত্তি করা হয়।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সাধারণ কথায় শিক্ষা হচ্ছে বিদ্যালয়ে নির্ধারিত পাঠ্যবিষয়কে অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে এ শিক্ষার সাফল্যের মাপকাঠি নির্ণীত হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। যারা পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সার্টিফিকেট, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা লাভ করে, তারা সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

২. বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হচ্ছে দাতা এবং গ্রহীতার। শিক্ষক বিদ্যা দান করেন, শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করে। এখানে শিক্ষার্থীকে শূন্য পাত্রের মত মনে করা হয়, তার শিক্ষক নিজস্ব জ্ঞানভান্ডার দ্বারা শিক্ষার্থীর শূন্য পাত্র পূর্ণ করে দেন।

৩. শিক্ষার এই ব্যাখ্যায় শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদা ও সামর্থ্যের কোনো মূল্য নেই। সমাজের অভিভাবক শ্রেণি যা চাইবেন, তাই শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব জন্মগত গুণ, বিশেষ প্রবণতা বা কোনো বিষয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগ এ সমস্ত সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না।

৪. শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ থেকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহুবিধ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়া ও সংরক্ষণ করা, অন্যমতে, সামাজিক গুণাবলি অর্জন করা, বা চরিত্র গঠন করা ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি। এ লক্ষ্যগুলো পরিকল্পনার মূলে রয়েছে শিক্ষার স্বরূপ ও কাজ সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করা।

খ. শিক্ষার ব্যাপক অর্থ (Wide meaning of Education)

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে কোনো নতুন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করা বুঝায়। রেমন্ট (Raymont) তাঁর Principles of Education গ্রন্থে বলেছেন, “শিক্ষা হচ্ছে মানুষের শৈশবকাল থেকে পূর্ণবয়স্ক স্তর পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশের একটি প্রক্রিয়া।” এ প্রক্রিয়ায় মানুষ তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাথে সাথে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। শিক্ষাবিদ ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) শিক্ষার ব্যাপক অর্থে বলেছেন, “শিক্ষা হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষাদানের ব্যাপারে সহায়তা করে।” হোয়াইটহেডের (Whitehead) মতে, “শিক্ষার একটি মাত্র বিষয় আছে এবং সেটি হলো সর্বতোভাবে বিকশিত জীবন।” দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, খেলাধুলা, ভাব বিনিময়, আদানপ্রদান, সাফল্য, ব্যর্থতা, হতাশা প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ সততই শিক্ষা লাভ করছে।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা শিশুর জন্ম থেকে শিক্ষা শুরু হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা ব্যাপৃত থাকে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অভিজ্ঞতাময়।

২. শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কারণ শিশুর সকল শিক্ষাই সংঘটিত হয় সামাজিক পরিবেশে, সমাজ বহির্ভূত পরিবেশে কোনো শিক্ষাই সম্ভব নয়।
৩. সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তা-ই শিক্ষা। জীবনের চলার পথে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে জ্ঞান বা কলাকৌশল প্রয়োগ করেসমস্যার সমাধানকরা হয় তা-ই শিক্ষা।
৪. শিক্ষা লক্ষ্য হচ্ছে আচরণগত পরিবর্তন। শিক্ষা মানুষের পুরাতন আচরণকে পরিবর্তন করে নতুন আচরণ আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।

শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের মতামত

শিক্ষা শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। অল্প কথায় এর অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত শিক্ষার এমন কোনো সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা নির্ণীত হয়নি, যা দ্বারা শিক্ষার অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকরা আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতামত তুলে ধরা হলো–

- **সক্রেটিসের মতে,** "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।"
- **দার্শনিক প্লেটোর (Plato)** মতে, শিক্ষা হচ্ছে সেই শক্তি, যার দ্বারা সঠিক সময়ে আনন্দ ও বেদনা অনুভূতিবোধ জন্মায়। এটি শিক্ষার্থীর দেহে-মনে সকল সুন্দর ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করে তোলে (Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment. It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection which he is capable of).
- **দার্শনিক এরিস্টটলের (Aristotle)** মতে, সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা দেহ-মনের সুষম এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও পরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে (Education is the creation of a sound mind in a sound body. It develops man's faculty specially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth. Goodness and beauty in which perfect happiness essentially consists).
- **হেনরিক পেস্টালৎসীর** মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাভাবিক, প্রগতিশীল ও নিয়মানুগ বর্ধন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ (Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate powers).
- **ফ্রেডারিক হার্বার্ট-**এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার ও অনুরাগের সুষম প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।"
- **মহাত্মা গান্ধী বলেন,** "শিক্ষা হলো শিশু ও মানুষের দেহ, মন ও আত্মার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ (By education I mean an all round drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit)।
- **রুশো** মন্তব্য করেন, "আমরা অভাবের মধ্যে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করি। শিক্ষা দ্বারা আমাদের অভাব পূরণ হয়। প্রকৃতি, বস্তু ও মানুষের নিকট হতে আমরা শিক্ষা লাভ করি।"
- **পার্সিনান (P.Nunn)** বলেন, "শিক্ষা হলো শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ যার সাহায্যে সে তার নিজের সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে স্বকীয় অবদান রাখতে পারে (Education is the complete development of the individuality of the child, that he can make original contribution to human life according to the best of his capacity)".
- **ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেল (Friedrarich Froebel)** এর মতে, "সুন্দর, বিশ্বস্ত ও পবিত্র জীবন উপলব্ধিই হলো শিক্ষা।"
- **হোয়াইটহেড (Whitehead)** বলেন, "শিক্ষা হলো জ্ঞান অর্জন এবং তা সুষ্ঠু প্রয়োগের একটি পরিকল্পনা ও কৌশল মাত্র (Education is the acquisition of the art of utilization of knowledge).
- **রাসেল (Russel)** এর মতে, "শিক্ষা হলো কতিপয় মানবিক গুণ যথা: সাহস, উদ্যম, অনুভূতিশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন।
- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabendranath Tagore)** বলেন, "শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না,বরং বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে" (The highest education is that which does not merely give us information's but makes our life in harmony with all existence.)
- **দার্শনিক ইকবাল (Iqbal)** বলেন, "আত্মশক্তির জাগরণই শিক্ষার লক্ষ্য (Education aims at developing innate powers of man)."
- **বেগম রোকেয়া (Rokeya)-** এর মতে, "প্রকৃত সুশিক্ষা তাই যাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত হয়।"

শিক্ষার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা

- Education is a process, the chief goal of which is to bring about desirable changes in the behavior of learner in the form of acquisition of knowledge, proficiency in skills & development of attitudes. অর্থাৎ শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়, দক্ষতার নৈপুণ্য গঠিত হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটে।

শিক্ষার সর্বাধুনিক সংজ্ঞা একদল আমেরিকান শিক্ষাবিদ কর্তৃক ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নিরূপিত হয়েছে। তাঁদের মতে, শিক্ষা এমন এক সুসংবদ্ধ উপায় বা কৌশল যা সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তির সর্ববিধ কর্মক্ষমতা, ধ্যান-ধারণা, রুচি ও স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করে এবং যে পরিবেশে , বিশেষ করে যে স্কুল পরিবেশে সে বাস করে তার মধ্য হতে সামাজিক সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত উন্নতি আনয়ন করে তা-ই শিক্ষা।

কাজেই বলা যায়- শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

১.২ শিক্ষার পরিসর ও ধরন

শিক্ষার পরিসর (Scope of Education)

প্রকৃত অর্থে শিক্ষার পরিধির কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। শিক্ষাকে বর্ণনা করা হয়েছে জীবনের সমার্থক রূপে। এর অর্থ মানুষের সমগ্র জীবনটাই শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত। অতএব বলাযায় মানুষের জীবনের পরিধি যতদূর বিস্তৃত, শিক্ষার পরিধিও ততদূর বিস্তৃত। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা যায়-

১) শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে দার্শনিকদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ণীত হয়ে থাকে।

২) শিক্ষাদান কাজে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি কার্যকর তা নির্ধারণ করা শিক্ষার একটি প্রধান কাজ। শিক্ষা গ্রহণ কতকগুলো মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ণয় করে। শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা বিচারের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য শিশুর আচরণের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হচ্ছে শিক্ষার অন্যতম কাজ।

৩) ব্যক্তির উন্নতির সাথে সাথে সমাজের সংরক্ষণ ও অগ্রগতি সাধনও শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ। তাছাড়া ব্যক্তিকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলাও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৪) শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করাও শিক্ষার একটি কাজ। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য যথাযথভাবে গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ দানও শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

৫) শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনে সহায়তা করা শিক্ষার আরেকটি কাজ। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত আচরণ বাঞ্ছিত পথে পরিচালনা করা এবং কীভাবে সেই আচরণ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক হয়, তা নির্ধারণের জন্য সুপরিচালনা দানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করাও শিক্ষা পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা পরিধির মূল বক্তব্য হল-বাঞ্ছিত আচরণ শিক্ষার্থীর জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করেছে এবং শিক্ষার ফলে তার মানসিক সংগঠনের কতখানি প্রত্যাশিত পরিবর্ত ঘটেছে তা নির্ণয় করা।

শিক্ষার কাজ (Function of Education)

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং প্রয়োজন অনুসারে মানুষ তার অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটায়। পরিবেশ মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষার সাহায্যে মানুষ সেই প্রভাবকে তার কাজে লাগায়, তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবতর্ন সাধনের চেষ্টা করে। নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের উপরও পরিবেশের প্রভাব ক্রিয়াশীল। কিন্তু প্রাণী পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। বিধায় তারা এক ধরনের আচরণে অভ্যস্ত। কারণ তাদের আচরণ পরিচালিত হয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রবৃত্তির (Instinct) দ্বারা এবং সে আচরণ যান্ত্রিক প্রকৃতির এবং অপরিবর্তনীয়। ফলে নতুন পরিবর্তনশীল বা নতুন পরিবেশে নিম্নশ্রেণির প্রাণী একই ধরনের আচরণ করে, নতুন কোনো আচরণ আয়ত্ত করতে পারে না। গতানুগতিক এবং অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত হারায়।

শিক্ষার প্রকারভেদ/ধরন (Types of Education)

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই শিক্ষা। শিক্ষা ও জীবন সমার্থক ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জন্মের পর মানুষের শিক্ষা শুরু হয় এবং আমরণ তা চলতে থাকে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে মানুষ বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশে মানুষ অনেক কিছু অর্জন করে এবং প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন উপায়, কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মূলত শিক্ষা হচ্ছে এ সমস্ত কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ।

জীবন নির্বাহ ও জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম করছে এবং তার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তার ধরন ও প্রকৃতি এক নয়। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা বিজ্ঞানীগণ শিক্ষাকে ৩টি মূলধারায় বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal education)
২. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal education)
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal education)

১. আনুষ্ঠানিক বা নিয়মিত শিক্ষা (Formal education)

যে শিক্ষা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মক্তব, মাদরাসা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বিধিবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রহণ করে তা-ই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কতগুলো পর্যায় বা স্তর আছে। এগুলো নিম্নরূপ-

১. **প্রাথমিক স্তর:** প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এ স্তর অন্তর্ভুক্ত। এ স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স সাধারণতঃ ৬-১০ বছর। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বিকাশ ও উন্নতির চাবিকাঠি এবং ভিত্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা। এই শিক্ষা যত মজবুত ও ফলপ্রসূ হবে পরবর্তী শিক্ষা সে অনুসারে কার্যকরী হবে। এখানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আনন্দ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

২. **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর:** প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায় বা স্তর হলো নিম্ন মাধ্যমিক স্তর। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এই স্তরের সময়/বয়ঃকাঠামো সাধারণ ১১ হতে ১৩ বছর।

৩. **মাধ্যমিক স্তর:** নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী পর্যায় মাধ্যমিক স্তর। নবম ও দশম শ্রেণি এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এ স্তরের সময়/বয়ঃকাঠামো সাধারণত ১৪-১৫ বছর।

৪. **উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা:** মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিএই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের শিক্ষার কাল/ বয়ঃকাঠামো সাধারণত ১৬ হতে ১৭ বছর।

৫. **উচ্চ শিক্ষাস্তর:** উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তর হচ্ছে শিক্ষাস্তর। এখানে দু'টো দিক রয়েছে- স্নাতক পর্যায় (Graduation level) ও স্নাতকোত্তর (Post-graduation level)। স্নাতক পর্যায়ে আবার স্নাতক পাস ও স্নাতক সম্মান এই দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষা কাঠামোকে পূর্ণবিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত শিক্ষাস্তর হলো-

প্রাথমিক স্তর	প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত
মাধ্যমিক স্তর	নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত
উচ্চ শিক্ষাস্তর	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তর হচ্ছে উচ্চ শিক্ষাস্তর

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব ও গুরুত্ব (Influence and Importance of Formal Education)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক ও প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেন, "Man is a social and political animal. A man who is not a member of society he is either God or a beast." অর্থাৎ মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজের সদস্য নয় সে হয় দেবতা না হয় পশু। শিশু বা শিক্ষার্থী বাড়িতে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যা দেখে এবং শিখে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। শিক্ষার্থীর বর্ধন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার্থীরা যে যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে তার উপর নির্ভর করেই পরবর্তী সময় তার জীবন গড়ে উঠে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিক হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। পরবর্তী জীবনের পেশা নির্বাচন বা জীবনের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বা নিয়মিত শিক্ষা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। সুতরাং জীবনকে যথার্থভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal education)

সাধারণত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে যে শিক্ষা ব্যাপক অর্থে তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। মানব শিশু এক হতে পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী খেলার সাথীদের নিকট হতে ও তার পরিবেশ হতে এবং আনুষ্ঠানিক সামাজিক শিক্ষা শেষে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, হাট-বাজার, খেলার মাঠ ও অন্যান্য জায়গায় সামাজিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশ হতে যে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে তা-ই অনানুষ্ঠানিক বা অনিয়মিত শিক্ষা। মানব জীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এর পরিধি ও বিস্তৃতি অনেক সম্প্রসারিত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানব জীবনে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।কারণ প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে মানুষ অনেক শিক্ষা লাভ করে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি

১. শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন।
২. শিক্ষার্থীর কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, চলাফেরা ও আচার-আচরণের উন্নয়ন।
৩. শিক্ষার্থীকে দেখার, শোনার এবং বলার স্বাধীনতাদান যাতে করে সে নিজের ইচ্ছামত প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে।
৪. খেলাধুলার রাজ্যে বিচরণের মাধ্যমে শারীরিক উৎকর্ষতা ও মানসিক পরিতৃপ্তি সাধন।
৫. সুন্দর ব্যবহার, সৌজন্য ও শিষ্টতা অর্জনে সহায়তা করা।
৬. প্রকৃতির সাথে গভীর সান্নিধ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
১. শিক্ষার শিক্ষালয় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	১. এ শিক্ষার শিক্ষালয় হচ্ছে পরিবেশ ও প্রকৃতি।
২. পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান উপকরণ।	২. শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিভিত্তিক নয়।
৩. শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।	৩. শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের তেমন কোনো ভূমিকা নেই।
৪. শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণত নির্ধারিত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়।	৪. শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-Formal education)

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে জীবিকা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে শিক্ষা তাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি সীমিত ও সুনির্দিষ্ট । শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির জন্য এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত এ শিক্ষায় অধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। এ শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। এটি কোনে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নয়। বর্তমানে মানুষের জীবন যেমন যান্ত্রিক ও ব্যস্তময় প্রচীনকালে তেমন ছিল না। প্রাচীনকালের জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামে কৃষক, কামার, কুমার, ধোপা-নাপিত, তাঁতী, গোয়ালা, জেলে, মিস্ত্রি, মুচি প্রভৃতি পেশাজীবী লোক বাস করত। তারা কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এবং কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেনি। তাদের উত্তরসূরীদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে উল্লিখিত পেশায় তারা দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে গণশিক্ষা, সাক্ষরতা শিক্ষা, বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি

- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরা ;
- জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা;
- শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করা;
- পরনির্ভরশীলতার পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা;
- কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়ন;
- জনগণের আয় বৃদ্ধি করা;
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা;
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হওয়ায়অধিকাংশ লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তুদেশে এখনও পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত উন্নত কৃষি ব্যবস্থা চালু হয়নি। ফলে খাদ্য-শস্য উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমন কুটির শিল্প স্থাপন, মাছ চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি পালন ইত্যাদি দ্বারা জনগণকে যদি প্রশিক্ষিত করা যায় তবে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, বেকার সমস্যার সমাধান, সম্পদের সুষ্ঠুব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতি গতিশীল হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত এবং কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থকে দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে তোলা এবং আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জীবন ও জীবিকার উপযোগী এবং আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Education)

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

কোন কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য শিক্ষার যে সাধারণ গন্তব্য বা অভিপ্রায় ব্যাপকভাবে বিবৃত থাকে এবং যার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ফল লাভ হয়, তাকে বলা হয় শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Education)

উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কৃতিত্বের সেই বিন্দু বা লক্ষ্যস্থল যা শিক্ষার লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত কোনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার সমাপ্তি পর্বে অর্জন করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। লক্ষ্য হলো ব্যাপক আর উদ্দেশ্য লক্ষ্যের চেয়ে কিছুটা সংকীর্ণ ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য থেকেই উদ্দেশ্য জন্মলাভ করে। বিদ্যালয় কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব না হলেও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। উদ্দেশ্যের উৎস হলো লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য অর্জন দ্বারা ধাপে ধাপে লক্ষ্য অর্জিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য লক্ষ্য বিভিন্ন হয় না, একই থাকে কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের জন্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে। নিচের চিত্রের সাহায্যে শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান হলো।

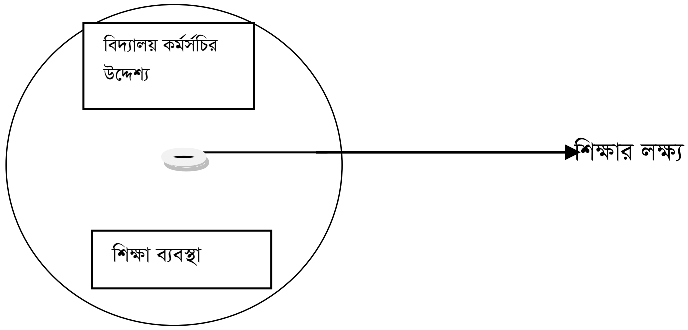

চিত্র ১ : শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

- **জন ডিউই**-র মতে, "শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য"।
- **জেমস্ মিলের** মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তার দ্বারা সে নিজের জীবনকে আনন্দে ভরপুর করে তুলতে পারে এবং অন্যান্য সকলকে তা দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে।"
- **বার্ট্রান্ড রাসেল** বলেছেন, "আদর্শ চরিত্রের মানুষ সৃষ্টি করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য"।
- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের** মতে, "প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাধীনভাবে শরীর চর্চা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যাবলির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার সুষম ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য।"

শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য (Different Aims of Education)

শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ণয় করা যেমন সম্ভব নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাও তেমন সম্ভব। কারণ শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজন, চাহিদা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়ে থাকে। আবার ব্যক্তি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। তবুও সমাজে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনীষীরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বিভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এই লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য (Vocational aims): সমাজ ব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা প্রণালীও জটিল আকার ধারণ করে। ফলে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এজন্য শিশুকে নিজ জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের উপর অধিকাংশ শিক্ষাবিদ এবং অভিভাবক বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে থাকে। তাদের মত হলো, শিক্ষা শুধুমাত্র মানুষের দৈহিক প্রয়োজনই মিটায় না, শিক্ষা তার জীবনের সমগ্র প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে মিল্টন (Milton) বলেছেন,"I call a complete and generous education that which-fits man to perform justly, skilfully and magnanimously all the efforts both public and private of peace and war." শিক্ষাকে বৃত্তিমূখীকরণের ফলে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। যেমন-

১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা মানুষের স্বচ্ছলতা আনয়ণের সহায়ক। স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, মানসিক তৃপ্তি, নৈতিকতাবোধ প্রভৃতি জাগ্রহ হবে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ফলে আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে পারবে এবং সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত হবে।

২) বৃত্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্য মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।ব্যক্তি যদি তার কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়, তাহলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াকে অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক করে তোলে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব চাহিদা, ক্ষমতা, প্রবণতা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ প্রভৃতি সহকারে শিখতে সাহায্য করে।

৩)বৃত্তিমুখী শিক্ষা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য খুবই কার্যকর। কারণ তাদের পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কাজে আসে না। বৃত্তিমূলক শিক্ষা এ ধরনের ব্যক্তির জীবনে নতুন উৎসাহ ও আশা উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে।

৪) জীবন ও জীবিকা এ দুয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তির জীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতা আসে। ব্যতিক্রম হলে সমাজ জীবনে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে নির্ভরশীল হয়ে থাকা এক ধরনের অপরাধ। তাই শিক্ষা জীবন ও জীবিকা-এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ব্যক্তিকে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দান করে।

২. শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য (Individualistic Aims of Education): ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণসত্তা মনে করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব প্রবৃত্তি, আবেগ, প্রবণতা, অনুরাগ, অনুভূতি, রয়েছে যা অপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যক্তির এসব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ সাধনের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। ব্যক্তির মর্যাদা, স্বাধীনতা, চাহিদা, সম্ভাবনা ইত্যাদি শিক্ষার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ব্যক্তির বিকাশ ও পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্টরা ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থক। ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ বা সমাজ নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

৩. শিক্ষার সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য (Socialistic Aims of Education)ঃ সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছাড়া ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না। সমাজেই মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি এবং তার জীবনের পরিসমাপ্তি। সামাজিক মঙ্গল ও সংহতির মধ্যে ব্যক্তির মঙ্গল ও অস্তিত্ব সম্ভব। ব্যক্তি স্বার্থের ওপরে সমাজের স্বার্থ। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির জীবন অসম্ভব। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, নীতিবোধ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবই সামাজিক জীবন যাপনের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে এবং সমাজই ব্যক্তির নিরাপত্তা, শান্তি, জীবিকার্জন প্রভৃতির চাহিদা মিটাতে পারে। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সমাজ কল্যাণের পথে নিয়োজিত থাকা। সমাজতন্ত্রবাদের মতে, শিক্ষা এমন হবে যার দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়। সমাজ উপকৃত হলে ব্যক্তি জীবনেও পরিপূর্ণতা আসবে।

৪. শিক্ষার নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক লক্ষ্য (Moral Aims in Education)ঃ জার্মান শিক্ষাবিদ হার্বাটের মতে, "শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠন (The one and the whole work of education which is a long and complex training may be summed up in the concept morality.) " শিক্ষাবিদ জন লকের মতেও শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। প্লেটোর শিক্ষা চিন্তার মধ্যেও এই ধারণা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, "নৈতিক গুণাবলি বিকাশের পরিপন্থি কোনো কিছু শিক্ষার মধ্যে থাকবে না (Nothing should be admitted education which does not conduct to the promotion of virtue.) "

৫. শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের লক্ষ্য (Complete Living Aims): ইংরেজি দার্শনিক হার্বাট স্পেন্সার পরিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তি তার শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনাগুলোর পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা লাভ করতে পারে। তিনি পরিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য পাঁচটি শিখনীয় বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন-

- শারীরিক রোগব্যাধি হতে মুক্ত থেকে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য শিক্ষা,
- নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা,
- সন্তান-সন্ততি লালন পালনের মাধ্যমে সুখী পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা,
- সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং
- জীবনকে সুখী করার জন্য অবসর বিনোদনমূলক ও সৃষ্টিদর্শী সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শিক্ষা।

সুনাগরিকত্ব এবং জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুখী পারিবারিক জীবনযাপন এবং উপযুক্তভাবে অবসর জীবন যাপন ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু স্পেন্সারের এই মতবাদ নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ফলে তাঁর বক্তব্যকে শিক্ষার একমাত্র বা সম্পূর্ণ লক্ষ্য বলা যায় না।

৬. শিক্ষার সুনাগরিকত্ব অর্জনমূলক লক্ষ্য (Citizenship Aims): সুনাগরিকত্ব অর্জন লক্ষ্যটি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। অধিকার ও কর্তব্য এ দু'য়ের সমন্বয়ে নাগরিকসুলভ গুণাবলির বিকাশ লাভ করে। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকগণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি কল্যাণ সাধনের জন্য সুগারিকের প্রয়োজনীয়তা সর্বকালে স্বীকৃত।

৭. শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য (Spiritual Aims): ভাববাদী বা আদর্শবাদীদের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সাধন। তাঁদের মতে পরলোকই পরম সত্য, জগৎ কিছুই নয়। পৃথিবী ক্ষণিকের জন্য একটি সরাইখানা মাত্র। এখানে স্থায়ীভাবে কেউ থাকে না। কমেনিয়াস বলেছেন, "বিশ্বস্রষ্টার সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত সুখভোগ করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং শিক্ষাকে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হইতে হইবে।" আবার ফ্রোয়েবেলও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। ভারতের দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ রাধাকৃষ্ণের মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি বা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে বুদ্ধির অগম্য যে সত্ত্বা আছে তাকে উপলব্ধি করা (Making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect call it spirit, if you like.)"

৮. শিক্ষার সংগতিবিধানমূলক লক্ষ্য (Adjustment Aims of Education): যে জাতি পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে সংগতিবিধানে সক্ষম হয়েছে, সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে জীবন সংগ্রামের জন্য উপযোগী করে তোলা। এ সম্পর্কে চ্যাপম্যান এবং কাউন্ট বলেছেন, "Education as a social process is nothing more than an economical method of assisting initially an ill-adapted individual, during the short period of a single life to cope with the increasing complexities of the world."পরিবেশ ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। পরিবেশকে মোটমুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়: প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং অন্তর পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে সাধারণত জড়জগতকে বুঝায়, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক পরিবেশ বলতে মানুষ যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে লালিত-পালিত হয় এবং সমাজের বিভিন্ন আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই বুঝায়। মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক আশা আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, প্রয়োজন প্রভৃতি অন্তর পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় বলা যায়, জড় ও প্রকৃতির সঙ্গে সমাজ ও অন্তর সত্তার সংগতি বিধানই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

৯. সুস্থ দেহে সুস্থ মন সৃষ্টিমূলক লক্ষ্য (Sound mind in a sound body aims): প্রাচীন গ্রিসের স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর সুস্থ শরীর গঠনের উপর বিশেষ জোর দেয়া হতো। শারীরিক ব্যায়াম ছিল শিক্ষার প্রদান অঙ্গ। সমসাময়িক এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থায় শরীর গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ ও সৌন্দর্য চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। মোট কথা গ্রিসের শিক্ষাব্যবস্থায় শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। শিশু শিক্ষার এই লক্ষ্যের ত্রুটি দেখা যায়। কারণ শুধুমাত্র শরীর ও মনের উন্নতি সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনের একটা অংশমাত্র। এতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের লক্ষ্য উপেক্ষিত হয়েছে।

১০. শিক্ষার সামাজিক যোগ্যতা অর্জনমূলক লক্ষ্য (Social ability aims): সমাজের মধ্যেই মানব জীবনের পূর্ণতা অর্জিত হয়। সমাজে বসবাস করতে হলে সামাজিক গুণাবলি অর্জন এবং সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সুযোগ্য ব্যক্তি সৃষ্টি করাই শিক্ষার লক্ষ্য। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ব্যাগলে তিনটি প্রধান কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে- আর্থিক যোগ্যতা অর্জন, অপরের কোন কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা, ও তার সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করা। কিন্তু শিক্ষার এই লক্ষ্যটিও অসম্পূর্ণ। কারণ এতে ব্যক্তির নিজের দিকটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বিচার করা হয়েছে।

১১. শিক্ষার বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণমূলক লক্ষ্য (International understanding aims): বিজ্ঞানের বদৌলতে সমগ্র বিশ্বসমাজ আজ এক পরিবারের রূপলাভ করেছে। বর্তমানে যে কোনো দেশের একজন নাগরিক সমগ্র বিশ্বসমাজের একজন নাগরিক। এই লক্ষ্যে ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজন। স্বার্থের সংঘাত যাতে মানুষের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য মানুষের মনে পরস্পরিক সমবেদনা ও সহানুভূতিশীল মনোভাব গঠনের প্রয়োজন। ব্যক্তির মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ ঘটাতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষের মন থেকে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা। ফলে ব্যক্তি যেমন তার মর্যাদা পাবে, তেমনি সমাজ বা জাতি আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এক কল্যাণকর পৃথিবী গড়ার অনুপ্রেরণা পাবে।

১২. শিক্ষার লক্ষ্য আরও শিক্ষা (More Education) : শিক্ষাবিদ জন ডিইইর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত আরও শিক্ষা। কারণ শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, শিক্ষা হচ্ছে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে আরও চলা। শিশুর শিক্ষা প্রক্রিয়া হবে 'আরও বৃদ্ধি পাওয়া' বা 'আরও শেখা'। তিনি বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে বহুমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার লক্ষ্য বলতে এমন কিছু নির্ধারণ করা উচিত নয় যা এই বহুমুখী বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন হয়।"

শিক্ষার লক্ষ্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ (Factors influencing Educational objectives)

শিক্ষা হলো একটি উদ্দেশ্যমুখী সচেতন প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী। এই লক্ষ্যকে পূর্ব থেকেই স্থির করতে হয়, তা না হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে আচরণের কোন তাৎপর্য বা অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। শিক্ষার লক্ষ্যকে স্থির করার সময় নানাদিকে শিক্ষা দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের লক্ষ্য রাখতে হয়। যে সকল উপাদান শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো-

- জাতীয় জীবন দর্শন
- জাতির চাহিদা
- দেশের সামাজিক পরিবেশ
- রাজনৈতিক কাঠামো
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
- শিশুর মনস্তাত্বিক চাহিদা

১.৩ উপমহাদেশে শিক্ষার বিকাশ ধারা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন ১৯৭২ খ্রি.গঠিত হয় যার প্রধান ছিলেন ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। কমিশন দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে তিনখন্ডে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সরকারের নিকট রিপোর্ট জমা দেন। এ সময় উপমহাদেশে শিক্ষা নানারকমভাবে প্রচলিত ছিল। বর্ণনার সুবিধার্থে উপমহাদেশে শিক্ষার বিকাশধারাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. প্রাচীন আমল
খ. মুসলিম শাসনকাল (১০০০-১৭৭৫)
গ. ব্রিটিশ শাসনকাল (১৭৫৭-১৯৪৭)
ঘ. পাকিস্তান শাসনকাল (১৯৪৭-১৯৭১)
ঙ. বাংলাদেশ শাসনামল (১৯৭১-বতর্মান)

ক. প্রাচীন আমলের শিক্ষা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম ও বৃটিশ শাসন শুরুর পূর্বেই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সমাজের চাহিদানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তবে তা বর্তমান সময়ের মতো আনুষ্ঠানিক ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমভিত্তিক ছিল না। প্রাচীন আমলের শিক্ষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. আর্য আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা
২. ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা
৩. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা

খ. মুসলিম শাসনকাল (১০০০-১৭৭৫)

উপমহাদেশে মুসলিম শাসকগণ দীর্ঘদিন শাসন পরিচালনা করেন। সপ্তম শতকে সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করে মুহাম্মদ বিন কাসিম উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সুলতান ও শাসকগণ শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এসময়ে শিক্ষা ছিল মসজিদ ও মক্তবভিত্তিক। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শাসনকাল কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. গজনীর সুলতানগণ (১০০০-১২০৬)
২. তুর্কী সুলতানগণ (১২০৬-১২৯০)
৩. খিলজীবংশের সুলতানগণ (১২৯০-১৪৫১)
৪. লোদী বংশের সুলতানগণ (১৪৫১-১৫২৬)
৫. বাংলার স্বাধীন নবাব/শাহী সুলতানগণ (১৫২৬-১৭৫৭)

গ. ব্রিটিশ শাসনকাল (১৭৫৭-১৯৪৭)

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়। এসময়ে উপমহাদেশে বৃটিশ ভাবধারার শিক্ষা প্রচলিত হয় এবং শিক্ষা বিষয়ক নানা আইন-বিধি, কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন
২. ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের এডামস্ রিপোর্ট
৩. ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচ

৪. ১৮৫৯ সালের ডেসপ্যাচ
৫. মিশনারীদের শিক্ষামূলক কর্মকান্ড
৬. ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের হান্টার কমিশন
৭. ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার
৮. ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের স্যাডলার কমিশন
৯. ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সার্জেন্ট পরিকল্পনা

ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে উপমহাদেশের শিক্ষা অনেকটা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী অবকাঠামো তৈরি, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাক্রম তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম চলে।

ঘ. পাকিস্তান শাসনকাল (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সময় মাত্র ২৪ বৎসর হলেও এ সময় বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। যথা-

১. আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিশন- ১৯৫১
২. আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন- ১৯৫৭
৩. শরীফ কমিশন- ১৯৫৯

ঙ. বাংলাদেশ আমলের শিক্ষা কমিশন (১৯৭১- বর্তমান)

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের মাত্র এক বছরের মধ্যেই ১৯৭২খ্রিস্টাব্দের ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৭৪ সালে কমিশন ৩ খন্ডে রিপোর্ট প্রদান করে। পরর্তীতে আরো কয়েকটি কমিটি ও কমিশন গঠিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রকাশিত হয় ।বাংলাদেশ আমলের শিক্ষা কমিশনগুলো হলো-

১. ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)
২. মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮)
৩. শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৮)
৪. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন (২০০০)
৫. বারী শিক্ষা কমিশন (২০০২)
৬. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

এভাবেই উপমহাদেশে শিক্ষার বিকাশ ধারা চলে।

১.৪ উইলিয়াম এ্যাডাম-এর রিপোর্ট (১৮৩৫)

ভারতীয় উপমহাদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এ শিক্ষা দেশের প্রচলিত ধর্ম, রীতি-নীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, আবহাওয়া ও মানুষের চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এদেশের মানুষ দ্বারাই এ শিক্ষা পরিচালিত হতো। বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশের মাটিতে দেশি ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও লালিত এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশীয় শিক্ষা বা Indigenous Education বলা হয়। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক এদেশের শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি স্কটল্যান্ডবাসী মিশনারী শিক্ষাবিদ উইলিয়াম এ্যাডামকে বাংলা ও বিহার প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জরিপ করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য নিয়োগ করেন। উইলিয়াম এ্যাডাম ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা জরিপ করে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন যা ইতিহাসে **এ্যাডাম রিপোর্ট** নামে খ্যাত।

এ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট

নিয়োগ প্রাপ্তির পর এ্যাডাম শিক্ষা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী দলিলপত্র ও রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তাঁর প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন।

এ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট

রাজশাহী জেলার নাটোর থানার দেশীয় শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর এ্যাডাম তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। এ্যাডাম রাজশাহী জেলার নাটোর থানাকে তাঁর ঐতিহাসিক সার্ভের প্রথম স্থান হিসাবে নির্বাচন করেন। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে তদানীন্তন সময়ের দেশীয় শিক্ষার স্বরূপ, তার ব্যাপকতা, পাঠদানের বিষয়বস্তু, পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি চার প্রকারের তথ্য সংগ্রহ ফরম প্রণয়ন করেন। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এ্যাডাম প্রণয়নকৃত তথ্য সংগ্রহ ফরমের নমুনা নিচে দেয়া হলো-

তথ্য সংগ্রহ ছক-১

গ্রাম নম্বর ও গ্রামের নাম	গ্রামের পরিবার সংখ্যা		১৪ বছর উর্ধ্ব জনসংখ্যা		৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা		৫ বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা		দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা		পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		দেশীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করেন এমন লোকের সংখ্যা		যারা দেশীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করেন
	হিন্দু	মুসলিম	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	হিন্দু	মুসলিম	হিন্দু	মুসলিম	হিন্দু	মুসলিম	

তথ্য সংগ্রহ ছক-২

তথ্য ছক-১ অনুসারে গ্রামের সংখ্যা	শিক্ষকের নাম, বর্ণ ও বয়স	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ভর্তির বয়স	বিদ্যালয় ত্যাগের বয়স	পাঠদানের ভাষা	পাঠদানের বিষয়বস্তু	বিদ্যালয় গৃহের বিবরণ	শিক্ষকের সম্মানী ভাতা

তিনি অনুরূপ আরও দু'টি তথ্য সংগ্রহ ছক প্রণয়ন করেন। ছক প্রণয়নের পর তা ব্যবহার করে নাটোর থানাধীন সকল গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে এ্যাডাম নিজেই তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে স্থির করেন এবং তিনি পরপর কয়েকদিন কয়েকটি গ্রামে গমন করেন। কিন্তু গ্রামের লোকজন ইউরোপীয় ধর্ম যাজকের উপস্থিতি দেখে কোন তথ্য না দিয়ে গ্রাম থেকে সরে পড়েন। কারণ গ্রামের লোকজনের ধারণা ছিল-অন্যান্য ধর্ম যাজকদের ন্যায় তিনিও তাদের ধর্মান্তরিত করতে পারেন। তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে এ্যাডাম এ কাজে সহযোগিতার জন্য মুসলমান মৌলভী ও হিন্দু পন্ডিত নিয়োগ করেন। এভাবে স্থানীয় মৌলভী ও হিন্দু পন্ডিতের সহযোগিতায় পূর্ণাংগ তথ্য সংগ্রহ করে এ্যাডাম শুধু নাটোর থানার দেশীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করেন।

এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট

নাটোর থানার জরিপ কাজ শেষ করে এ্যাডাম মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মেদেনীপুর, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহাট জেলায় জরিপ কার্য পরিচালনা করেন। এভাবে তদানীন্তন বাংলা ও বিহারের সাতটি জেলায় দেশীয় শিক্ষার উপর বিস্তারিতভাবে জরিপকার্য পরিচালনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮এপ্রিল এ্যাডাম তাঁর তৃতীয় রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। এসব রিপোর্টে তিনি প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেশীয় শিক্ষার সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন এবং এর সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেন।

এ্যাডামের রিপোর্ট অনুসারে দেশীয় শিক্ষার ব্যাপকতা ও সার্বিক অবস্থা

এ্যাডামের রিপোর্ট অনুযায়ী তদানীন্তন বাংলা ও বিহার প্রদেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি, গ্রামের সংখ্যা ছিল ১,৫০,৭৪৮ এবং দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০। এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গড়ে প্রতি তিনটি গ্রামে ২টি দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। আবার ৪ কোটি লোকের জন্য ১,০০,০০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে প্রতি ৪,০০ জন লোকের জন্য একটি করে প্রতিষ্ঠান ছিল। এ্যাডাম ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের স্কুল গমণোপযোগী শিশু হিসাবে গণ্য করেছেন এবং প্রতি ৪,০০ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ছিল ৬৩ জন। অর্থাৎ প্রতি ৬৩ জন বালক-বালিকার জন্য একটি করে বিদ্যালয়। কিন্তু তদানীন্তন সময়ে সাধারণত মেয়েরা স্কুলে যেত না। অতএব, ৬৩ জনের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে হলে গড়ে প্রতি ৩২ জন বালকের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। প্রাপ্ত এ তথ্য থেকে প্রায় দু'শত বছর পূর্বে এ দেশে দেশীয় শিক্ষার

ব্যাপকতা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের বর্তমান সময়েও প্রতি গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় অথবা ৬৩ জন বালক-বালিকার জন্য একটি করে বিদ্যালয় অথবা প্রতি ৪০০ লোকের জন্য একটি করে বিদ্যালয় এর কোনটিই আমরা ভাবতে পারিনা।

বিদ্যালয় বলতে এ্যাডাম যা বোঝাতে চেয়েছেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ধারণা থেকে তা আলাদা। বর্তমানে বিদ্যালয় বলতে আমাদের সামনে ভেসে উঠে কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট কাঁচা/পাকা ঘর, শিক্ষকের জন্য ঘর, শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, বোর্ড, চক-ডাস্টার ইত্যাদি। কিন্তু দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে এ্যাডাম বোঝাতে চেয়েছে যেখানে কতিপয় শিক্ষার্থী ও একজন শিক্ষক উপস্থিত হয়ে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ কার্যক্রম চলত। গ্রামের কোন একটি বাড়ির একটি কক্ষ, বৈঠকখানা, হিন্দুদের চন্ডীমন্ডব বা পূজা অর্চনার ঘর, মসজিদের বারান্দা এবং গাছের নিচে স্কুল বসত। কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্ত আকাশের নিচেও স্কুল বসত।

দেশীয় শিক্ষার স্তর

এসব বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন নির্ধারিত সময় ছিলনা। শিশু শিক্ষার্থী বছরের যে কোন সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত এবং বছরের যে কোন সময়ে পাঠ শেষ করে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারত। বর্তমান সময়ের মত দেশীয় শিক্ষার জন্য কোন নির্ধারিত পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যপুস্তক ছিলনা। শিক্ষক মুখে মুখে পাঠদান করতেন। বর্তমান সময়ের মত তখনকার সময়ে কোন শ্রেণি ভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থা ছিলনা।

লেখার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা চারটি স্তরে বিন্যস্ত ছিল। স্তরগুলো হলো-

- মাটির উপর লেখা: শিক্ষক বিদ্যালয়ের সামনে মাটিতে বড় বড় করে অক্ষর একে রাখতেন। কোন নতুন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এলে তাকে প্রথম ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত শিক্ষকের আঁকা অক্ষরের উপর মাটিতে হাত ঘুরাতে হতো। এতে হাতের মাংসপেশী এমন ভাবে শিক্ষার্থীর আয়ত্বে আসত যাতে ভবিষ্যতে তার হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর হতো।
- কলাপাতার উপর লেখা: শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর ছিল কলাপাতার উপর লেখা। শিক্ষার্থী বাঁশের চিকন কঞ্চি দিয়ে কলম তৈরি করতো এবং কয়লা বা হরিতকি পুড়িয়ে কালি তৈরি করে তা দিয়ে কলা পাতার উপর লিখত।
- তালপাতায় লেখা: শিক্ষার তৃতীয় স্তর ছিল তালপাতায় লেখা।
- কাগজের উপর লেখা: শিক্ষার সর্বশেষ স্তর ছিল কাগজের উপর লেখা।

পাঠের বিষয়বস্তু ও পাঠদান পদ্ধতি

লেখার সাথে সাথে পড়ার উপরও গুরুত্ব দেয়া হতো। তবে এসব বিদ্যালয়ে কোন ছাপানো বই ছিলনা। এমনকি শিক্ষক হাতে লেখা ম্যানিস্ক্রিপ্টও ব্যবহার করতেন না। শিক্ষক মুখে মুখে পাঠদান করতেন। এ্যাডাম তার বর্ণনায় বলেছেন- শিক্ষাথীরা দিনের কোন এক নির্ধারিত সময়ে বিদ্যালয়ের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতো। একজন বুদ্ধিমান জ্যেষ্ঠ্য বালক সামনে দাঁড়িয়ে ছন্দের আকারে গুণের নামতা আবৃত্তি করতো এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা গানের আকারে তা একসাথে আবৃত্তিকরতো। এভাবে ১ থেকে ২০ ঘর পর্যন্ত গুণের নামতা শিক্ষার্থীরা ছন্দের আকারে মুখস্থ করতো। এছাড়া গ্রামীণ কৃষক পরিবারের চাহিদা অনুসারে জমির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বিঘাকালি, কাঠাকালির নামতা, ওজন সংশ্লিষ্ট মণ, সের, ছটাক, কড়া, গন্ডার নামতা, শ্রমিকের বেতন পরিশোধ সংক্রান্ত দিন অনুযায়ী বেতন পরিশোধের নামতা ইত্যাদি সবই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শিক্ষার্থী প্রতিদিন তা ছন্দ আকারে মুখস্থ করতো।

দেশীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

প্রায় দুইশত বছর পূর্বে আমাদের এ অঞ্চলে যে দেশীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল তার ব্যাপকতা, পাঠদানের বিষয়বস্তু, অনুসৃত পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষক ও তার সম্মানী বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তাতি বিবরণ এ্যাডাম রিপোর্টে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। লক্ষ্যণীয় যে, এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে কোন বেতন দিতে হতো না এবং শিক্ষকও কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। তবে পাঠশেষে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষককে উপঢৌকণ দিত এবং শিক্ষক তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। এসব বিদ্যালয় মাত্র একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হতো। শ্রেণির বুদ্ধিমান বয়োঃজ্যেষ্ঠ্য শিক্ষার্থী শিক্ষককে পাঠদান কাজে সহযোগিতা করতো যা এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ‘সর্দার পড়ো’ প্রথা বা Monitorial System নামে খ্যাত।

এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে বই, খাতা, কাগজ, কলম ইত্যাদি বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করতে হতো না। কারণ মাটির উপর লেখা, কলাপাতা, তালপাতায় লেখা, নিজেদের তৈরি কলম ও কালি ব্যবহার করে লেখা,এর কোনটিতেই অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন ছিলনা। এ শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামীণ কৃষক পরিবারের চাহিদার উপর ভিত্তি করে পাঠের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হতো। দেশের মাটি ও মানুষের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, দেশের আবহাওয়া, ঋতু বৈচিত্র্য, সামাজিক চাহিদা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্মীয় আচার আচরণ ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। সম্পূর্ণ দেশীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এ শিক্ষা কার্যক্রম তৎকালীন সমাজ ও মানুষের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সক্ষম ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

এ্যাডাম এদেশের দেশীয় শিক্ষার ব্যাপকতা, তার বৈশিষ্ট্য, পাঠদান পদ্ধতি ও এদেশে আবিস্কৃত ‘সর্দার পড়ো’ পদ্ধতি ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু

পরবর্তীকালে তার সুপারিশ কার্যকর হয়নি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় শিক্ষা সম্পর্কে সব সময়েই অত্যন্ত বৈরি মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁদের মতে æIndian indigenous education has no potentialities and it should be replaced by modern western education” অর্থাৎ ভারতে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা প্রাণশক্তিহীন এবং এক অকেজো শিক্ষা। এ শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে তদস্থলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করতে তারা সচেষ্ট ছিলেন। লর্ড ম্যাকুলে (Lord Macaulay) কর্তৃক গৃহীত শিক্ষায় নিম্নগামী পরিশ্রবণ নীতি অনুসরণ, বেন্টিকের শিক্ষা সংস্কার নীতি, উডের ডেসপ্যাচ, মূলতঃ তারই প্রতিফলন। এসব নীতির মাধ্যমে ঔপনৈবেশিক সরকার এদেশের মাটি থেকে দেশীয় শিক্ষাকে মুছে ফেলে তদস্থলে সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়া, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের উপর চাপিয়ে দেয়। আর এ ধরনের সিদ্ধান্তই এদেশের সত্যিকার শিক্ষার পথে অনেকটা বিপত্তির কারণ বলে ধারণা করা হয়।

১.৫ উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

ভারতবর্ষের শিক্ষা ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের উডের শিক্ষা দলিল (Wood Education Despatch)। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার কর্তৃক এ দলিল প্রণয়নের পটভূমি হলো ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার প্রতি ২০ বছর অন্তর বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে তা নবায়ন করা হতো। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর চার্টার নবায়নকালে ভারতের শিক্ষার নীতি হিসাবে নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি বা Downward Filtration Theory গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতিতে সাধারণ ভারতবাসীর শিক্ষাকে উপেক্ষা করে অভিজাত শ্রেণির কতিপয় ব্রাহ্মণ ও মুসলমান পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানীর চার্টার নবায়নকালে দেশীয় শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য উইলিয়াম এ্যাডাম দেশীয় শিক্ষার উপর জরিপ করে রিপোর্ট প্রদান করেন যা ইতিহাসে এ্যাডাম রিপোর্ট হিসাবে খ্যাত। অনুরূপভাবে ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানীর চার্টার নবায়নকালে বৃটিশ পার্লামেন্টারি কমিটি ভারতবর্ষের শিক্ষার উপর বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করে Committee of the House of Commons-এর নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। এছাড়াও ভারতের শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মিশনারী শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ,যেমন-Sir Trevelyan, J.C Marshman, Dr.Alexander Duff, Sir Erskin Perry,C.H.Cameron, H.H. Wilson, Sir Fredric Halliday প্রমূখ Committee of Lordsএবং Committee of the Commons-এর নিকট ভারতীয় শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। এ সকল রিপোর্ট ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের উডের শিক্ষা দলিল রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন অফিস সেক্রেটারি John Stuart Mill এই বিখ্যাত দলিল রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তদানীন্তন সময়ের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোল এর সভাপতি Sir Charles Woodএর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা অনুসারে এ দলিল প্রণীত হয়েছিল বিধায় তাঁর নাম অনুসারে এ দলিলের নামকরণ করা হয় *উড এডুকেশন ডেসপ্যাচ* (Wood Education Despatch, 1854)। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহনকারী ১৮৫৪ সালের উড এডুকেশন ডেসপ্যাচকে এর সূদুর প্রসারী ফলাফলের কথা চিন্তা করে কোন কোন ইতিহাসবিদ এ দলিলকে ভারতীয় শিক্ষার *Magna Charta বা মুক্তি সনদ* হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এ দলিলটি ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনও সম্প্রসারণে উডের ডেসপ্যাচ ছিল ভিত্তি স্বরূপ।

ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য

উডের শিক্ষা দলিলের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে ভারতীয়দের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ–

(a) æTo confer upon the natives of India those vast and material blessings which flow from the general diffusion of western knowledge.

(b) æTo produce not only a high degree of intellectual fitness but also to raise the moral character of those who partake of it.

(c) æTo supply the East-India Company with the reliable and capable public servants.

(d) æTo secure for England a large and more certain supply of many articles, necessary for her manufactures and extensively consumed by her population as well as an almost inexhaustible demand for produce of British labour”.

উড ডেসপ্যাচে উল্লিখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিলনা, বরং ঔপনিবেশিক সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ভারতের মত একটি বিশাল জনবহুল দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বহুসংখ্যক নিম্ন বেতনভুক দক্ষ রাজ কর্মচারীরর প্রয়োজন হয় যা ইংল্যান্ড থেকে আনা সম্ভব নয়। সস্তায় নিম্ন বেতনভুক রাজ কর্মচারী যেমন-কেরানী, পিয়ন, ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার ভারতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে ইংল্যান্ডের টিকে থাকা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এসময়ে ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানা উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অনেকাংশে হ্রাস পায়। বাধ্য হয়ে বেশ কিছু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। শুরু হয় শ্রমিক অসন্তোষ ও শ্রমিক আন্দোলন। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য প্রয়োজন হয় বাইরের বাজার যেখানে সহজে ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রি বিক্রি করা যায়। এর সমাধান হিসাবে বৃটিশ সরকার বেছে নেয় ভারতকে। ভারত কাঁচামাল

সমৃদ্ধ একটি বিশাল জনবহুল দেশ। ভারত থেকে অতি সহজে ও সস্তায় কাঁচামাল ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া এবং এ কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে ভারতে বিক্রি করা বৃটিশ সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কাঁচামাল সহজে ও সস্তায় পরিবহনের জন্য প্রয়োজন হয় স্বল্প শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিকের আর এজন্য বৃটিশ সরকার শিক্ষা কার্যক্রমকে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে বেছে নেয়। ভারতের ন্যায় একটি বিশাল জনবহুল দেশের সাধারণ জনসাধারণকে সামান্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তাদের রুচির পরিবর্তন হবে এবং শিল্প কারখানায় উৎপাদিত সৌখিন দ্রব্য সামগ্রি ব্যবহারের দিকে তারা ঝুকে পড়বে। এভাবে ভারত ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রি বিক্রয়ের একটি প্রধান মার্কেটে পরিণত হবে- এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করে। মোট কথা ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের শিক্ষা উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূললক্ষ্য ছিল-

- নিম্ন পদে নিয়োগের জন্য দক্ষ রাজ কর্মচারী সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য ভারত থেকে সহজে ও সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা লক্ষ্যে অল্প শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করা;
- শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের রুচির পরিবর্তন করা যেন তারা ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত সৌখিন শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে।
- এভাবে ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একটি নিশ্চিত মার্কেটে পরিণত করা।

শিক্ষার মাধ্যম

উডের ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে বৃটিশ সরকার ভারতের দেশীয় শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বাহক হিসাবে একমাত্র ইংরেজি ভাষাকেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু উডের ডেসপ্যাচে সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তরণের জন্য ইংরেজির পাশাপাশি দেশীয় ভার্ণাকুলার ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। উডের ডেসপ্যাচে বলা হয়–

æIn any general system education, the English language should be taught where there is a demand for it; but such instruction should always be combined with a careful attention to the study of the vernacular language of the district, and with such general instruction as can be conveyed through that language and while English language continues to be made use of as by far the most perfect medium for the education of those persons who have acquired a sufficient knowledge of it to receive general instruction through it, the vernacular languages must be employed to teach the far larger classes who are ignorant of, or imperfectly acquainted with English"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একথা সত্য যে, যদিও উডের ডেসপ্যাচে ইংরেজির পাশাপাশি ভার্ণাকুলার ল্যাংগুয়েজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বরাবরের মতই গণমানুষের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।

উড ডেসপ্যাচে উল্লিখিত প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ

১। ভারতবর্ষে স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন (Establishment of a Network of Graded System of Education all over India): ভারতবর্ষে এই প্রথম স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য উড-ডেসপ্যাচে সুপারিশ করা হয়েছে। স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে শিক্ষাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা যা ইংরেজি ও আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত এবং শিক্ষার সর্বনিম্ন বা প্রথম স্তর হল দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা। উড ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের শিক্ষাকে সরকার অস্বীকার করে সমাজের শুধুমাত্র উঁচুস্তরের লোকের সন্তানদের শিক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল এবং এজন্য দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপনে সরকার অধিক মনোযোগী ছিল। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষার এ নীতি নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি (Download Filtration Theory)নামে খ্যাত। ডেসপ্যাচে এখন থেকে সরকারকে ভারতের সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য অধিক মনোযোগী হতে বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য তিন ধরনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যথা-

(ক) ইংরেজি ও আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পাঠদানের জন্য অধিক সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা;
(খ) গ্রান্ট-ইন-এইড বা অনুদানের মাধ্যমে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা;
(গ) শিক্ষার সকল স্তরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য Scholarship বা বৃত্তি প্রদান করা এবং তিনস্তরের শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

২। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগ গঠন (Creation of Department of Public Instruction in India): এ দলিলে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে ভারতবর্ষে স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পূর্বের প্রাদেশিক শিক্ষাবোর্ড বা কাউন্সিল বিলুপ্ত করে তদস্থলে ভারতের পাঁচটি প্রদেশ বেঙ্গল, বোম্বে, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যেকটিতে প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগ পরিচালনার জন্য একজন

জনশিক্ষা পরিচালক বা Director of Public Instruction (DPI) নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। জনশিক্ষা পরিচালকের অধীনে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক থাকবে যারা নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

উড-ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুসারে **১৮৫৫-১৮৫৬** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেঙ্গলসহ ভারতের পাঁচটি প্রদেশে প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়। প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল-

(a) To advise the provincial Government on all educational matters;
(b) To administer the funds allocated to education by the provinicial and central government;
(c) To supervise and inspect the working of private educational institutions which applied to the department for æGrants in Aid";
(d) To compile annual reports on the progress of education within their jurisdiction along with the necessary statistics and to publish them ; and
(e) To take all such steps as were necessary to improve and expand education"

৩। ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রান্ট-ইন প্রথা প্রবর্তন (Institution of the system of Grant in Aid in Education)**:** ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য উড-ডেসপ্যাচে Grant in Aid System বা অনুদান প্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনুদান প্রদানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল- ভারতে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যখন যথেষ্ট হারে বৃদ্ধিপাবে এবং এসকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যখন মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সক্ষম হবে, তখন ক্রমান্বয়ে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কার্যক্রম থেকে সরকার নিজেদের গুটিয়ে নেবে এবং শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া হবে। উড-ডেসপ্যাচের এ উদ্যোগ ভারতবর্ষে আদৌ কার্যকর হয়নি এবং সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে নিজেদের কখনও গুটিয়ে নেয়নি, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উড-ডেসপ্যাচ পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। অনুদান প্রদানের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে–

ক) অনুদান হিসাবে প্রদেয় অর্থের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল ছিল;
খ) অনুদানের অর্থ সময়মত ছাড় করা হতো না;
গ) কোন কারণ না দেখিয়ে হঠাৎ করেই প্রতিষ্ঠানকে অনুদানের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হতো;
ঘ) অনুদান প্রাপ্তির জন্য কঠিন শর্ত পালন করতে হতো যা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের জন্য পালন করা সম্ভব হতো না;
ঙ) অনুদানের শর্তসমূহ জটিল ছিল যা জনগণের কাছে বোধগম্য ছিলনা;
চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে হঠাৎ করেই অনুদানের শর্তসমূহ পরিবর্তন করা হতো। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতো;
ছ) বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মোটেও সহানুভূতিশীল ছিলেন না;
জ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে পরীক্ষক হিসাবে নির্বাচন করা হতো না;
ঝ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি শুধুমাত্র সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভারতবর্ষে তিন ধরণের অনুদান প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। যথা-

- Salary grant system বা শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত অনুদান: যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক পর্যায়ের দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করতো এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মান অনুযায়ী পরিচালিত হতো, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের বেতনের কিয়দাংশ অনুদান হিসাবে প্রদান করা;
- Foundation of Scholarships বা Payment by Result System:শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা;
- Fixed Grant System বা বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা।

অনুদান প্রাপ্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিম্নরূপ বিষয় মেনে চলতে হতো-

(a) Impart of a good secular education;
(b) Adequate local management by private patrons, voluntary subscribers or trustees of endoments, willing to superintend the school and ensure its permanence for a given time.
(c) Agree to submit to inspection by government officers and to abide by such other conditions as may be prescribed.
(d) Levy a fee, however small, from the pupil.

৪। ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (Establishment of Universities in India**):** উড ডেসপ্যাচে তদানীন্তন সময়ের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উডের ডেসপ্যাচে উল্লেখ করা হয়েছে-

æUniversities should be extablished at Calcutta and Bombay and at Madras or any part of India, where a sufficient number of institutions exist from which properly qualified candidates for degrees could be supplied. All these universities in India were to be constituted on the model of London University, London at that date a purely examining body which admitted to its tests only the students trained in affiliated college".

উডের ডেসপ্যাচের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি Affiliating University বা অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় এবং একই বছরে বোম্বে ও মাদ্রাজেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করছে, আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ ভূমিকা পালত করত।

æThe function of the universities of India was conferring degrees upon the persons, who having entered as candidates according to the rules fixed in this respect and produced certificates of conduct and the pursuit of a regular course of study for a given time from the institution affiliated to the university, succeeded in passing at the university such an examination as might be required. This type of university organisation that was created by University Act of 1857 is known as the affiliating university."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন Teaching faculty, পাঠদানের জন্য কোন শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, আধুনিক গবেষণার জন্য জার্নাল, ম্যাগাজিন, রেফারেন্স পুস্তকাদি ইত্যাদি কোনটিই ছিলনা। এর মূল দায়িত্ব ছিল স্কুল ও কলেজকে স্বীকৃতি প্রদান করা, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন করা, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার আয়োজন করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা।

১৮৫৭ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পাঠদানের ব্যবস্থা ছিলনা। ১৯০৬ সালে প্রথম একজন বাঙ্গালী স্যার আশুতোষ মুখার্জী উপাচার্য হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে একটি শিক্ষণ ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং একই সাথে ম্যাট্রিকুলেশনসহ সকল প্রকার ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাও পালন করতে থাকে।

৫। শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Training of Teachers) : স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উড ডেসপ্যাচে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। *Pupil-Teacher* পদ্ধতিতে শিক্ষক তৈরির উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে শিক্ষক তৈরির কাজকে উৎসাহিত করার জন্য Pupil Teacher কে বৃত্তিপ্রদান এবং ক্রমান্বয়ে এ সব শিক্ষককে *নরমাল স্কুলে* প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সনদ প্রদানের জন্য ডেসপ্যাচে সুপারিশ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় একশত বছর পর সরকার কর্তৃক শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত উড ডেসপ্যাচেই হলো একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। এই দলিলে শিক্ষার প্রায় সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের এটা মূলভিত্তি এবং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক বিষয়ই উডের ডেসপ্যাচের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। স্তর বিন্যস্ত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তর বিন্যাস, শিক্ষা পরিচালনার জন্য জনশিক্ষা বিভাগ গঠন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভাগীয় অনুমোদন ব্যবস্থা প্রচলন, অনুমোদিত স্কুল-কলেজের কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন, শিক্ষা কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্য গ্রান্ট-ইন-এইড এর প্রবর্তন, ভারতবর্ষে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি যা লক্ষ্য করছি, তার প্রায় সবকিছুরই ভিত্তি রচিত হয়েছিল উডের ডেসপ্যাচের মাধ্যমে।

এতসব ভাল কাজের মধ্যেও ঊপনিবেশিক বৃটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ভারতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রকৃত শিক্ষিত ভারতবাসী সৃষ্টির পরিবর্তে ভারতে বৃটিশ শাসন দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্য নিয়ে কেরানী ও পিয়ন সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর রুচির পরিবর্তন করে বৃটিশ কলকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একটি স্থায়ী মার্কেটে পরিণত করার মানসে এদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উডের শিক্ষা দলিলকে প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর *মুক্তি সনদ বা Magna Charta* হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা একটি বিতর্কের বিষয়। বি.এড প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণকালীন সময়ে এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে এর পক্ষে ও বিপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি উপস্থাপন করে বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা করতে পারেন।

১.৬ শরীফ কমিশন (১৯৫৯) এবং বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন(১৯৭৪)

১৮৫৪ সালের উড ডেসপ্যাচ থেকে ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশন রিপোর্ট পর্যন্ত প্রায় একশত বছর পেরিয়ে গেছে। ১৮৫৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে শুধুমাত্র বৃটিশ শাসন আমলেই এদেশের শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কমপক্ষে আরও দশটি বড় বড় রিপোর্ট হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তান শাসন আমলে শিক্ষার উপর আরও তিনটি রিপোর্ট হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে এ সব রিপোর্ট পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে রিপোর্টগুলোর তালিকা দেয়া হলো।

১৮৫৪ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট

১। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (হান্টার কমিশন, ১৮৮২-৮৩)
২। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট, ১৯০২
৩। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট, ১৯০৪
৪। ভারতীয় শিক্ষানীতি, ১৯০৪
৫। ভারতীয় শিক্ষানীতি, ১৯১৩
৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট, ১৯১৭ (স্যাডলার কমিশন রিপোর্ট)
৭। হার্টগ কমিটি রিপোর্ট, ১৯২৯
৮। অ্যাবট-উড রিপোর্ট, ১৯৩৭
৯। ওয়ারদা শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট (ড. জাকির হোসেন রিপোর্ট), ১৯৩৭
১০। যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট (সার্জেন্ট রিপোর্ট), ১৯৪৬

পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত রিপোর্ট

১। পূর্ববাংলা প্রদেশের শিক্ষা সংস্কার কমিটি রিপোর্ট (আকরাম খান রিপোর্ট), ১৯৫১
২। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট (আতাউর রহমান খান কমিশন রিপোর্ট), ১৯৫৭
৩। পাকিস্তান জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (শরীফ কমিশন), ১৯৫৯

এসব রিপোর্টে আমাদের দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে। এসব সুপারিশের ভিত্তিতেই আমাদের বর্তমান শিক্ষার ভীত রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে ১৯০ বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল- পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য মাওলানা আকরাম খাঁন কমিটি রিপোর্ট, ১৯৫১ এবং আতাউর রহমান খান রিপোর্ট, ১৯৫৭-তে প্রকাশিত হয়। আকরাম খাঁন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫২ থেকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পূর্বের ৪ বছরের স্থলে ৫ বছর মেয়াদী করা হয়। এছাড়াও পূর্বের মিডিল ইংলিশ স্কুলের পরিবর্তে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়র স্কুল প্রবর্তন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (শরীফ কমিশন) রিপোর্ট, ১৯৫৯

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে তদানীন্তন শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফের নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৫৯-র ৫ জানুয়ারি কশিমন তাঁদের কার্যক্রম শুরু করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান এস. এম. শরীফের নাম অনুসারে এটি শরীফ কমিশন রিপোর্ট নামে খ্যাত। এই রিপোর্ট উচ্চতর শিক্ষা, পেশামূলক শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা, কৃষি ও পশুপালন, আইন শিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা, মেডিক্যাল শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, শরীর চর্চা শিক্ষা ও খেলাধুলা, ধর্মীয় শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক ট্রেনিং, শিক্ষাকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চলচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা, চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকা, শ্রমের মর্যাদা, বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, শিক্ষকদের ট্রেনিং ও চাকুরির শর্তাবলি, বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ও তাঁদের ট্রেনিং ব্যবস্থা, মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম ও ভাষা শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থা, শিক্ষা উপকরণের সদ্ব্যবহার, শিক্ষা উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান ইত্যাদি সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং শিক্ষার প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

- দক্ষ ও কুশলী জনশক্তি এবং বুদ্ধিমান নাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অপরিহার্য। এজন্য অন্তত আট বছর মেয়াদী ব্যাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষার প্রয়োজন।
- আগামী ১০ বছরের মধ্যে ৫ বৎসর মেয়াদী বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা এবং সর্বমোট ১৫ বছর সময়ের মধ্যে আট বছরের বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

- প্রাথমিক স্তরে ড্রপ-আউটের হার ৫০% থেকে ৭৫% পর্যন্ত। ইহা রোধ করার জন্য প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিকৃত শিশুদের মাতা-পিতাকে তাদের সন্তানদের ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে রাখা বাধ্য করতে হবে। ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে বাধ্যতামূলক করা হবে।
- শিশুদের একই শ্রেণিতে পুনঃপুনঃ থাকতে বাধ্যকরার যে রীতি প্রচলিত আছে তা শিশুদের বিদ্যালয় ত্যাগের একটি অন্যতম কারণ। উন্নত দেশগুলিতে শিশুদের বয়সের ভিত্তিতে- বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নয়- উপরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করে দেয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত না হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যকর করা কঠিন হবে। অতএব, প্রাথমিক স্তরে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নয়, বয়সের ভিত্তিতে উপরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করে দেয়ার সুপারিশ করা হলো। এতে স্কুল পরিত্যাগের হার হ্রাস পাবে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন বাস্তবে পরিণত হবে।
- স্কুলে লেখাপড়ার প্রতি শিশুদের মনোযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করা হবে। উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে এবং জাতীয়, সম্প্রদায়গত শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও চাহিদার বিষয়গুলো বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে এবং তা আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরে ন্যূনতম ২০০ দিন, ১ম ও ২য় শ্রেণিতে সাপ্তাহিক ২৬ ঘন্টা এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা ক্লাস হবে।
- প্রাথমিক স্তরে ভর্তির বয়স ৫ বৎসর।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর হিসাবে গণ্য হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে–

ক) শিশুদের কাজ চালানের উপযোগী আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা;

খ) নৈতিক, দৈহিক ও মানসিক দিকসহ শিশুর ব্যক্তিত্বের সকল পর্যায়ের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন;

গ) শিশুকে একজন ব্যক্তি ও নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান, কলা-কৌশল ও দক্ষতাসম্পন্ন করে তোলা এবং পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা;

ঘ) নাগরিকের দায়িত্ব-চেতনা, দেশের প্রতি মমত্ববোধ এবং দেশের উন্নয়নের কাজে তার সেবা বা নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণের মনোভাব জাগ্রত করা;

ঙ) শ্রমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কৌতুহলের অভ্যাস গড়ে তোলা;

চ) শারীরিক কাজ ও শরীর চর্চা এবং ক্রীড়া ও খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা;

মাধ্যমিক শিক্ষা

(১) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নীচে এবং প্রাথমিক পর্যায়োত্তর শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা হিসাবে গণ্য হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা হতে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র পৃথক শিক্ষাস্তর এবং প্রশাসনিক সংস্থারূপে সংগঠন করাতে হবে।

(২) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে পৃথক করে মাধ্যমিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝায়। কিন্তু যতদিন না প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় ততদিন ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকেও মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এ কারণে বর্তমান অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করতে হবে। যথা- ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন-মাধ্যমিক, নবম-দশম শ্রেণি মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো–

ক) একজন ব্যক্তি, খ) একজন নাগরিক, গ) একজন কর্মী এবং ঘ) একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানো।

(ক) ব্যক্তি হিসাবে বিকাশ

- বালক-বালিকাদের মনে অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন চিন্তার মনোভাব এবং বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তাহাদের জ্ঞান প্রয়োগের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- সর্বপ্রকার শিক্ষাদান তরুণদের প্রয়োজন ও আগ্রহের সাথে সম্পর্কিত করা।
- শিক্ষাদান এবং বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।
- বালক-বালিকাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উন্মেষ সাধন।
- খেলাধুলা ও শরীর চর্চা শিক্ষার মাধ্যম বালক-বালিকাদের মধ্যে শরীর চর্চার প্রতি আকর্ষণ, সে সম্পর্কে দক্ষতা এবং খেলাধুলার আনন্দ উপভোগের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

(খ) নাগরিক হিসাবে বিকাশ

- বালক-বালিকাদের মধ্যে পরিশ্রমের অভ্যাস, আত্মশৃঙ্খলা ও সততা সৃষ্টি করা।
- সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক দিক থেকে উপকারধর্মী কাজে অংশ গ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি করা।
- সেবা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- স্থানীয় পরিবেশ ও বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাদানকে সম্পর্কিত করা।

(গ) কর্মী হিসাবে বিকাশ

- শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করা।
- উচ্চতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে অথবা কর্মজীবনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বৃক্তিমূলক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা বিধান করা।
- শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পথ-নির্দেশ সম্বলিত সাহায্যের ব্যবস্থা করা এবং একইভাবে শিশুদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও পরবর্তী কর্মজীবনের পথে পরিচালিত করা।

(ঘ) দেশপ্রেমিক হিসাবে বিকাশ

- এমন ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যার ভীত জাতীয় সংস্কৃতি ও ইসলামিক মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।
- জাতির জন্য গৌরববোধ, ইহার ইতিহাস ও আশা- আকাঙ্খা সম্পর্কে সচেতন উপলব্ধি এবং জাতির সেবা করার সদিচ্ছা প্রথম থেকেই লালন করা।
- বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উপলব্ধি ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা।

শিক্ষাক্রম

- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমকে দুইটি মৌলিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রথমতঃ দ্রুত উন্নতশীল সমাজে উপযুক্ত ও সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যে সব বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন সেইসব বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে। ইহাতে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলি থাকিবে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কালিকুলামে এমন সব অতিরিক্ত বিষয় ও ট্রেনিং-এর বিধান থাকবে যার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও জীবিকা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলবে।
- আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে বহু উদ্দেশ্য-সাধক বিদ্যালয়রূপে উন্নীত করতে হবে। এইসব বিদ্যালয়ে মৌলিক বিষয়গুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি ঐচ্ছিক বিষয়, বিশেষ করে ব্যবহারিক ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে, যাতে বালক-বালিকাগণ তাহাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের প্রবণতা ও আকাঙ্খার উপযোগী এবং আমাদের সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের সহিত অধিকতর সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় বেছে নিতে পারে। বহু সংখ্যক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। যে সব বালক বালিকার উপযুক্ত প্রবণতা ও আগ্রহ আছে তাদেরকে অষ্টম ও দশম শ্রেণীর অধ্যয়ন সমাপ্তির পর এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে।
- কারিকুলাম সংক্রান্ত বিষয়ে অবিরামভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণা চালানোর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে স্থায়ী কারিকুলাম বিভাগ সৃষ্টি করা হবে।
- বিশ্বের সাধারণ প্রবণতার সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান, গণিত ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনের সাথে সম্পর্কিত পন্থায় ঔ সকল বিষয়কে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় ব্যয় করার সুপারিশ করছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে গণিত বিষয়ের দুইটি পর্যায় থাকা দরকার-সাধারণ গণিত যা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামুলক এবং উচ্চতর গণিত যা বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান লাভের শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত থাকিবে। আবার সাধারণ বিজ্ঞান ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শরীফ কমিশন রিপোর্টের প্রভাব

(১) শরীফ কমিশন রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করা এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য জোর সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিশন রিপোর্টেও এ সুপারিশটি জোরালো ভাবে পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করা হয়েছে।

(২) নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা হিসাবে গণ্য করে তা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা হিসাবে গণ্য করে মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি স্তর হিসাবে ভাগ করা হয়েছে–

৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি:	জুনিয়র স্তর
৯ম - ১০ শ্রেণি:	মাধ্যমিক স্তর
১১শ - ১২ দশ:	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

(৩) পূর্বের Intermediate পরীক্ষা যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও গৃহীত হতো তা পরিবর্তন করা হয়েছে। তদস্থলে এইচএসসি বা HSC (Higher Secondary Certificate) পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এ পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের আওতায় আনা হয়েছে। এভাবে বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বোর্ডের নাম পূর্বের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরিবর্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড করা হয়েছে। রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থানে নতুন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ৫ থেকে ৬ টি আবশ্যিক বিষয় এবং পছন্দনীয় বিভাগ থেকে ৩টি নৈর্বাচনিক বিষয় এবং একটি ঐচ্ছিক বিষয় অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। ৯ম শ্রেণি থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ পূর্বের ৯ম-১০ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর জন্য যে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু ছিল তা পরিবর্তন করে ৯ম শ্রেণি থেকে মানবিক শাখা, বিজ্ঞান শাখা, বাণিজ্য শাখা, কারিগরী শাখা ইত্যাদি বহুমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়।

শরীফ কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একমুখী বিদ্যালয়, দ্বিমুখী মাধ্যমিক (Bi-lateral) বিদ্যালয়, বহুমুখী (Multi-lateral) বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ভোকেশনাল স্কুল স্থাপন করা হয় এবং গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে মাধ্যমিক স্কুলে ৯ম শ্রেণি থেকে পৃথক বিজ্ঞান শাখা খোলা হয় এবং বিজ্ঞান ভিন্ন অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়টি একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে এবং বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান বিষয় প্রবর্তন করা হয়। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরির জন্য Education Extension Centre(বর্তমানের নায়েম) স্থাপন করা হয়।

(৪) ১১শ-১২শ শ্রেণিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে পৃথক করে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

(৫) পূর্বের ম্যাট্রিকুলেশন (Matriculation) পরীক্ষার পরিবর্তে এসএসসি (Secondary School Certificate)পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৪)

বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার অভিশাপে জর্জরিত হবার পর কঠোর ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। এই দীর্ঘকালের পরাধীনতার নিপীড়ন ও শোষণের মধ্যেও এদেশের জনগণ কখনও উন্নয়ন ও মহৎ জীবনের স্বপ্ন ত্যাগ করেনি। এক সমৃদ্ধ, আনন্দময় জীবন সৃষ্টির জন্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রম এবং বারবার সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন। অবশেষে স্বাধীনতার নবীন সূর্যের উদয় তাঁদের নবজীবন সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

এ নবজীবন সৃষ্টির অন্যতম চাবিকাঠি যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত, সে সত্য এদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পূর্বেই উপলব্ধি করেন। এ জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমাদের জনসম্পদ বিপুল, প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর, প্রয়োজন এই জনসম্পদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং নিজেদের সুন্দর, সুসমৃদ্ধ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাবার যথাযথ দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের নিষ্ঠুর শোষণের স্বার্থে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ বারবার এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আজ স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন তাই জাতির সম্মুখে একটি মৌলিক দায়িত্বরূপে দেখা দিয়েছে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই (১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার কমিশন নিয়োগ করেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড.মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই রিপোর্ট ড.মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত। ড.মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার যে রূপ, ধারণা, পরিধি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ করেছে নিম্নে সে সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করা হল-

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য

(ক) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা,

(খ) সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাত্রার জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা,

(গ) দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা এবং (ঘ) মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য

(ক) ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলীর সৃজনশীলতা বিকাশের মাধ্যমের তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

(খ) প্রতি স্তরের শিক্ষার্থীদের মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি করা এবং ন্যায়বোধ, কর্তব্য জ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ এবং দেশের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মবোধের জাগরণ।

(গ) মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহাদ্য ও প্রীতি, মানবাধিকার এবং পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুদক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি প্রস্তুত করা। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি এবং জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে কার্যকর ভুমিকা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা।

(ঙ) ব্যক্তিকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুত এবং দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য ও সুপারিশ

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের আদর্শ, সমকালীন জীবনের চাহিদা বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কর্মে নিয়োজিত করণের লক্ষ্যে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্তর হিসেবে মনে রেখে তার সংস্কারের স্বপক্ষে বাস্তবমুখী যুক্তি ও তার বাস্তবায়নের জন্য কতকগুলো কার্যকর সুপারিশ রেখেছেন। সেগুলো হল-

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সংগঠনে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর ধরে নবম শ্রেণি থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায় বলে গণ্য করা যায়। নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় রাখা ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষায়তনে এই তিন/চারটি শ্রেণির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই স্তরের সমস্ত শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র সমন্বয় প্রয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেগুলোর, যেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষা দেওয়া, হয় সেখানে পরিবেশ বিচ্ছিন্ন। এই পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাকে একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা বলে মনে করে। ফলে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর সাথে তাদের মানসিক যোগসূত্র গভীরতা লাভ করে না। এই অবস্থার অবসানকল্পে বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষকে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন না করে নবম ও দশম শ্রেণি খোলার নির্দেশ দিতে হবে। এতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীও চাপ নিরসনে নতুন মাধ্যমিক স্কুল খোলার ব্যয়ভার অনেকাংশে লাঘব হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে বাঞ্ছনীয়। কারণ নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে (অর্থাৎ বয়সসীমা ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে) প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষের মত ছাত্রছাত্রী নানা কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ করে এবং পুরোপুরিভাবে সমাজ জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয় অথচ জীবিকা অর্জনে সহায়ক তেমন কোন প্রশিক্ষণ তারা পায় না। ফলে তাদের অধিকাংশই ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে এবং বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সমাজের জীবনধারায় আপন সংকীর্ণ ভূমিকা পালন করে যায়। যে কোন দেশের পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা ও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি একাদশ শ্রেণি এবং সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণি হতে শিক্ষা কার্যক্র মূলত দ্বিধা বিভক্ত: (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নবম ও দশম শ্রেণিতে উভয় ধারায় কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক পঠনীয় হিসেবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্ব-নির্বাচিত ধারায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে। দশম শ্রেণির শেষে উভয় ধারায় শিক্ষার্থীরা বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। দশম শ্রেণির পর সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির নির্ধারিত বহুমুখী সাধারণ শিক্ষাক্রমসমূহের যে কোন

একটিতে শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে/শ্রেণির পর সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীরা বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। অপরপক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণির বৃত্তি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনমত একাদশ শ্রেণিতে এক বছর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা একটি বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। বৃত্তিমূলক দশম শ্রেণির শিক্ষা সমাপনান্তে যারা শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক হিসেবে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য শিল্পে শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রান্তিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এসব শিক্ষার্থী কর্মকূশল, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ জনশক্তি হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করে ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সচেষ্ট হতে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। কিন্তু কোন শিক্ষার্থী যদি দশম শ্রেণি কিংবা একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের পর সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী হয়, তবে যে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই সুযোগ পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা লাভের পথও উন্মুক্ত থাকবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বহুমুখী সাধারণ শিক্ষাক্রমের যে বিভাগ বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার্থী সেই বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে প্রবেশ করতে পারবে। শিক্ষার্থী যদি একাদশ শ্রেণির প্রশিক্ষণ লাভের পর সাধারণ শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করে তাহলে শিক্ষার্থীর একাদশ শ্রেণির প্রশিক্ষণ অতিরিক্ত শিক্ষায় পর্যবসিত হবে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আমাদের লক্ষ্য হবে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শতকরা বিশ ভাগকে প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা। পরবর্তী পরিকল্পনায় এ হারকে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগে উন্নীত করতে হবে।

১.৭ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৯৭) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০)

জাতীয় শিক্ষানীতিরিপোর্ট, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনে সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে- যাতে জনগণের আশা-আকাংখা দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধেও চেতনার প্রতিফলন ঘটে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও জনগণকে প্রত্যাশার সঙ্গে সমকালীন বিশ্বের চাহিদা, পৃথিবীতে জ্ঞানের বিস্ফোরণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ এ শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও কমিটি পর্যালোচনা করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ-

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা;
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা;
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো;
৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা;
৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা;
৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ সৃষ্টি এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা;
৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা;
৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা এবং নবতম জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা;
৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা;
১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সুবিধা অবারিত করা;
১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা;
১৩. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো;
১৪. পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন ধারায় প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী এবং ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষার পূর্ববতী স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার এ স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, কর্মজগতের জন্য উপযোগী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে যেন মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাছাই করার পর উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় প্রবেশের সুযোগ ঘটে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে যারা অসমর্থ অথবা অনুপযুক্ত তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে দক্ষতার সাথে যথার্থ জীবিকা অবলম্বন করতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনটি ধারা থাকবে।

উদ্দেশ্যও লক্ষ্য

শিক্ষার্থীদের দক্ষতার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জ্ঞান লাভ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে-

১. শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা;
২. কর্মজগতে অংশ গ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা;
৩. উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা;
৪. শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা;
৫. শিক্ষার্থীকে মৌলিক বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানদান।

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০)

একটা উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সুষম সুস্থ-পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে চাই সর্বজনীন শিক্ষার গভীর ও ব্যাপক আয়োজন। পৃথিবীর উন্নয়ন-অগ্রগতি-প্রগতির ইতিহাস ব্যাপক গণমানুষকে নিরক্ষর রেখে, অজ্ঞানতা-অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে রেখে, কোনো জাতি, দেশ, রাষ্ট্র সামনে এগুতে পারেনি। এই ধ্রুব সত্যকে বিবেচনায় রেখে স্বাধীনতার ঊষালগ্নে নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সবার জন্য একটা সুষম, গণতান্ত্রিক উপযুক্ত মানসম্মত সর্বজনীন শিক্ষার শক্ত ভিত্তি রচনা এবং শিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলোর উপরিকাঠামো তৈরির কাজটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি সুপারিশ করার জন্য বাঙালির মহান নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড.কুদরাত-এ-খুদা-কে প্রধান করে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত কমিশন ১৯৭৪ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। কিন্তু ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যার পর তা আর বাস্তবায়ন করা হয়নি।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দেরপূর্বে ছয়টি শিক্ষা কমিশন/কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং প্রতিবেদন তৈরি হয়েছিল। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ছাড়া বাংলাদেশে কোনো *জাতীয় শিক্ষানীতি* প্রবর্তিত হয়নি। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে সরকার পরিবর্তনের পর শিক্ষানীতি ২০০০ বাস্তবায়ন না করে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটি এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। ওই কমিটি এবং কমিশনও প্রতিবেদন জমা দেয়। তবে এটিকেও কোনো শিক্ষানীতি আকারে রূপ দেওয়া হয়নি।

বর্তমান সরকার ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার কয়েক মাসের মধ্যেই ৬ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় শিক্ষানীতি যুগোপযোগী করার দায়িত্ব দিয়ে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-২০০৯ গঠন করে। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতি বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০, যেটি এখন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন প্রক্রিয়া

একদিকে সুনাগরিক সৃষ্টির তাগিদ এবং অন্যদিকে বিদ্যমান কঠিন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখেই কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নের কাজে হাত দেয়।উক্ত কমিটি পূর্বের সবগুলো প্রতিবেদন ও জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০০০ পর্যালোচনা করে। ড. কুদরাত-এ-খুদা (১৯৭৪), অধ্যাপক শামসুল হক (১৯৯৭) কমিটির প্রতিবেদন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নে ব্যাপক মতামত গ্রহণভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার সঙ্গে সংশিষ্ট ৫৬টি সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বিস্তারিত মত বিনিময় করা হয় এবং সকল মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়। ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে এর কাজ সম্পন্ন করে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে জনসম্পৃক্ততা

- মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করার সাথে সাথে তাঁর নির্দেশে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হলে সকল মহলের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।
- প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়।

- বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করে মতামত নেওয়া হয়।
- শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম ওলামা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবিসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সমুহের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং তাদের লিখিত মতামতও নেওয়া হয়।

প্রাপ্ত সকল পরামর্শ ও মতামত বিবেচনা করে খসড়া শিক্ষানীতিকে আরও সংশোধন-সংযোজন করে চূড়ান্ত আকারে প্রণয়ন করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক ২৭মে, ২০১০ তারিখ শিক্ষানীতি-২০১০ নামে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিসেম্বর ২০১০-এ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ইত্যাদিসহ আঠাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ–

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা;

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা;

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, কর্তব্যবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন-ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো;

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা;

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা;

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা, শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তা প্রদান করা;

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা;

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা;

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা;

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষাথীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

১১. বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা;

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা;

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা;

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান;

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা;

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা;

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা;

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা;

১৯. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা;

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেলক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা;

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা;

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো;

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা;

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২৭. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা;

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দূর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ–

- মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদন ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা;
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা;
- মুক্তিযুদ্ধেরচেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা;
- শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।

- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে–

- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষা এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

২. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচি প্রবর্তন করা হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

৩. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

ভর্তির বয়স

৪. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

ঝড়ে পড়া সমস্যার সমাধান

৬. দরিদ্র ছেয়েমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে;

৭. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।

৮. দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ-

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা;
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা;
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে;

- বিভিন্নরকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা;
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

কৌশল

শিক্ষার মাধ্যম

১. এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য-অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা-বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা-সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

অবকাঠামো এবং শিক্ষক ও স্টাফ

৩. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংযোজন করা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণি খোলার ব্যবস্থা করা হবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষা-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করা হবে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শ্রেণিসমূহে পাঠদানের জন্য ইংরেজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়নে অর্থের জোগানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়ন

৪. অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপযুক্তি কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সরকারি সহয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত

৫. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীত করা হবে।

শিক্ষক নিয়োগ

৬. সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

৭. সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদেন জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্যপদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শিক্ষানীতি ২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।
- নতুন শিক্ষা কাঠামোয় ১ম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক এবং
- নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
- ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলা হবে ।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

- প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ হবেঃ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান
- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ হবেঃ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ।
- প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা হবে
- সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও চেতনার সঠিক ইতিহাস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বীরত্ব কাহিনী যথার্থ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবেন।
- চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রি-কে প্রান্তিক ডিগ্রি হিসাবে গণ্য করা

শিক্ষনীতি বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ;
২. নির্ধারিত সময়ের মধে ১০০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জন;
৩. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানসম্পন্ন পুস্তক প্রণয়ন;
৪. সকল ধারার জন্য কয়েকটি মৌলিক বিষয় বাধ্যতামূলককরণ এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন;
৫. সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণএবং যথাযথ মূল্যায়ন;
৬. পঠন-পাঠনের জন্য দক্ষ শিক্ষক নিশ্চিতকরণ;
৭. সকল শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
৮. অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
৯. মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষানীতিতে কতকগূলো আইনগত সংস্থা গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে উল্লিখিত আইন প্রণয়ন /সংস্থা এখনই গঠন করা প্রয়োজন-

সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রণয়নঃ শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন,বিধি-বিধান ও আদেশাবলি একত্রিত করে এ শিক্ষানীতির আলোকে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনঃ সময়ের প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতির পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত, তথ্যপ্রযুক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠনঃ সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।

অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনঃ মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্নাতক ও পরবর্তী) মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালণায় সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পড়াবার যথাযথ ব্যবস্থা আছে কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন জরুরি। স্বাস্থ্য, প্রকৌশল এবং কৃষিশিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ও একই কথা প্রযোজ্য।অপর দিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান-নির্ণয় এবং সেই ভিত্তিতে প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করতে হবে। উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক-এর অফিস স্থাপনঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঙ্খিত মানের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করছে কিনা তা নজরদারির জন্য কতকগুলো প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর অর্পিত বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নজরদারির কাজটি সুষ্টুভাবে সম্পাদন করতে পারছেনা।দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন জরুরি। এ পর্যায়ে স্বাস্থ্য, কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে ও একই কথা প্রযোজ্য। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক মান নির্ণয়পূর্বক প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করতে হবে। উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক এর অফিস স্থাপনকরা অত্যন্ত জরুরী।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
২. বিশেষ অর্থে শিক্ষার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দু'টি উদাহরণ দিন।
৪. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঁচটি উদাহরণ দিন।
৫. দেশীয় শিক্ষা কাকে বলে?
৬. 'নর্মাল স্কুল' কোন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল?
৭. Grant-in-aid চালু করার সুপারিশ কোন রিপোর্টে কে করেছিলেন?
৮. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত শিক্ষা কাঠামো উল্লেখ করুন।
৯. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
১০. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত ৫টি উদ্দেশ্য লিখুন।
১১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার তাৎপর্য উল্লেখকরে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. মাধ্যমিক শিক্ষা কী? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৩. উপমহাদেশে শিক্ষার বিকাশ ধারা ব্যাখ্যা করুন।
৪. দেশীয় শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? উইলিয়াম এ্যাডামের রিপোর্ট অনুসারে দেশীয় শিক্ষার ব্যাপকতা ও সার্বিক অবস্থার বিবরণ দিন।
৫. পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা "প্রাণ শক্তিহীন অকেজো শিক্ষা ছিল"- আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।
৬. দেশীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে উইলিয়াম এ্যাডামের রিপোর্ট পর্যালোচনা করুন।
৭. উডের শিক্ষা দলিল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।
৮. "ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিলনা, বরং ঔপনিবেশিক সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে"- ব্যাখ্যা করুন।
৯. উড ডেসপ্যাচকে ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা (Magna Charta) হিসাবে আখ্যায়িত করা যা কিনা- উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করুন।
১০. মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারে শরীফ কমিশন রিপোর্টের প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।
১১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নে শরীফ কমিশন রিপোর্টের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলো উল্লেখ করুন।
১২. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ এর আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।
১৩. মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ এর সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করুন।
১৪. জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ বাস্তবায়নের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ কী কী। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা যায়, সে সম্পর্কে আপনার মতামত তুলে ধরুন।

ইউনিট ২ : বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

যে কোন দেশের শিক্ষানীতির ওপর শিক্ষা দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের একেক দেশ একেক ধরনের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা গ্রহণ করে শিক্ষায় প্রয়োগ করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার সেতুবন্ধন হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তির উপরই গড়ে ওঠে উচ্চ শিক্ষা। শিক্ষাকে প্রভাবিত করে দর্শন এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচারই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় দর্শন। তাত্ত্বিকভাবে দর্শন হলো সকল জ্ঞানের আধার। দর্শনের মূল কথা হলো সত্যের অনুসন্ধান। শিক্ষাও মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়, মানুষকে আলোকিত করে। এ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তাই দর্শন, শিক্ষা দর্শন ও দর্শনের আলোচনা শেষে মূল বিষয়বস্তুকে ৪টি পাঠে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১ ভাববাদ বা আদর্শবাদ (Idealism)
২.২ বাস্তববাদ (Realism)
২.৩ প্রয়োগবাদ (Pragmitism)
২.৪ প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

দর্শন ও শিক্ষা দর্শন (Philosophy & Educational Philosophy)

দর্শন (Philosophy): দর্শন শব্দটি সংস্কৃতি 'দৃশ' ধাতু এবং 'অনট্' প্রত্যয় যোগে সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ অর্থে দর্শন বলতে 'চোখের দেখাকে' বোঝায়। কিন্তু দর্শনের প্রকৃত অর্থ আরও ব্যাপক। সে ক্ষেত্রে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধিই দর্শন। আবার সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকারই দর্শন। তাই যে কোনো সত্য বা তত্ত্ব সন্ধানী বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে দর্শন বলা যেতে পারে।

দর্শনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Philosophy, যা এসেছে দুটো গ্রিক শব্দ 'Philos',অর্থাৎLoving বা Loveমানে 'অনুরাগ' এবং 'Sophia' অর্থাৎ 'Knowledge' বা 'Wisdom' মানে জ্ঞান থেকে। সুতরাংPhilosophyশব্দের উৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা জ্ঞানপ্রীতি'।

দর্শনের ব্যাপারে দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞগণ নানা অভিমত বা সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা-

মহান দার্শনিক **সক্রেটিসের** মতে-'সত্যের অনুসন্ধানে বা জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজেকে নিয়োজিত রাখাকে দর্শন বলে'।

প্লেটোর মতে-'সত্যের এবং বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাই দর্শনের কাজ'।

এরিস্টটলবলেন-'দর্শন বিজ্ঞানের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্যে করে এবং প্রকৃতির অবদান বিশ্লেষণ করে'।

ফরাসী দার্শনিক **কোঁতে (**Coete**)**-এর মতে, 'দর্শন হলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। এটা সকল বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ সমন্বয়ের প্রচেষ্টা নেয়'।

জার্মান দার্শনিক **ইমানুয়েল কান্ট (**Immanuel Kant)বলেন, 'দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা'।

শিক্ষা দর্শন (Educational Philosophy)

মূল দর্শনের একটি শাখা শিক্ষা দর্শন। অর্থাৎ দর্শন হতেই শিক্ষা দর্শনের সৃষ্টি। দর্শনের কাজ প্রধানত বিজ্ঞানভিত্তিক। আর শিক্ষা দর্শন এমন একটি বিষয় যা জ্ঞানের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, যা শিক্ষার সাথে জড়িত তা নিয়ে আলোচনা করে।আধুনিক বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দার্শনিক **জন ডিউই** বলেন, 'A philosophy of education is based upon a philosophy of experience.' অর্থাৎ শিক্ষা দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞতার দর্শন। শিক্ষার স্বরূপ, জ্ঞানগত বিষয় হিসেবে শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণ, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং শিক্ষার সমস্যাসমূহ নিরসনের যৌক্তিক কাঠামো সংক্রান্ত বিদ্যাই শিক্ষা দর্শন।

২.১ ভাববাদ (Idealism)

ভাববাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Idealism। ইংরেজি Idea থেকে Idealism শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে এটি প্রাচীনতম। ভাববাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন প্লেটো, ফিকটে, হেগেল, কান্ট, স্পিনোজা, ফ্রয়েবেল, পেস্তালৎসি প্রমুখ ব্যক্তি।ভাববাদী দার্শনিকগণ মানুষ ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে এক ভাবমূলক সত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তারা মনে করেন, মানুষ একটা আধ্যাত্মিক সত্তা নিয়ে জন্মায়। শিক্ষার মধ্যে দিয়েই হবে তার প্রকৃত আত্মোপলব্ধি।

ভাববাদ দর্শনের মূল বক্তব্য

ভাববাদীদের মূল বক্তব্য হল যাবতীয় জড়বস্তুর মূলে কোন না কোন মানসিক বা বিমূর্ত ধারণা রয়েছে। এ বিমূর্তআধ্যাত্মিক ধারণা হচ্ছে মন। তাদের মতে, এমন হচ্ছে প্রকৃত সত্য, চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর। মানব মন সে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা তৈরি। তারা আরও বলেন যে, জড় জগতের অনিত্যতা, অবাস্তবতা উপলব্ধি করে মন পরমাত্মার সাথে একাত্মতাবোধ করে। সুতরাং, মন হচ্ছে প্রকৃত সত্য।

ভাববাদের মূলনীতি

ভাববাদের প্রধান সূত্র বা মূলনীতিগুলো হলো-

১. দৃশ্যমান জড়জগৎ ছাড়া আরও একটি জগৎ আছে তা হলো আধ্যাত্মিক জগৎ। আধ্যাত্মিক জগৎ, জড়জগৎ অপেক্ষা অধিকতর সত্য।

২. মানসিক অভিজ্ঞতায় এই অধ্যাত্মিক জগৎ সত্যও অবিনশ্বর। মনোময় জগৎটির অধীশ্বর হলেন পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা বা পরমাত্মা। ব্যক্তি যখন এই পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তখনই তার মোক্ষ লাভ হয়।

৩. ব্যক্তি পরমাত্মারই অংশ। সুতরাং মনুষ্যজীবন মহামূল্যবান ও মহিমাময়। মানুষই আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী, তাই মানুষের মধ্যেই কেবল ধর্ম, নীতি ও আধ্যাত্মিকতা দেখা যায়।

৪. পরম সত্য ও সুন্দরকে লাভ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

৫. নৈতিক ও কৃষ্টিগত বিষয় লাভই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়।

৬. কোন আদর্শই সৃষ্টি করা যায় না, পৃথিবীতে তা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। মানুষ তার পুনরাবৃত্তি করে মাত্র।

৭. মানুষ তার নৈতিক ও আধ্যত্মিক সম্পর্কের দ্বারা তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ভাববাদের প্রকারভেদ

ভাববাদ তিন প্রকার-

১. ব্যক্তিক ভাববাদ (Subjective idealism)

২. মূর্তায়িত ভাববাদ (Phenomenalistic idealism)

৩. নৈর্ব্যক্তিক ভাববাদ (Objective idealism)

ভাববাদ দর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য

ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি, আত্মাবিকাশ, আত্মজ্ঞান লাভ ও পরম সত্যকে জানা। বহুর মধ্যে জানা, নিজেকে জানা (know thyself)। নিজের মাঝে যে পরম সত্য লুকিয়ে আছে তাকে জানা। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সর্বাত্মক কল্যাণ সাধন ও বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য।ফ্রয়েবেলের মতে, ‘শিশুর অবিকশিত সম্ভবনার পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার লক্ষ্য।’

ভাববাদী দর্শন শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ উভয় দিকের উপরই প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ভাববাদের গুরুত্ব নিম্নরুপ-

১. আত্মোপলব্ধিঃ শুদ্ধ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের দ্বারা এই আত্মোপলব্ধি হয়ে থাকে।

২. ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনঃ মনুষ্য জীবন দুর্লভ ও মূল্যবান, তাই ব্যক্তির আত্মবিকাশ সাধন হল প্রধান কর্তব্য।

৩. সর্বজনীন শিক্ষাঃ আত্মোপলব্ধি শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য নয়। সকলের জন্য শিক্ষা চাই।

৪. সৃজনী শক্তির বিকাশঃ ইতর প্রাণীর মত মানুষ তার পরিবেশকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে না। প্রয়োজনবোধে সে তার পরিবেশকে নিজের সৃজন শক্তি দিয়ে পরিবর্তিত করতে পারে। তাই ভাববাদী দর্শনে আবিষ্কার ও সৃজনী শক্তির বিকাশ হলো শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

৫. কৃষ্টির উন্নতিঃ মানুষ উন্নত কৃষ্টির স্রষ্টা। এটির উন্নতি সাধন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে এর সঞ্চালন শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। সেই কৃষ্টির উন্নতি সাধন করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

৬. নৈতিকতাবোধের উন্মেষঃ নৈতিকবোধ আমাদের ভাল-মন্দ বিচার করতে শিখায়। শিশুর মধ্যে এই নৈতিক চেতনার সৃষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে করা সম্ভব।

ভাববাদ দর্শনে শিক্ষাক্রম

ভাববাদীদের মতে- চিন্তা, জড়, মন, পরমাত্মা, শারীরিক-মানসিক ও আত্মিক শরীর বিষয়ে জ্ঞান-বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য ভাষা, গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, কাব্যকলা, শিল্প, নৈতিক ও সমাজসেবামূলক কাজ মানুষের অধ্যাত্ম সাধনা আধ্যাত্মবোধের যে ইতিহাস রয়েছে সেগুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।ভাববাদ মূলত কল্পনায় বিশ্বাসী। বিজ্ঞান অপেক্ষা মানবিক বিবেচনা করাই ভাববাদের মূল লক্ষ্য। বিজ্ঞান সত্যলব্ধ জ্ঞান, যা পৃথিবীতে আরও বাসোপযোগী; আরও নিকটতম করে তুলেছে, বহিপ্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষ যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় প্রগতির দিকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ভাববাদী দার্শনিকদের তেমন কোন অবদান নেই বললেই চলে। কাজেই এ জগতেকে, জগতের সত্যকে বাদ দিয়ে পরমাত্মাকে জানার প্রয়াস বাস্তবায়িত হতে পারে না।সুতরাং, ভাববাদী শিক্ষা সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, মানুষের গুণ কেবল পরিবর্তনপ্রবণ হতে পারে না। মানুষকে অবশ্যই সেসব সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে হবে যা বাস্তব। তবেই মানুষ শান্তি পাবে।ভাববাদীরা মানুষকে সবকিছুর কেন্দ্র বলে মনে করেন। মানুষের ধর্মীয়, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনকেই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করেন। তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অপেক্ষা মানব সম্পর্কিত শিক্ষাক্রমের ওপর তারা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

ভাববাদীদের মতে ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের জন্য শিক্ষাক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে-

১. সুস্থ দেহে সুস্থ মনঃ শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষাক্রমে থাকবে শরীর বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ব্যায়াম, শরীর চর্চা ইত্যাদি।

২. বৌদ্ধিক উন্নতিঃ সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় বৌদ্ধিক উন্নতির জন্য অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতিঃ শিক্ষার্থীর নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির জন্য ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪. নান্দনিক বোধের উন্মেষঃ শিক্ষার্থীর নান্দনিক বোধের উন্মেষের জন্য চারুকলা, সঙ্গীত, অংকন প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি নির্ণয়ে ভাববাদ

ভাববাদ অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন হবে যার সহায়তায় শিশুর অবিকশিত সম্ভবনাময় দিকগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণভাবে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন করার চেষ্টা করা হয়। গুরুগৃহবাস, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান হবে শিক্ষাদান পদ্ধতি। শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত সত্তা বিদ্যমান, শিক্ষার মাধ্যমে তার বিকাশ ঘটানোই ভাববাদী শিক্ষকের প্রধান কাজ। শিক্ষার্থী তার আদর্শবান গুরুর জীবন অনুকরণ করে চললেই তার আত্মোপলব্ধি ঘটবে।

প্রাচীন ভাববাদী শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল-

১) প্রশ্ন (Question)

২) আলোচনা (Discussion)

৩) বক্তৃতা (Lecture)

৪) অনুকরণ (Imitation)

কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল ভাববাদী যেমন পেস্তালৎসী, ফ্রয়েবেল প্রমুখ শিক্ষকগণ শিশুর আত্মসক্রিয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পেস্তালৎসী চেয়েছিলেন শিক্ষার পদ্ধতিকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে। তাই তিনি খেলাভিত্তিক পদ্ধতিতে সমর্থন করতেন। তার মতে শিক্ষোপকরণ নিজেরাই নাড়াচাড়া করে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা শিখবে। ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের খেলার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

ভাববাদ দর্শনে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষার্থীর মধ্যে অসীম পরম সত্তা অবিকশিতভাবে রয়েছে।

২. শিক্ষার্থী পরমাত্মারই অংশ।

৩. তার মধ্যে নতুন কোন আদর্শ সৃষ্টি করা যায় না, শিক্ষার্থীর মধ্যে জন্ম থেকেই তা বিদ্যমান।

৪. শিক্ষার্থী তার আদর্শবান গুরুর জীবন অনুকরণ করবে।

৫. শিক্ষার্থীরা হবে আত্ম-সক্রিয় (Self-active)।

৬. আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষার্থীরা কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলবে।

৭. শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে এবং অধ্যয়নই হবে তাদের একমাত্র তপস্যা।

৮. শিক্ষার্থীরা হবে শ্রদ্ধাশীল ও সংযমী।

ভাববাদ দর্শনে শিক্ষক

আধুনিক ভাববাদীদের মতে, শিক্ষার্থীর সুপরিকল্পিত শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে হতে হবে ব্যক্তিত্বশীল, নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক। শিক্ষকের কাজ হবে মালীর কাজের মত। মালী যেমন ছোট একটি চারাগাছকে পানি দিয়ে পর্যাপ্ত পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করে তোলে এবং এক সময় তা ফুলে ফলে ভরিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষকও শিক্ষার্থীকে পর্যাপ্ত যত্নের মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষায়, আদব-কায়দায়, রীতি-নীতিতে ভরিয়ে তুলবেন। এ ছাড়াও-

১. ভাববাদী শিক্ষক হবেন আদর্শপরায়ণ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, শিক্ষার্থী তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করবে।

২. শিক্ষকের ভূমিকা হবে পরিচালকের মত, তার পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে শিক্ষার্থীরা কাজ করবে।

৩. শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সুপ্ত পরমসত্তা রয়েছে তাকে বিকশিত করাই শিক্ষকের কাজ।

৪. শিক্ষক এমন হবেন যে তাঁর চারিত্রিক প্রভাবে, যত্ন ও পরামর্শে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে।

৫. শিক্ষার্থীদের আত্মোপলব্ধিতে শিক্ষক সাহায্য করবেন ও পরামর্শ দেবেন।

৬. ভাববাদী শিক্ষক শিশুর সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করবেন না, শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর, স্বাধীন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সচেষ্ট হবেন।

৭. শিক্ষার্থীর আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তিনি প্রয়োজনবোধে কঠোর হবেন।

ভাববাদ শিক্ষা কেবল তাত্ত্বিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছে তা নয়, তার প্রয়োগের দিকটিও উপেক্ষা করেনি। প্রগতিশীল ভাববাদীরা শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি বিষয়কে তাদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। ভাববাদকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে, সমাজ সুগঠিত হবে।

প্রধান ভাববাদী দার্শনিক ও তাঁদের অবদান

ভাববাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভাববাদকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দার্শনিক উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে তাদের কয়েকজনের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হল-

প্লেটো (Plato)

খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ থেকে ৩৪৭ এর মধ্যে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর লিখিত বিবরণ থেকে ভাববাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি ভাববাদের উপর লিখিত বিবরণ দিয়ে ভাববাদের ক্ষেত্রে অবদান রাখায় তাকে ভাববাদের জনক বলা হয়।

প্লেটোর মতে, ''বাস্তব পৃথিবী সর্বজনীন ধারণর মাঝে সীমাবদ্ধ এবং এর অবস্থিতি মানব মনের সাধারণ ধারণা বা বস্তু নিরপেক্ষ। এ বাস্তব পৃথিবী চরম বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণ দৃশ্যমান পৃথিবী যেখানে মানুষতার দৈনন্দিন জীবনযাপন করে, সেখানে গাছপালা, বাড়িঘর প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখা গেলেও তার চরম বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।'তাঁর মতে, আমরা যে জগতে বাস করি তা ছায়া বা প্রতীক মাত্র। অনেকে মনে করেন যে, এ মতবাদের প্রভাবের মূলে রয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের মতবাদ। এ মতবাদ ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমা জগতে প্রধান দর্শন হিসেবে প্রচলিত ছিল। উক্ত সময় মধ্যযুগ ও জাগরণের যুগ হিসেবে পরিচিত ছিল।

সক্রেটিসের জীবনের শেষ আট বছর প্লেটো তার শিষ্য ও বন্ধু হিসেবে কাজ করেন। সক্রেটিসের প্রভাব তাঁর জীবনে অপরিসীম। প্লোটোর গ্রন্থাবলিতে সক্রেটিসের জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তিনি দেশ ভ্রমণে যান। প্রথমে তিনি মেগারায় যান। সেখানে গণিত শাস্ত্রবিদ এবং দার্শনিক ইউক্লিডের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ইউক্লিডের মতবাদ দ্বারা প্লেটো প্রভাবান্বিত হন। সেখান থেকে তিনি মিশর, ইতালী এবং সিসিলি পরিভ্রমণে যান। ইতালীতে পিথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। হিরাক্লিটাস, সক্রেটিস এবং ইতালীয় দর্শন তত্ত্ব হতে প্লেটোর দর্শন মতবাদের উদ্ভব। প্লেটো আধ্যাত্মবিদ্যায় জ্যামিতির বিচার প্রণালীর অনুসরন করেন। যেসব স্বাভাবিক সংস্কারের উপর তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠিত তিনি সেগুলোকে অনিত্য দ্রব্যজাতের নিত্য আকার পারমার্থিক সত্য এবং বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য বলেছেন। প্রায় দশ বছর দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে বিচিত্র চিন্তাধারায় স্নাত হয়ে তিনি দেশে ফিরেন তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং নাম দেন *একাডেমি*। আনুষ্ঠানিক বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ একাডেমি ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠীর জন্য অনেক অবদান রেখেছে। জ্ঞান ও সত্যের অনুশীলন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাষ্ট্র পরিচালনা, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হতো এ একাডেমিতে। শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর কাটাতেন প্লেটোর একাডেমিতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্নাত হয়ে যেতেন নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে। বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর শিষ্য এবং যোগ্য উত্তরসূরী। বর্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও প্লেটো প্রদত্ত মূলনীতি বাদ দিয়ে আধুনিকতার চিন্তা করাযায় না। ভাবাবাদের মূল প্রবক্তা তিনি। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে এ মনীষী মৃত্যুবরণ করেন।

প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ

চিন্তার গভীরতা এবং মৌলিকতার জন্য লোকে তাঁকে ঐশী (Divine) আখ্যা দিয়েছিলেন। অনন্ত অদ্বন্দ্ব এবং আদর্শই প্লেটোর আলয় ও বিচরণভূমি। সক্রেটিসের চিন্তা স্রোত মন্থর এবং দায়িত্ববিমুখ। প্লেটোর দর্শন উদ্দাম গতিময় সমস্যা সমাধানে উৎসুক। তাঁর দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণতা মুক্ত। যুক্তির মাধ্যমে ভুল ধারণাকে খণ্ডন করে সত্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অন্যতম কাজ। এ কাজকে ভিত্তি করেই ভাববাদ প্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর মতে জ্ঞানের ভিত্তি প্রজ্ঞা-বিশ্বাস নয়। যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে জানতে হবে বিষয়টি অন্যরকম না হয়ে এমন হল কেন? তার জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ধৈর্য্যের অনুশীলন। সক্রেটিসের মতো তিনি মনে করতেন বস্তুর সার্বিক স্বচ্ছ এবং সঠিক ধারণাই জ্ঞান। সার্বিক ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব থাকলে তা সত্য এবং তা না থাকলে তা মিথ্যা। সার্বিক ধারণার উপর বিশ্বাসী হলেও তিনি সর্বপ্রথম আধ্যাত্মবিজ্ঞান (Metaphysics) এর সন্ধান দেন। এটা তাঁর চিন্তার মৌলিক ফসল।

প্লেটোর ভাববাদের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. ভাব হলো এক চরম সত্তা;
২. ভাব হলো সার্বিক ও সর্বজনীন;
৩. ভাব হলো চিন্তন;
৪. ভাব কোনো দ্রব্য বা বস্তু নয়;
৫. ভাবগুলো অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়;
৬. প্রত্যেক ভাবই এক একটা একক;
৭. ভাবগুলো বহুগুণের সারাংশ;
৮. প্রত্যেক ভাবই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পর্ণ;
৯. ভাবগুলো স্থানকাল বহির্ভূত;
১০. ভাবগুলো প্রজ্ঞেয়;

প্লেটোর শিক্ষা মতবাদ

মূল্যবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইত্যাদি গুণাবলির উন্মেষ সাধনের দিকে খেয়াল রেখে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য প্লেটো জোর দিয়েছেন। শুধু জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণকে তিনি সমর্থন করতেন না। আত্মাবিহীন মানুষ নেই। তাই আত্মার উন্নতির জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতে শিক্ষার বাস্তব অভিজ্ঞতা পরস্পকের সম্পূরক। শিক্ষা মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের অনুপ্রেরণা দেয়। শিক্ষা সব সময়ই গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। আত্মার উন্নতির সাথে সাথে সমাজ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্লেটোর মতে সমাজ তথা রাষ্ট্র উন্নয়নের জন্য সুশিক্ষিত নাগরিকের প্রয়োজন। নাগরিকদের মধ্য দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান লোকই কেবল রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্য। প্লেটোর *রিপাবলিক* বহু জাতির জাগরণের জন্য মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। প্লেটো শিক্ষায় শরীরচর্চা এবং নন্দনচর্চার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তর বিন্যাস প্লেটোই প্রথম করেছেন।

প্লেটোর শিক্ষাদান পদ্ধতি

জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার উপর প্লেটো বিশেষ জোর দিয়েছেন। শিক্ষক যা জানেন তা শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া প্লেটোর পছন্দ করতেন না। তিনি গল্প, খেলা ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষালাভে উৎসাহিত করতেন। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা শিক্ষালাভে সবচেয়ে বেশি কার্যকর বলে তিনি মনে করতেন। দলগতভাবে ওশরীর গঠনের জন্য খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষালাভকে তিনি উৎসাহিত করতেন।

প্লেটোর কল্পিত রাষ্ট্র ও শিক্ষা

প্লেটোর মতে একটি আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতীকের গুরুত্ব অপরিমেয়। প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিককে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। এ শ্রেণিগুলো হলো-অভিভাবক, সৈনিক ও কারিগর।অভিভাবক শ্রেণির কাজ হবে রাষ্ট্র পরিচালনা, সৈনিককের কাজ দেশ রক্ষা এবং কারিগরের কাজ দেশের সকল প্রকার খাদ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ। তাঁর মতে একজন রাষ্ট্রনায়কের বয়স হবে পঞ্চাশের উপরে। তিনি প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী এবং একজন বিজ্ঞ দার্শনিক হবেন। প্লেটার তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে সাম্যবাদ এবং আদর্শ অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সুষম ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের কথা বলেছেন। রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের মর্যাদা হবে সমান। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নারী-পুরুষের সমতার উল্লেখ আছে। যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমান মর্যাদা পাবে।

ইমানুয়েলকান্ট (Imanuel Kant)

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ১৭২৪ থেকে ১৮০৪ খ্রি. পর্যন্ত ভাববাদের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। কান্ট বাস্তবতায় বিশ্বাস করতেন। তার মতে, যা মানুষের বোধগম্য নয় তা কোনভাবেই বাস্তব হতে পারে না। ভাববাদ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ হল-এ জগতের দুটি দিক বা রূপ। একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত অপরটি অতীন্দ্রিয় জগত। অর্থাৎ একটি অভিজ্ঞতার জগত অপরটি কল্পনার জগত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত সম্পূর্ণ সত্য নয়। অন্তর্নিহিত বা অতীন্দ্রিয় জগতের ক্ষুদ্র প্রকাশ হল এ বাহ্য জগত। এ ভাব সত্তা বা অতীন্দ্রিয় জগতই হচ্ছে চিরন্তন, স্থায়ী, অপরিবর্তনশীল এবং অবিনশ্বর। অপরপক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃশ্য অনুভূত মানসলোক হচ্ছে পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী, নশ্বর। সুতরাং, অতীন্দ্রিয় জগতই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। আর বাহ্য জগত পরিবর্তনশীল বলে প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তব সত্তা ও সত্য নয়। আর যা সত্য তা বাস্তব, যা সৎ তা সর্বজনীন।

তিনি আরও বলেন যে, জগতের যেমন দুটি দিক আছে তেমনি আমাদের সত্তারও দুটি দিক আছে। একটি দৃশ্য অনুভূত মানসলোক, অপরটি অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় মানসলোক বা আত্মা। প্রথমটি আমাদের সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, কল্পনার সমাহার। একটিকে জানা যায় অপরটিকে জানা যায় না। যাকে জানা যায় না তাকে জ্ঞাতা বলা হয়। এ জ্ঞাতার জ্ঞানলাভের জন্য কতকগুলো অপরিহার্য চিন্তার প্রকার বা প্রকৃতি আছে এবং এ প্রকারগুলো সর্বজনীন ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ- যার ফলে এ বিশ্বজগত যে একটি জগত তা বিশেষভাবে সবার কাছে প্রতিভাত হয়।

উইলহেম হেগেল (W. Hegel)

উইলহেম হেগেল ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ও কান্টের মত অভিজ্ঞতার বাইরে অবস্থিত বাস্তবতায় বিশ্বাস করতেন।হেগেলের মতে, ''জগৎ ও জীবন উভয়ই সত্য।'' অনেকে তাকে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হেগেলের ভাববাদে মানুষের রীতি-নীতি, ন্যায়-অন্যায়, মানুষের নীতি, সৌন্দর্য, ধর্ম, মূল্যবোধ, সমাজনীতি, আত্মিক নীতি ও অনুশাসন সবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সব দিক দিয়ে বিচার করে হেগেলের ভাববাদকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন মতবাদ বলা যায়।

বার্কলে

বার্কলে একজন ব্যক্তিনির্ভর ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন। তাঁর মতে,বিশ্ব প্রকৃতির যা কিছু অস্তিত্ব তা ব্যক্তিনির্ভর, বস্তুনির্ভর নয়। ব্যক্তির প্রত্যক্ষের মধ্যে না আসলে বস্তুর অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই উঠে না। মন বা চেতনা না থাকলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আমাদের কাছে প্রতিভাত হত না।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের অবদান

বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের অবদান সবচেয়ে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভাববাদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা-

১) শিক্ষার লক্ষ্য: ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতম বিকাশই হল শিক্ষার লক্ষ্য। ব্যক্তির বা শিশুর অবিকশিত পরম সত্তা শিক্ষার মাধ্যমেই পরিপূর্ণতায় পৌঁছে। ভাববাদের আলোচনায় তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

২) সক্রিয়তার মাধ্যমে সংগঠিত: সব শিক্ষাই সক্রিয়তার মাধ্যমে সংগঠিত হবে। শিশুর ভিতরের পরম সত্তা শিশুর আত্মসক্রিয়তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ পায়। সুতরাং, বিভিন্ন প্রকৃতির অভিব্যক্তিমূলক সক্রিয়তা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। ভাববাদে এ সত্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৩) খেলার গুরুত্ব: শিক্ষাক্ষেত্রে খেলার গুরুত্ব সক্রিয়তা থেকেই পূর্ণতা লাভ করেছে। এর পূর্বে শিক্ষায় খেলার কোন স্থান ছিল না। তারা খেলাকে পরমসত্তার বিকাশ লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। খেলাটা শুধু অর্থহীন অঙ্গ সঞ্চালন নয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর যেমন মানসিক বিকাশ ঘটে তেমনি জীবনের প্রয়োজনীয় আচরণগুলোও শিখে থাকে।

৩) স্বাধীনতার ধারণা: শিশুর স্বাধীনতার ধারণাটিও এ আত্মসক্রিয়তার ধারণা থেকে এসেছে। কেননা, অন্তর্নিহিত পরমসত্তা যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ লাভ করে সেহেতু শিশুকে তার সর্ববিধ কর্ম প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা দিতে হবে- যাতে পরম সত্তার আত্মপ্রকাশে কোন রকম বাধার সৃষ্টি না হয়।

৪) সর্বাঙ্গীণ বিকাশ: শিক্ষার পাঠ্যক্রম, কর্মসূচি, পদ্ধতি প্রভৃতি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটতে পারে। আধুনিক ভাববাদীরা শিশুর শারীরিক, সামাজিক, আবেগিক প্রভৃতি ব্যক্তিসত্তার সবদিকগুলোরই পূর্ণ বিকাশের উপর সমানভাবে গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

৫) বংশধারা ও পরিবেশ: প্রাচীন ভাববাদীরা পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন না বলে তাঁরা শুধু ব্যক্তির সত্তার গঠনে তার বংশধারার উপরই গুরুত্ব দিতেন কিন্তু আধুনিক ভাববাদীরা পরিবর্তনে বিশ্বাসী বলে তারা শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনে বংশধারার প্রভাবের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবের উপর সমানভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন।

৬) নিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন: শিশুর শিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন পরিবেশকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সুপরিকল্পিতভাবে সেগুলোকে পরিবর্তন করা। শিশুর সহজাত শক্তিগুলোর পূর্ণ ও সুষম বিকাশের উপযোগী করে পরিবেশের শক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করাই শিক্ষার মুখ্য কাজ।

৭) সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি: পূর্ব পুরুষদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে শিশুকে পরিচিত করা শিক্ষার একটি প্রধান কাজ। মানবজাতি যুগ যুগ ধরে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের মধ্যে তাদের সঞ্চিত জ্ঞান ও সংস্কৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে পৌঁছে দিচ্ছে। এভাবে মানবজাতি তাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অগ্রগতির দিকে। পূর্বপুরুষদের এ সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও জ্ঞান শিশুকে তার বঞ্চিত ও সুষম বিকাশের পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে।

৮) মূল্যবোধ সঞ্চালিত: যেসব মূল্যবোধ আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে থাকে সেসব মূল্যবোধ পরমসত্তা থেকে নিঃসৃত হয়েছে এবং সেজন্য সেগুলোও চিরস্থায়ী প্রকৃতির। যেমন- অপরিবর্তনীয় সততা, দয়া, সৌন্দর্য, দেশপ্রেম প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো পরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী প্রকৃতির। আর শিক্ষার কাজ হল এ মূলবোধগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচালিত করা।

২.২ বাস্তববাদ (Realism)

বাস্তববাদ দর্শনে বস্তুর অস্তিত্বই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বাস্তববাদী দার্শনিকগণ বস্তুর ঊর্ধ্বে অনেক কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। Ornstein & Levine তাঁদের An Introduction to the Foundations of Education গ্রন্থে বলেছেন, "Realism is the philosophy that construes reality to be dualistic in nature, that is it contains a material and contains component." **অ্যারিস্টটল** (Aristotle)-কে বাস্তববাদের জনক বলা হয়। এ ছাড়া এই মতবাদের অন্যান্য সমর্থক হলেন অ্যাকুইনাস (Acquinas),ব্রুডি (Broudy), মার্টিন(Martin), পেস্তালৎসি (Pestalozzi) প্রমুখ দার্শনিকগণ।

বাস্তববাদের মূল বক্তব্য

বাস্তববাদীদের মতে, জগতের বস্তু ছায়া বা মায়া নয় বরং বস্তুই বাস্তব। বাস্তববাদীরা মনে করে যে, সব বস্তুরই প্রকৃত সত্তা রয়েছে। অভিজ্ঞতার জগতই প্রকৃত বাস্তব সত্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই বাস্তব এবং প্রকৃত সত্য। কেননা, আমরা যা দেখি বা শুনি তাই শিখি এবং আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভ করি। যে বস্তু আমরা দেখতে বা শুনতে পাই না সে বস্তু সম্বন্ধে আমরা কিছু শিখতে পারি না। কারণ, যে বস্তু দেখা যায় না সে বস্তু সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বক্তৃতা বা আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করলেই চলবে না এর সাথে বাস্তব বস্তু প্রত্যক্ষ করেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করবে। এছাড়াও বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে ব্যবহারিক। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাস্তব বিষয় পর্যালোচনা এবং হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া বাস্তববাদী শিক্ষাদান পদ্ধতি বৈশিষ্ট্য।

বাস্তববাদের মূলনীতি

বাস্তববাদের মূলনীতিগুলো হল-

১. বাস্তব অস্তিত্বের একটি জগত আছে যা মানুষ গঠন বা তৈরি করতে পারে না;

২. এই বাস্তব অস্তিত্ব কেবল মানুষের মনই জানতে পারে;

৩. প্রত্যেক বস্তুরই একটি স্বাধীন সত্তা আছে, যার উপর বাস্তববাদিগণ বেশি জোর দিয়ে থাকেন;

৪. বস্তু তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে যেভাবে অবস্থান করে সেটাই তার অস্তিত্ব;

বাস্তববাদ দর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য

দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত জগৎ এবং জাগতিক প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনা করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এছাড়া বাস্তব জগতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করাও হবে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

১. বস্তুজগতে দৃশ্যমান বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও নিপুণতা দানকরা যা তাকে ও তার পরিবেশকে জানতে ও আয়ত্ত করতে সাহায্য করে।

২. শিক্ষার্থীকে জগতের বাস্তবতার সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করা।

৩. বস্তু ও বস্তুর ঊর্ধ্বে যেসব বিষয়ের অস্তিত্ব আছে সেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৪. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও তার বাইরের বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ এবং আহরিত জ্ঞানকে মানবকল্যাণে কাজে লাগান।

৫. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সমাজগত চাহিদা পূরণ করে তাকে সুখী করা।

বাস্তববাদ দর্শনে শিক্ষাক্রম

বিজ্ঞান চর্চা, বিদ্যার অনুশীলন, বিভিন্ন বিশেষীকরণের উপর জোর, জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাস্তববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মানবতাধর্মী বাস্তববাদীরা প্রাচীন ঐতিহ্যের শিক্ষার কথা বলেছেন। তারা জীর্ণ অবাস্তব শিক্ষার পরিবর্তে উদারধর্মী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। অনেক বাস্তববাদী দার্শনিক তাত্ত্বিক জ্ঞান অপেক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন। মিল্টন ১২ থেকে ২১ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শিক্ষাক্রমের কথা বলেন। এটি হল-

ক. প্রথম বর্ষ : ল্যাটিন, গ্রামার, গণিত ও জ্যামিতি।

খ. পরবর্তী ৪ বছর : পদার্থবিদ্যা, শিক্ষা, ভূগোল, অর্থ-শাস্ত্র, প্রাকৃতিক ভূগোল।

গ. অবশিষ্ট বছরে : বাইবেল, হিব্রু, গ্রিক, রোমান, সাক্সন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, কবিতা, ও আইন শাস্ত্র।

আবার সামাজিক বাস্তববাদীরা শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। ইন্দ্রিয় বাস্তববাদীরা বলেন, শিক্ষা হবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে।

বাস্তববাদ দর্শনে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

১. প্রত্যেক শিক্ষার্থী হল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও ব্যক্তিসত্তার অধিকারী;

২. শিক্ষার্থীর তাদের নিজের সামর্থ্যানুযায়ী নিজের মতো করে শিখবে;

৩. শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অনুসন্ধান, আহরণও তা মানব কল্যাণে কাজে লাগানোয় সচেষ্ট থাকবে।

বাস্তববাদ দর্শনে শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য

১. বাস্তববাদী শিক্ষক হবেন যথার্থই বাস্তববাদী। তিনি শিশুর বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণে সচেষ্ট থাকবেন;

২. তার কাজ শিক্ষার্থীকে শেখানো নয় বরং শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র ও পরিবেশ রচনা করা;

৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবেন;

৪. তিনি সচেষ্ট থাকবেন শিক্ষার্থীকে তার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দেয়ার জন্য;

৫. তিনি হবেন শিক্ষার্থীর স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী।

বাস্তববাদ দর্শনে শিখন-শেখানো পদ্ধতি

বাস্তববাদী দার্শনিকদের মতে, জ্ঞান আহরণের মাধ্যম হচ্ছে গবেষণা ও অনুসন্ধান। বাস্তববাদী দার্শনিক পেস্তালৎসী বলেছেন, ''প্রকৃতির পথে শিক্ষা দিতে হলে কথা ও বক্তৃতার পরিবর্তে সত্য ও বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।'' তিনিই প্রথম বাস্তববস্তু ও উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। বাস্তববাদী দার্শনিকগণ বলেন, বাস্তব বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হবে শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সহজ জিনিস থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ জটিল বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাদান কৌশল বাস্তববাদীদের এক বড় অবদান। এই মতবাদের একজন সমর্থক বেকন শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে আরোহী পদ্ধতির (Inductive Method) উদ্ভাবন করেন।বাস্তববাদ দর্শন থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, জ্ঞানের দ্বার হল ইন্দ্রিয়গুলো এবং আরোহী পদ্ধতি জ্ঞানার্জনের উৎকৃষ্ট পন্থা। পুথিগত শিক্ষা শিক্ষা নয়, যে শিক্ষা বাস্তবে কার্যকরী তাই প্রকৃত শিক্ষা।

বাস্তববাদের প্রকারভেদ

বাস্তববাদের ভাবধারা তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত হয়। যথা-

১. মানবতাধর্মী বাস্তববাদ (Humanistic Realism)
২. সামাজিক বাস্তববাদ (Social Realism)
৩. ইন্দ্রিয় বাস্তববাদ (Sense Realism)

১. মানবতাধর্মী বাস্তববাদ (Humanistic Relism): মধ্যযুগের পাণ্ডিত্যধর্মী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদরূপে যে মানবতাধর্মী মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে কালক্রমে তা এক ক্ষুদ্র এবং প্রাচীন সাহিত্যের অর্থহীন অনুশীলনে পর্যবসিত হয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীনরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ অবাস্তব শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে মানবতাধর্মী বাস্তববাদের অবির্ভাব ঘটে।

মানবতাধর্মী বাস্তববাদী শিক্ষাবিদদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন প্রসিদ্ধ ইটালীয় শিক্ষাবিদ ইরাসমাস। মানবতাধর্মী বাস্তববাদীদের মতে, মানব জীবনের যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ ও কাম্য তার সবকিছুই প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যে নিহিত। তাই প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যচর্চাই শিক্ষার প্রদান বিষয়বস্তু হবে। তাঁদের মতে, শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষ সাধনের অপরিহার্য উপকরণ হল প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির চর্চা। তাঁরা মনে করেন, প্রাচীন সহিত্যের আয়ত্তীকরণই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাচীন সাহিত্যে যেসব মানব অভিজ্ঞতা, আচরণ, আদর্শ, মূল্যবোধ, ধারণা, উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে সেগুলো অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বর্তমান জীবনধারা গড়ে তোলা।

২. সামাজিক বাস্তববাদ (Social Realism): ইউরোপীয় নবজাগরণের সময় সামাজিক বাস্তববাদ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। মাইকেল মনটেনোর ছিলেন সামাজিক বাস্তববাদের উল্লেখযোগ্য শিক্ষাবিদ। সামাজিক বাস্তববাদের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে একজন যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তোলা। তাঁদের মতে, 'শিক্ষার্থীর শিক্ষা এমন পরিকল্পিত উপায়ে দিতে হবে যাতে করে সে একজন সফল ও আনন্দকর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে পারে। 'শিক্ষার্থীর মানসিক ও বিচার-বুদ্ধিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে সে সমাজে একজন সফল নাগরিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে'। তাঁরা বলেন, শিক্ষা হবে একজন ব্যক্তির সফল ও সার্থক জীবনের প্রস্তুতির উপকরণ। বিভিন্ন দেশের মানুষ, প্রথা, রীতিনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে এবং তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে শিক্ষার্থীকে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে দেশ-বিদেশ ঘুরে মানুষের সংস্পর্শে এসে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা যায়। তাঁদের মতে, ভ্রমণের জ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান অপেক্ষা বহুলাংশে কার্যকর ও উপযোগী। লেখাপড়ার জ্ঞানকে গৌণ মনে করে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর এমন একটি চরিত্র গঠন যা তাকে ভবিষ্যতে সুখী, সফল এবং বাস্তব উপযোগী জীবনযাপনে সমর্থ করবে।

৩. ইন্দ্রিয় বাস্তববাদ (Sense Realism): ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন হলেন ইন্দ্রিয় বাস্তববাদের প্রবক্তা। আর একজন প্রখ্যাত ইন্দ্রিয় বাস্তববাদী হলেন প্রসিদ্ধ চেক শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস। ইন্দ্রিয় বাস্তববাদকে এক কথায় বিশ্বাস বলা যায়।তাঁদের মতে, সব জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে লাভ হয়ে থাকে। এ যাবৎ শিক্ষার যেসব তত্ত্ব গঠিত হয়েছিল সবই অভিজ্ঞতা নির্ভর তথ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল। প্রাচীনকালের দার্শনিকবাদের মনোবৈজ্ঞানিক সমাজ তত্ত্বমূলক এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিচারে শিক্ষাকে একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতিরূপে মনে করেন। তাঁদের মতে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলি হল সব জ্ঞান ও সত্যের উৎস এবং শিক্ষা পদ্ধতির তত্ত্বসমূহ ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যেই আবিষ্কার করা যাবে।

অ্যারিস্টটল

অ্যারিস্টটল হলেন বাস্তব দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম প্রবক্তা। অ্যারিস্টটল খ্রি. ৩৮৪-৩২২ এর মধ্যে বাস্তববাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। তিনি বস্তুজগতের বিষয়বস্তুর ভেতর বাস্তবতা দেখতে পান। তিনি প্রকৃতিকে সত্যিকারের বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করেন। অ্যারিস্টটলের মতে,'জগতের যাবতীয় বস্তু যেমন-বাতাস,মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পানি কোন না কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং তাদের প্রতিটির নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি আছে। তিনি তাঁর এ পর্যবেক্ষণকে বস্তু প্রকৃতি প্রকল্প নামে অভিহিত করেন।

জন লক

জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রি.) বাস্তবতা সম্পর্কে বেশ তৎপর হয়ে উঠেন। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাই যাবতীয় জ্ঞানের উৎস। যখন পৃথিবীতে আসি তখন কোন জ্ঞান নিয়ে আসি না। বস্তু জগতের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের ফলে আমাদের জ্ঞানের পরিসীমা বাড়তে থাকে। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে আমরা যুক্তিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহার করে থাকি। এভাবে ইংরেজ দার্শনিক জনলক বাস্তববাদের ক্ষেত্রে কিছু নতুন চিন্তাধারার সংযোজন করেন।

বিজ্ঞানসম্মত বাস্তববাদের আবির্ভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভাববাদ প্রকাশ লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর পুরো সময় বিজ্ঞানসম্মত বাস্তববাদের আবির্ভাব ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটে। বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করাতে বাস্তববাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বেড়ে যায়।
বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার বাস্তব জগতের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। দর্শন ক্ষেত্রে বাস্তববাদের উদ্যোক্তা বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ বার্ট্রান্ড রাসেল। বিজ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তববাদিগণ বস্তুজগৎ সমন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে সম্ভাব্য উপায়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। যখন আমরা বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে একাত্মবোধ করি তখন আমরা বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদের অবদান

শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিসীম। চরম বাস্তবতার স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্তন,হাতে-কলমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব,পরীক্ষা,পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ, ব্যবহারিক শিক্ষাদান, শিক্ষককে গুরুত্ব প্রদান, শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ, বিজ্ঞানসম্মত এবং বাস্তবসম্মত পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন, শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন ও বিচার-বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সমাজে সফল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা, ভবিষ্যতে একজন শিক্ষার্থী যাতে সমাজে সুখী ও একজন প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি রূপে গড়ে উঠতে পারে তার পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষার কার্যকর ও উপযোগিতা বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের উপর গুরুত্বদান, বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে মানবতাধর্মী বাস্তববাদ গঠন, পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, ভ্রমণকে শিক্ষার বড় উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি দান প্রভৃতি বাস্তববাদের উল্লেখযোগ্য অবদান। বাস্তববাদে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষার ধারাকে করেছে প্রগতিশীল। বাস্তববাদীরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা এবং শিশুকে শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করা ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাধারার উল্লেখ করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতির (Method of induction) প্রবর্তন ইন্দ্রিয় বাস্তবাদীদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এ পদ্ধতিকে তাঁরা মুখ্য পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন। বাস্তবতা এবং মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে সমস্যার ব্যাপারে বাস্তববাদী দার্শনিকদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। মূল্যবোধ ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটি মৌলিক ধারণা যা প্রায় সব বাস্তববাদী দার্শনিকই পোষণ করেন তা হচ্ছে মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে প্রাকৃতিক-নৈতিক আইন বা মতবাদ। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারা ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করে বাস্তববাদীরা দর্শনকে সময়োপযোগী করে গঠন করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফেডারিক এস ব্রিডের শিক্ষাও নববাস্তববাদ। হ্যারি ব্রন্ডীর শিক্ষাদর্শনের রূপায়ণ এবং জন উইল্ড-এর লিখিত বিবরণ শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদকে আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

২.৩ প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

গ্রিক শব্দ "Pergamatics" থেকে Pragmation শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। Pragrmation শব্দের অর্থ কর্মঠ ও সক্ষম বা সাধারণ অর্থে প্রয়োজনভিত্তিক বিষয়। প্রয়োগবাদীরা বাস্তব জগতের অধিবাসী, আদর্শ আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই। তাঁরা মনে করেন যার উপযোগিতা আছে তাই ভাল, যা লাভ তার উপযোগিত আছে, যা কার্যকর তা সত্য, যা সত্য তাই কার্যকর।জন ডিউইয়ের মতে,মূল্যবোধ মেঘের মত অস্থায়ী। সত্য প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে। এ মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে জন ডিউই, কিলপ্যাট্রিক, উইলিয়াম জেমস, স্কিনার, পায়ার্স প্রমুখ দার্শনিকগণ অন্যতম।

প্রয়োগবাদ দর্শনের উৎপত্তি

প্রয়োগবাদের জন্ম আমেরিকায়। আমেরিকাবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী, চিন্ত্রাভাবনা ও আদর্শের মধ্যে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকা মহাদেশে যখন ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে বসবাসের জন্য দলে দলে মানুষ এসেছিল, তখন তাদের কতকগুলো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাদের না ছিল অভ্যস্ত জীবনযাত্রা প্রণালী, না ছিল স্থায়ী মূল্যবোধ। তাদের ছিল গভীর আত্মবিশ্বাস। তাই তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে, নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে এক নতুন সমাজব্যবস্থা, এক নতুন জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিল। এ মতবাদ দর্শন জগতে একটি জোরালো মতবাদ হলেও ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে পিয়ার্স জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাময়িকীতে ‘‘How to make our ideas clear" নামক প্রবন্ধে প্রয়োগবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এ মতবাদের মূল কাঠামো অনেক পুরান চিন্তাধারার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিক দর্শন থেকে প্রয়োগবাদ সম্বন্ধে অনেক ধারণা এসেছে।

প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্য

যা সত্য তা জীবনের সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। আর যা জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগসিদ্ধ তা জীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। প্রয়োগবাদীদের মতে, পৃথিবীতে কোন আদর্শ বা মূল্যই স্থায়ী নয়। বিশেষ সময়ে একটি আদর্শের সৃষ্টি হয়। আবার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রতিটি আদর্শ বা মূল্যবোধেরই পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি আদর্শ বা মূল্যবোধকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইকৃত মূল্যবোধই জীবনের প্রয়োগসিদ্ধ। যে আদর্শ বা মূল্যবোধ জীবনের জন্য কল্যাণ বা সুফল বয়ে আনতে পারে, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে সে মূল্যবোধই সঠিক এবং জীবনের জন্য কাম্য। পক্ষান্তরে যে মূল্যবোধ, জ্ঞান বা আদর্শ বাস্তব জীবনের জন্য কোন কল্যাণ বা সুফল বয়ে আনতে পারে না সে মূল্যবোধ সঠিক নয়। সুতরাং, যা সত্য নয় তা জীবনে প্রয়োগসিদ্ধও হতে পারে না।
বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে প্রয়োগবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন-

জন ডিউই এর মতে, ''মানুষের যা কিছু মানবিক তার সবটাই সে শিখে(All that is human is learned)".তিনি মূলত শিক্ষাকে ব্যবহারিক ও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করেন। যথার্থ জ্ঞান কর্ম প্রয়োগের উপায় বা হাতিয়ার। তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়-জ্ঞান হল কাজেরই অঙ্গ। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে কাজের মধ্য দিয়ে, নিজের অভিজ্ঞার মধ্য দিয়ে শিখবে।

সিলারের মতে, 'মানুষই সত্য যাচাইয়ের মূল মাপকাঠি। সবার উপরে মানুষ সত্য (Man is the measure of things) ।'মানুষই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সে সত্য কেবলমাত্রসাংগঠনিক যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয় না। সত্যের মধ্যেই মানব জীবনের সার্বিক ঘটনা দেখা যায় এবং মানুষের সমস্ত মানসিকতা ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।**জেমস**-এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োগবাদকে আরও সুদৃঢ় করে। তাঁর মতে, ''একজন মানুষ পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত অভিযোজন করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শরীরে ও অভিজ্ঞতায় বাড়তে থাকে। মন হল মানুষের অভিজ্ঞতার সমষ্টি ও পরিণতি যা সময়ের ও অভিজ্ঞতার সাথে সাথে বিকশিত হয়। মন কোন বিমূর্ত বস্তু নয়। Sensory experience-এর মধ্য দিয়েই আমাদের সব জ্ঞান হয়। মনকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না। সংবেদন এমন ধারণা যা অভিজ্ঞতাকে বা মনকে বুঝার সুবিধার জন্য মনের বিমূর্ত রূপ।"

গ্রিক দার্শনিক **হিরাক্লিটাস**-এর মতে, ''অবিমিশ্র বাস্তবতার কোন অস্তিত্ব নেই। দুনিয়াতে অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই এবং একমাত্র পরিবর্তনশীলতাই শাশ্বত সত্যের সাক্ষ্য বহন করে।" তিনি পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী।

প্রয়োগবাদ দর্শনের মূলনীতি

১. জীবনের কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থায়ী মান বা মূল্য(Value)নেই যা সর্বকালের জন্য প্রয়োজ্য। আজ যা সত্য, কাল তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে। আমার কাছে যা সত্য, অন্যের কাছে তা সত্য বলে মনে নাও হতে পারে।
২. মানুষই সত্যের স্রষ্টা। শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্য বলে কিছু নেই। চির শাশ্বত সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্যে পৌঁছায়।
৩. উপযোগিতা হল মূল বিচার্য বিষয়। যে কাজের উপযোগিতা আছে, যা পরিণামে শুভ, তাই শুধু গ্রহণযোগ্য।জন লক-এর মতে, সব কিছু জানার দরকার নেই। যা আমাদের আচার-আচরণের সঙ্গে জড়িত তা জানলেই হবে।
৪. পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার চেষ্টার ফলে ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিবেশের প্রভাবকে মেনে নেয় না। প্রয়োজনবোধে তাকে পরিবর্তন করতে তারা সক্ষম।
৫. প্রয়োগবাদীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সামাজিক পরিবেশেরই শুধু সম্ভব। ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি।

প্রয়োগবাদ দর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন শিক্ষার কোন চিরন্তরন বা সত্যিকারের লক্ষ্যে বিশ্বাস করে না। যেহেতু দেহ-মন পরিবর্তনশীল, পরিবেশও পরিবর্তনশীল, সেহেতু পরিবেশের পরিস্থিতির পরিপ্রক্ষিতে আজ যা সত্য কাল তা সত্য নাও হতে পারে। সুতরাং, শিক্ষার কোন স্থায়ী লক্ষ্য থাকতে পারে না। বয়স, সময়, সমাজ ইত্যাদির গতির সাথে সাথে যেমন জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তিত হচ্ছে তেমনি শিক্ষার লক্ষ্যও জীবনের এবং সার্থক অভিযোজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জনডিউই-এর মতে, শিক্ষার কোন লক্ষ্য নেই এবং থাকতে পারে না। কারণ, শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং তা শিশুর বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশের সঙ্গে জড়িত। কোন প্রক্রিয়ারই বহিঃস্থ কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। যারা শিক্ষার ছোট-বড় লক্ষ্যের কথা বলেন তাঁরা শিক্ষক, পিতা-মাতা, সমাজ ইত্যাদির পরিকল্পিত লক্ষ্যের কথাই বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেসব লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর নিজের প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন, শিক্ষার লক্ষ্যের কোন শেষ নেই। শিক্ষার লক্ষ্যের সৃষ্টি চির নবীন। শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাবে। শিক্ষার পরিস্থিতি এমন হবে যাতে তারা নিজেরাই নিত্যনতুন মূলবোধ সৃষ্টি করতে পারে। কোন লক্ষ্য উপর থেকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। শিক্ষার লক্ষ্য হবে, দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করা। এই মূল্যবোধ শুধু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য, সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে গড়ে উঠবে।শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সমর্থ করা। অভিজ্ঞতার আলোকে সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে।শিক্ষা শিশুকে সমস্যা সমাধান করতে শেখাবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে।

প্রয়োগবাদ দর্শনে শিক্ষাক্রম

সমাজ ব্যবস্থা,অর্থনৈতিক কাঠামোতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সহজ কৌতূহল, সৃজনশীলতা, ভাববিনিময়ের ইচ্ছা, শিল্প সৃষ্টির প্রবণতা রয়েছে তা যাতে পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হয় এমন পাঠ্যক্রম করতে হবে। ডিউই-এর মতে, চার থেকে আট বৎসর শিশুর খেলাধুলার সময়। আট-বার বছর স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের সময়। বার বছর থেকে চিন্তাশীল মনোযোগের সময়। প্রথম পর্বে(বার বছর) পাঠ্যক্রম, বই-পুস্তক থাকবে না। তখন শুধু পারিবারিক জীবন ধারা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি তথা সামাজিক রীতিনীতির সাথে পরিচিত হবে। লেখাপড়া শেখা এ অধ্যায়ের শেষ পর্ব থেকে আরম্ভ হবে। ২য় পর্বে শিক্ষার্থীর হাতে-কলম কাজ করা শিখবে। যেমন-সাধারণ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ছোট খাট তাঁতের জন্য সেলাইয়ের কাজ, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, বাগান করে গাছের যত্ন নিতে শিখা-এরকম নানা প্রয়োজনীয় কাজের অবতারণা করা হবে। ৩য় পর্বে শিক্ষার্থী বিভিন্ন শাখার কোন একটি শাখার বিশেষীকরণের জন্য প্রস্তুত হবে। প্রয়োগবাদীদের মতে কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমের প্রয়োজন নেই। শিক্ষাক্রমকে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করারও দরকার নেই। শিক্ষাক্রম হবে একটি অভগ্ন একক।শিশুর আগ্রহ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রস্তুত হবে। প্রয়োজনমতে তাকে পরিবর্তন করেও নিতে হবে। শিক্ষাক্রম হবে পরিবর্তনশীল, নমনীয়।প্রাথমিক পর্যায়ের পড়া, লেখা, গণিত, প্রকৃতি পাঠ, অঙ্কন, হাতের কাজ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, কৃষি, মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি থাকবে। এছাড়া কিছু শিল্প কাজ ও বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষাক্রমে আন্তর্ভুক্ত হবে। মোট কথা, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যা কাজে লাগবে এমন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়বস্তুগুলো শিক্ষাক্রমে স্থান পাবে। কৃষ্টিমূলক কাজকর্ম, কবিতা, সঙ্গীত, চারুশিল্প শিক্ষাক্রমে স্থান পাবে না।

প্রয়োগবাদ দর্শনে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষার্থী হবে শেখার কাজে স্বাধীন, সে তার সমস্যা নিজের মত করে সমাধান করবে;
২. শিক্ষার্থীর শিক্ষা তার বাস্তব অভিজ্ঞাতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে;
৩. স্বতঃস্ফূর্তকাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাবোধ আসবে;
৪. শিক্ষার্থীরা হবে সক্রিয়, তারা শুধু নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয়;
৫. শিক্ষার্থীর ভূমিকা হবে আবিষ্কারক ও গবেষকের মত।

প্রয়োগবাদ দর্শনে শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য

সমাজের প্রকৃতি, সামাজিক চাহিদা ও অনুশাসন মোতাবেক শিক্ষার্থীর শক্তি ও তার ভিতরের প্রকৃতি অনুযায়ী সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং তাকে যথার্থরূপে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব প্রধানত শিক্ষকের উপর দেয়া হয়েছে। সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন মূল্যবোধ, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানকি আবিষ্কার হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ তৈরি শিক্ষককেই করতে হবে। বিদ্যালয়কে সমাজের একটি প্রাণবন্ত অথচ ছোট সংস্করণ হিসেবে নিখুঁতভাবে তৈরি করা এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও শিক্ষকের।

১. প্রয়োগবাদী শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিশুর জন্য আদর্শ শিক্ষা পরিবেশ রচনা করা।
২. শিক্ষক তার স্বাধীনতার কোন রকম হস্তক্ষেপ না করে তার আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কাজ করার সুযোগ দেবেন। প্রয়োজনমত তাকে সাহায্যে ও পরামর্শ দিলেই চলবে।
৩. শিক্ষক শিশুকে কাজের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধানের উৎসাহিত করবেন। শুধু জানার থেকে হাতে-কলমে কাজ করা অধিকতর শ্রেয়। তাই তাকে আবিষ্কারক ও গবেষকের স্থানে বসিয়ে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবেন। কাজের পুনরাবৃত্তি নয়, যাতে নতুন কিছু সে সৃষ্টি করতে পারে তেমনি মনোভাব শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করাই হবে শিক্ষকের প্রধান কাজ।

প্রয়োগবাদ দর্শনে শিখন-শেখানো পদ্ধতি

প্রত্যক্ষভাবে ও সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করাই হবে শিক্ষাদান পদ্ধতি। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সত্য প্রতিভাত হতে হবে। ড. জগদিন্দ্র মণ্ডলের মতে, ''শিক্ষার পদ্ধতি কেবল তত্ত্বনির্ভর, শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্ভর নিষ্ক্রিয় বক্তৃতাভিত্তিক নয়, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তায় জীবনের সমস্যা সম্পাদনীকৃত যে অভিজ্ঞতা তা যে উপায়ে লাভ করা যায় তাই হবে শিক্ষার পথ, শিক্ষার পদ্ধতি।" এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মশ্রদ্ধা, পাস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভাব বেড়ে যায়।

১. শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত না থাকলেও প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে কর্মকেন্দ্রিক। কাজের মাধ্যমে শিশুরা শিখবে (Learning by doing)। সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে তারা নতুন জ্ঞান আহরণ করবে। এর জন্য তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

২. সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়ে তারা নতুন নতুন আবিষ্কার করবে। আধুনিক শিক্ষায় সমস্যা সমাধান পদ্ধতি অথবা প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রয়োগবাদীদেরই একটি বিশেষ অবদান।
৩. শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শুধু নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসেবে শিক্ষকের ভাষণ শুনবে না- তারা খেলবে, জিনিস তৈরি করবে, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে, প্রকৃতির সংস্পর্শে আসবে।
৪. জীবনযাপনের ভিতর দিয়ে তাঁরা জীবনকে বুঝাবে।
৫. নিষ্ক্রিয় চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে কাজ করার উপর প্রয়োগবাদ গুরুত্ব দেয়।

প্রয়োগবাদ প্রকৃতিবাদের পথ ধরে চলে, কিন্তু তার লক্ষ্যটি হল ভাববাদী। এটি জড় জগতের সুবিধাগুলোকে কাজে লাগায় অথচ ভাববাদের উদ্দেশ্য ও প্রবণতাকে উপেক্ষা করে না। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগবাদ, ভাববাদ ও জড়বাদের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে চলে।

কয়েকজন প্রধান প্রয়োগবাদী দার্শনিক

গ্রিক দার্শনিক হিরাক্লিটার্স (৫৩৫ খ্রি.পূর্ব), সক্রেটিস (৪৪০-৪৩৬ খ্রি.পূর্ব) ও অ্যারিস্টটল (৪৪৪-৪৪৩ খ্রি.পূর্ব), কুইনটালিন (৩৫-৯৫ খ্রি.), আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৮৯০) ও চার্লস এস. পিয়ার্স (১৮৩৯-১৯১৪), জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রি.), ইংরেজ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রি.), জন লক, বার্কলে, হিউম, সিলার প্রমূখ।

প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)

শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সৃষ্টিকারী আমেরিকার শিক্ষাবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, বাস্তববাদী শিক্ষক জন ডিউই ছিলেন একজন চিন্তাশীল মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। শিক্ষা ও দর্শনের ক্ষেত্রে রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) পর জন ডিউই-এর মতো এত বড় প্রতিভাধর কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিল কিনা সন্দেহ। শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয়তা তত্ত্ব বা প্রয়োগবাদ মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে জন ডিউই সারা বিশ্বে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের আসন লাভ করেছেন।

জন ডিউই-র জন্ম ও কর্মজীবন

জন ডিউই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ড প্রদেশের অন্তর্গত ডারমট নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন অতি নগণ্য দোকানদার। তিনি গ্রাম্য পরিবেশেই লালিত-পালিত হন। ডিউই ছোটবেলায় তাঁর পিতার দোকানে বসে তখনকার নিউ ইংল্যান্ড সম্প্রদায়ের লোকদের উচ্চ পর্যায়ের গল্পগুজব শুনতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বালক ডিউই এতেই যা শিখেছিলেন তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তি রচনা করেছিল। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভার্মন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন এবং পরে সেখানে শিক্ষক পদে যোগ দেন। তিনি পরে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী নেওয়ার জন্য জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অতঃপর পিএইচডি (Ph.D) ডিগ্রি লাভ করে তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরপর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন এবং ১৯০২-১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানকার স্কুল অব এডুকেশনের পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।

শিক্ষার প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ-অনুরাগ ছিল। পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এসব পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তিনি নিজস্ব কতগুলো শিক্ষানীতি স্থির করেন এবং ঐগুলোর বাস্তব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ খ্রিস্টব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে Laboratory School নামে একটি বিদ্যালয় চালু করেন। ৪-১৪ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। সমাজ-জীবনের সাথে সম্পর্ক রেখেই ডিউই শিক্ষাদান করতেন। উক্ত Laboratory School-এ অনেক অভিজ্ঞও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তারা জন ডিউই-এর নির্দেশনায় শিক্ষাকার্য পরিচালনা করতেন। ডিউই-এর মতে, এ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার ভাব আনয়ন এবং তাদের বিবিধ গুণের বিকাশ সাধন। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রেরণা ও উৎসাহ উন্মেষের দ্বারাই শিক্ষা গ্রহণ করবে।

ডিউই এ সময় শিক্ষা সম্বন্ধীয় বই প্রকাশ করেন। শিকাগোতে প্রকাশিত পুস্তকের নাম থেকেই তাঁর উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয়। Laboratory School খোলার সময়ে লিখিত বইয়ের নাম ছিল **Interest and Effort as Related to Will** এবং এর তিন বছর পর তিনি **The School and Society** নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং জীবনের পরবর্তী সময় ওখানে কাটান। এসময় তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অনেক পরে ১৯২৮ সালে রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হন। রুশ ভাষায় তাঁর নয়টি পুস্তক অনূদিত হয়। ১৯৩০ সালে তুরস্ক সরকার দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি সেখানকার শিক্ষা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট তৈরি করেন। তুরস্কে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের লেখক। তিনি ৪৮টি বই লিখেন। ১৯৫২ সালে ৯৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান। মারা যাবার সময়ও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ, মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ ও উৎসাহী।

ডিউই-র শিক্ষা মতবাদ ও অবদান

জন ডিউই ছিলেন বাস্তববাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, যে সকল বিষয়ের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই বা যে সকল বিষয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে অপারগ, তা শিক্ষা লাভ করা নিরর্থক। তাঁর প্রচেষ্টায় বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে কর্মকেন্দ্রিক (Activity Oriented) ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক (Experience Oriented) ব্যবস্থা শিক্ষা জগতে এক নবযুগের সূচনা করে। ডিউই-এর মতানুসারে, জন্মের পর হতে শিশু তার সমাজের সাথে পরিচিত হয় এবং অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের তার সামাজিক ভাবধারা ও আদর্শের সাথে পরিচিত করানো এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সমাজের কল্যাণ সাধন করা। সমাজের সাথে মেলামেশা করে শিশু সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে ও তার বাস্তব শিক্ষা অর্জিত হয়।সুতরাং বিশেষ প্রণালীতে শিশুকে তার পরিবারের সঙ্গে পরিচিত করাই বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। সমাজের ক্ষেত্র বিশাল। শিক্ষার উপাদানগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। কাজেই শিক্ষার উপাদানগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা আবশ্যক।

ডিউই-এর মতে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক যে কোনো পরিবর্তন হোক না কেন, শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে যেটা সব ক্ষেত্রেই প্রায় অপরিবর্তিত থেকে যায়। শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

১. সহজাত ব্যক্তিত্বের বিকাশ
২. সামাজিক উৎকর্ষতা অর্জন
৩. ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষতা লাভ।

সামাজিক কাজ-কর্মের মাধ্যমে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধনের সঙ্গেও সামাজিক শিক্ষা তিনটি এক সঙ্গে চলবে। তাঁর মতে, শিক্ষা হতে হবে বাস্তবভিত্তিক (Realistic) অযথা তত্ত্ব ও তথ্যে ভারাক্রান্ত করা সঙ্গত নয়। শিশুকে সমস্যার সামনে উপস্থিত করে তার সমাধান নিজে করে তার প্রতিভা আবিষ্কারের স্বাধীনতা দিতে হবে।বাইরের জটিল সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রয়োজন। ডিউই বিশ্বাস করতেন, বাস্তব কাজের মধ্যেই শিশু নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়। এজন্য শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বাধীনতা থাকলে শিশু কাজ করতে আনন্দ পায়, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ জাগে। সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে, কাজের সাফল্য লাভ করতে হলে শৃঙ্খলা প্রয়োজন।ডিউই-এর মতে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকে কাজ কেনো ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে চলতে পারে না। জীবন যেমন প্রতিনিয়ত নতুনভাবে বিকশিত হচ্ছে, শিক্ষাও তেমনি পরিবর্তিত হচ্ছে।

শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে ডিউই শেষ পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন, চিন্তনই (Thinking) হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষণ সম্ভব হয় সার্থক চিন্তনের ফলে। অতএব, চিন্তনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে জানলেই কার্যকরী শিক্ষা লাভ করা যায়। চিন্তনের কথা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন-

১. কোন একটি কাজের সম্পাদন;
২. সমস্যার উপলব্ধিকরণ;
৩. প্রয়োজনীয় তথ্যের অধিকারী হয়ে সে মত পর্যবেক্ষণকরণ;
৪. কোনো বিশেষ সমাধান নির্বাচনকরণ;
৫. সেই সমাধানটি কার্যকর কিনা তা বাস্তবে পরীক্ষাকরণ।

জন ডিউই প্রাচীন শিক্ষা রীতির সমালোচনা করেছেন। শিক্ষার লক্ষ্যে ও নীতি নির্ধারণের সময় নিচের কয়েকটি প্রশ্নের দিকে তাঁর চিন্তা আকৃষ্ট হয়েছিল-

১. গৃহ ও তার পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে স্কুলের নিবিড় সম্পর্ক করার জন্য কি কর্তব্য;
২. শিশুর জীবনের সত্যিকার মূল্যবান ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার বিষয়গুলোর সঙ্গে কি করে শিশুকে পরিচয় করানো যায়;
৩. ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রয়োজনের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া যায়;
৪. অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দুটি নীতির উপর নির্ভর করে-একটি হলো ঐক্য, অপরটি বৃদ্ধি ও বিকাশ। অতীতের ঐতিহ্যের উপর নতুন জ্ঞানের প্রাসাদ নির্মিত হয়।

ডিউই তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় মনের বিবর্তনের সাথে পাঠ্যসূচির সঙ্গতি বিধানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার কালকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা চলে। যথা-

ক. লেখা ও পরিবেশ পরিচয়: তিন থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত।
খ. স্বতঃমনোযোগের কাল: আট হতে বার বছর পর্যন্ত।
গ. চিন্তামূলক মনোযোগের কাল: বার বছর ও তার অধিক বয়স।

প্রথমটিতে সামাজিক নিজস্ব সরল জীবন হবে। গৃহের বাইরের জগতের সাথে এ সময় শিশু সবে পরিচিত হবে। এরপর সে যখন বৃহত্তর সামাজিক কাজে প্রবেশ করবে তখনই প্রথম পরিচয় হবে লিখন ও পঠনের সঙ্গে।দ্বিতীয়টিতে মনোযোগের কালে শিশুকে নানারূপ জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। কাজের ভিতর দিয়ে শিশু এ জ্ঞান আহরণ করবে। তৃতীয়টিতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চিন্তাশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। এ সময় সব জিনিসই বিস্তৃতভাবে শিখতে হবে। পাঠ্য তালিকায় অনেকগুলো বিষয়বস্তুর সমাবেশ হতে পারবে। ডিউই-এর মতে,শিক্ষা হবে উদ্দেশ্যমূলক। প্রাচীনপন্থীদের মতো ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতই শিক্ষা-এ মতবাদে ডিউই বিশ্বাসী নন। তিনি বলন, বর্তমান জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা।

বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য ও আকারসর্বস্ব প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি পদ্ধতিগুলোর তীব্র সমালোচনা করে প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন রুশো। পেস্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হার্বার্ট সেই নতুন আদর্শের বিশেষ বিশেষ দিক অনুসরণ করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ডিউই নিজের প্রতিভা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সযত্ন অধ্যবসায়ের সাহায্যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্বের অধিকারী।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের অবদান

আধুনিক শিক্ষায় প্রয়োগবাদের প্রভাব অপরিসীম। সত্যের প্রকৃতি নির্ধারণে ভাববাদ ও জড়বাদের মধ্যপন্থী হল প্রয়োগবাদ। পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই প্রয়োগবাদের আধুনিক তত্ত্বগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের অবদান নিম্নে বর্ণনা করা হল–

১) **বাস্তব সমস্যার সমাধান:** সক্রিয়তা হল নতুন জ্ঞান বা সত্যে পৌঁছানোর একমাত্র পাথ। সক্রিয়তা শুধু অঙ্গ সঞ্চালন নয়; সক্রিয়তা হল বাস্তব সমস্যার সমাধান ও সত্য আবিষ্কারের অপরিহার্য পন্থাবিশেষ, প্রয়োগবাদের এ তত্ত্বটি থেকেই নানা আধুনিক সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে বাস্তব সমস্যার সমাধানে পৌঁছে থাকে।

২) **অভিজ্ঞতার পুর্নগঠন:** শিক্ষার অপর নাম অভিজ্ঞতার পুর্নগঠন। শিক্ষার্থীর শিক্ষা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে না এটাও প্রয়োগবাদ দর্শনই ব্যক্ত করেছে।

৩) **বিদ্যালয়কে গবেষণাগার:** দর্শন যেন নতুন ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে সেগুলোর উপযোগিতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখাই হল শিক্ষার কাজ। সে দিকে থেকে বিদ্যালয় নতুন আদর্শ ও ভাবধারার পরীক্ষাগার। সেজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে জ্ঞান বিতরণের প্রতিষ্ঠান না করে সেগুলোকে চিন্তা ও ভাবধারার গবেষণাগার করে তুলতে হবে। এ সুন্দর চিন্তাধারাও প্রয়োগবাদ দর্শনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪) **সার্থক শিক্ষা:** শিক্ষার্থীর সার্থক শিক্ষা তার ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী হবে-এ সত্যটির উপস্থাপকও প্রয়োগবাদ দর্শন।

৫) **পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য:** প্রজেক্ট মেথড শিক্ষণ পদ্ধতি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনি এমনভাবে প্রাণ লাভ করে যে, সমস্ত শিক্ষণ প্রক্রিয়া প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে এমন বৈচিত্র্যতা প্রয়োগবাদ দর্শনের পূর্বে আর ছিল না।

৬) **জীবনকে জানা:** জীবনের মধ্যে থেকে জীবনকে জানা, প্রাণের মধ্যে থেকে প্রাণের স্পন্দনকে উপলব্ধি করা প্রয়োগবাদ দর্শনেই ফুটে উঠেছে।

৭) **গণতন্ত্রের উন্মেষ:** শিক্ষাক্ষেত্রে সব শিক্ষার্থীকে সমানভাবে দেখা, সমান সুযোগ দেয়া এবং আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থা যেমন ব্যাপক তেমনি বহুমুখী হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকে না। এ ধারণা প্রয়োগবাদ দর্শনেই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

৮) **মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ:** শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদাপূর্ণ করার প্রচেষ্টা এবং এজন্য শিক্ষা জগতে জাগরণ ও নতুন মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ- তাও প্রয়োগবাদ শিক্ষা দর্শনেরই অবদান।

৯) **বিচারবোধের প্রতি আস্থা স্থাপন:** মানুষের সমাজ-সংসার সবই বিচারবোধের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকাংশে বেড়ে গেছে। বিচারবোধের প্রতি মানুষের এ আস্থা স্থাপন প্রয়োগবাদ দর্শনেরই অবদান।

১০) **প্রয়োগবাদের ফলশ্রুতি:** মানুষের বিজ্ঞান সাধনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের উন্মেষ, জগতের পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিদান এবং এর সাথে খাপ খাইয়ে চলা ইত্যাদি প্রয়োগবাদ দর্শনেরই ফলশ্রুতি।

১১) **গবেষণামুখী:** মানুষকে সজাগ ও গবেষণামুখী এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে সচেতন করতে সাহায্য করেছে প্রয়োগবাদ দর্শন।

১২) **শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ:** শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, শিশুর ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার এ লক্ষ্য প্রয়োগবাদ দর্শনে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

১৩) **শিশুর সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা:** শিশুর আচরণের পুরোপুরি স্বাধীনতা, তার বিকাশ প্রক্রিয়া যাতে স্বাভাবিকভাবে এগোতে পারে তার জন্য সব ধরনের স্বাধীনতা, তার কাজের প্রকৃতি, পদ্ধতি, সংগঠন সব ক্ষেত্রেই যাতে সে নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কাজ করতে পারে সেজন্য সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

১৪) **সামাজিক পরিবেশ থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টি:** শিশুর উপর কোন রকম কৃত্রিম নিয়ম-শৃঙ্খলা আরোপ করা যাবে না। শিশুর শৃঙ্খলা নিজের ও সামাজিক পরিবেশ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রয়োগবাদ দর্শন প্রথম শিশুর নিয়ম কানুন বা শৃঙ্খলার কথা ব্যক্ত করেছে।

২.৪ প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

প্রকৃতিবাদ দর্শনের মতে প্রকৃতি (Nature) হল বাস্তব আর সব মিথ্যা। প্রকৃতিবাদী দার্শনিকরা সবকিছুকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেন। রাস্ক (Rusk) বলেছেন,"Naturalism is a philosophical position adopted by those whoes approach of philosophy form purely scientific point view. প্রকৃতিবাদ দর্শনকে ভাববাদী দর্শনের ঠিক বিপরীত বলে অনেকে মনে করেন। প্রকৃতিবাদ দর্শনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বহু চিন্তাধারা বিদ্যমান থাকলেও এর মধ্যে একটি সমতা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবাদীদের মতে, বস্তু জগতের যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই বাস্তব আর অন্য সবই মিথ্যা। মানুষ জড় পরিবেশে বাস করে আর এ পরিবেশই তার জন্য বাস্তব। বিশ্বব্রাহ্মণ্ডের যাবতীয় নিয়মাবলি প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত এবং বস্তুর যাবতীয় পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রকৃতির নিয়মেই হয়ে থাকে।

প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানীগণ প্রকৃতিবাদকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১) জড়বাদী প্রকৃতিবাদ (Physical Naturalism) অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ এবং প্রকৃতি দ্বারাই তার অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিবাদের নিয়ম-কানুন অনুসারে মানুষের জীবন অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করা যায়।

২) প্রকৃতিবাদীগণ মনে করেন জড় জগতের বিধি অনুসারে বিশ্বজগৎ চলছে। সমগ্র বিশ্ব একটি বিশাল যন্ত্রবিশেষ। মানুষ তারই অংশ। বিশ্ব যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাকে যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যেতে হয়। তাই প্রকৃতিবাদের এ অংশটিকে যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ (Mechanical Naturalism) বলা হয়।

৩) প্রকৃতিবাদের তৃতীয় ধারা হলো জৈব প্রকৃতিবাদ (Biological Naturalism)। মানুষ বিশ্বের জীব জগতের একটি অংশবিশেষ। মানুষ অন্য জীবের চেয়ে সহজাত প্রবৃত্তির জন্য আলাদা । যেমন- প্রক্ষোভ, আবেগ, বুদ্ধি-বিবেচনা, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি।

প্রাচীন যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হতেন বিশেষ একটি গোষ্ঠী। তারা স্বার্থপর, অর্থপিপাসু এবং অহঙ্কারী হতেন। তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি মনে করতেন। আধুনিক যুগের সূচনাতে মানব সমাজে নবজাগৃতি ঘটছে। মানুষ মুক্ত বুদ্ধি ও চেতনা দ্বারা নতুন সমাজ গড়ছে। প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন এক্ষেত্রে ভাববাদের কোনো প্রাধান্য নেই। বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তা-চেতনার মাধ্যমেই পৃথিবী বর্তমান আধুনিকতার স্তরে এসেছে। প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুকে বর্তমান জীবনের উপযোগী করে তোলা। এর ফলে শিশুরা পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। আবার জীবিকা অর্জনেও সক্ষম হবে। শিশুর সুখ,আনন্দ ও উল্লাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পক্ষপাতী। পরিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তুতিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রকৃতিবাদীদের মধ্যে অনেকে সমাজ স্বীকৃত বাঞ্ছনীয় ফলশ্রুতির জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণের পক্ষে মত দিয়েছেন। জৈব প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী বার্নার্ড 'শ (Bernard Shaw)-এর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে সাংস্কৃতিক সংলক্ষণগুলো সংরক্ষণের মাধ্যমে উচ্চতর মানুষের বিকাশ। শিক্ষাবিদ পারসিনানের (Percy Nun) মতে. ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতা আনাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রকৃতিবাদী দার্শনিকরা শিশুর মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে শিক্ষাকে সামনে নিয়ে যেতে চান। প্রকৃতিবাদীদের মতে, যা স্বাভাবিক তাই শিশুর শিক্ষাক্রমে আসবে। কোনো রকম কৃত্রিমতা শিশুর শিক্ষাক্রমে স্থান পাবে না। শিশুর নিজস্ব চাহিদা, প্রবণতা, আগ্রহ ও ক্ষমতার উপার ভিত্তি করেই রচিত হবে শিশুর শিক্ষাক্রম। প্রকৃতির কাছ থেকে সে সরাসরি জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু শিখবে। আধুনিক প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদরা শিশুর লিখন, পঠন ও হিসাব-নিকাশের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় (Nature Study),বাগান (Gardening)এবং শরীর চর্চার (Exercise)উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উচ্চ শ্রেণিতে তারা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিষয় পড়বে। গতিশীল প্রয়োগবাদী ধারণা যেমন- কার্যের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning by Doing), আবিস্কার পদ্ধতি (Heuristic Method),মন্টেসরী, কিন্ডারগার্টেন, ডাল্টন প্ল্যান ইত্যাদি প্রকৃতিবাদ থেকে উদ্ভূত।

শিশুর শিক্ষা জীবন নকল শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হবে না-স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলায় তারা শিক্ষালাভ করবে। প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা সকলের কাম্য, শিশুরা তা মেনে চলবে। কিন্তু তা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। শৃঙ্খলা যেন শৃঙ্খল না হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসে শাস্তির ভয় ছাড়া কি শৃঙ্খলা আসবে? শিশুকে তার অপরাধ পরিমাণ শাস্তি দেওয়া যাবে। শিশুর শৃঙ্খলা হবে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। শিক্ষক ও পিতামাতা কর্মভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রাসঙ্গিকসহ শিক্ষাক্রমিক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনয়ন করে। ভাববাদী দর্শনে শিক্ষক সর্বেসর্বা কিন্তু প্রকৃতিবাদ দর্শনে শিক্ষক থাকেন নেপথ্যে।

প্রকৃতিবাদের মূল বক্তব্য

প্রকৃতিবাদীদের মতে, যা স্বাভাবিকভাবে বা প্রকৃতিগতভাবে দেখা যায় এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা যায় তাই সত্য। প্রকৃতিও সত্য। প্রকৃতির সবই সত্য। বহিঃপ্রকৃতি, অন্তর প্রকৃতি দুই-ই সত্য। জড়প্রকৃতি যেমন সত্য মনোপ্রকৃতিও তেমনি সত্য। স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৃতিতে যা বর্তমান তার সবই সত্য। প্রকৃতিই মূল শক্তি এবং সৃষ্টির মূল কারণ। এ মতবাদ প্রকৃতির মধ্যে যে কার্যকরণ সম্পর্ক আছে তার প্রেক্ষিতে জগতের সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে, সব প্রাকৃতিক ঘটনাই কঠোর নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। বাইরে থেকে প্রকৃতিকে বিশৃঙ্খল ও সঙ্গতিবিহীন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সবকিছু সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত নিয়ম-কানুন অনুসারে চলে।

ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০),এপিকিউরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩৫-৩৫৫), জন এ্যামোস কমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০), জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮), জোহান হেনরিক পেস্টালৎসী (১৭৭৬-১৮২৭), হার্বাট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩),ডারউইন, ফ্রয়েবেল, টমাস হব্‌স, হাক্সলে, জন লক প্রমুখ। প্রকৃতিবাদের প্রবক্তা হলেন অ্যারিস্টটল। রুশো হলেন চরম প্রকৃতিবাদী। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিবাদের একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন।

বিভিন্ন দার্শনিকের দৃষ্টিতে প্রকৃতিবাদ

ডেমোক্রিটাস (খ্রিঃ পূর্ব ৪৬০-৩৭০): গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটিস প্রকৃতিকে চরম বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে, ''প্রকৃতির বাহ্যিক পদার্থগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দ্বারা তৈরি এবং অণুই যাবতীয় পদার্থের মৌলিক উপাদান হিসেবে পরিচিত। তাই মানুষকে প্রকৃতিক বাহ্যিক নিয়মানুসারে জীবনযাপন করে ছলচাতুরী, হীনতার শিক্ষা নেয়া উচিত নয়।

জন অ্যামোস কমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০): তাঁর মতে, শিশুদেরকে প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। বিশেষ করে (১-৭) বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে তার মতবাদ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ সময়ে তাদেরকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। তাঁর মতে, ''শিক্ষা হবে প্রকৃতি এবং জীবন থেকে, বিদ্যালয় থেকে নয়।"

জোহান হেনরিক পেস্টালৎসী (১৭৭৬-১৮২৭): তাঁর মতে, শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী এবং মানুষের তৈরি প্রথার চেয়ে প্রকৃতির আইন অনুসরণ করা হবে অনেক মঙ্গলজনক।

হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩): হার্বার্ট স্পেন্সার একাধারে বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী হিসেবে দর্শনের ইতিহাসে পরিচিত।কীভাবে প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তববাদ ও প্রয়োগবাদ অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তিনি তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি এ দর্শনকে সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি সংগঠন কাজে লাগান এবং আমেরিকায় তা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি প্রকৃতিকে চরম বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ও ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে বাস্তবধর্মী জ্ঞানলাভ করবে এবং জানা বিষয়েও নিপুণ ব্যবহারের অধিকারী হবে। উদ্দেশ্য ও নীতিমালা রূপায়ণে বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র তাঁর মতবাদ ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকৃতিবাদের মূলনীতি

১. দৃশ্যমান জগতই সত্য, আর সব মিথ্যা। জড়বস্তুই প্রকৃত বাস্তব, মন বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতিবাদ আধ্যাত্মিকতার চরম বিরোধী।
২. প্রকৃতিবাদীরা জগতের সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বের সবকিছুকে তাঁরা জড়বস্তু, শক্তি ও গতি দ্বারা বিচার করেন।
৩. প্রাকৃতিক কোন ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতি কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলে।
৪. প্রাকৃতিক সকল ঘটনা সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুযায়ী ঘটে। মানুষ এই প্রকৃতির একটি অংশ সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে মানবজীবনের রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের সামর্থ্য বা ইচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।
৫. প্রকৃতিবাদীদের মতে, মানসিক সুখ হতে দৈহিক সুখই অধিকতর কাম্য। তাঁরা মনে করেন সুখই (Pleasure)জীবনের কাম্যবস্তু, জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁদের মতে, যে কাজ সুখদায়কম সে কাজ ভাল, যে কাজ সুখকর নয় সে কাজ মন্দ।
৬. প্রকৃতিবাদীদের সিদ্ধান্ত হল, সমাজের সবকিছুই কৃত্রিম। তাই তাদের নির্দেশ-'প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও'(Go back to nature). সৃষ্টিকর্তা সব কিছুকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সেগুলোকে খারাপ করেছে।

প্রকৃতিবাদ দর্শনে শিক্ষা

মানবজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জন্মের পর থেকেই শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং তা চলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। প্রাচীন যুগে মানুষ ছিল অসহায়। খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য তারা বিভিন্ন রকমের কৌশল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এভাবে ক্রমাগত শিক্ষালাভের মাধ্যমে মানব জাতি বর্তমান সভ্য জগতে এসে উপনীত হয়েছে। শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভের একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল। মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। শিক্ষাবিদ ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, ''শিক্ষা হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এ শিক্ষাদানের ব্যাপারে সহায়তা করে।"অর্থাৎ পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের লক্ষ্যে জন্মের পর থেকে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ, আচরণের পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠার নামই শিক্ষা।

প্রকৃতিবাদ দর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য

প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। কোনরূপ কৃত্রিম শৃঙ্খলা শিশুর উপর আরোপ করা যাবে না। প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর নিবিড় সম্পর্ক হবে। সক্রিয়তার ভিত্তিতে শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধনই শিশুর লক্ষ্য। এছাড়া অসৎ আদিম প্রকৃতিকে নির্মূল করে তার জায়গায় সৎ প্রকৃতি স্থাপন করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শিশু যাতে তার প্রকৃতিগত চাহিদা, সামর্থ্য, পছন্দ ও আগ্রহ অনুযায়ী শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিশুকে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা দেয়া, স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া, শরীরকে সবল করা ইত্যাদি হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রকৃতিবাদ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ না দিলেও বিভিন্ন প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের মতামত বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি লক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন−

ক. **আত্ম-সংরক্ষণ (Self Preservation)**: জীবনের মূলহল আত্ম-সংরক্ষণ। জীবন সংগ্রামে যে জয়ী হয় সেই শুধু বেঁচে থাকে। সুতরাং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শিশুকে জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

খ. **আত্ম-বিকাশ (Self Expression):**ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই হবে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। পার্সিনান-এর ভাষায় "Development of individuality is the central aim of education." শিশু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করে। সমাজের কোন প্রভাব তার উপর থাকবে না।

গ. **বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখলাভঃ** বর্তমানে ও ভবিষ্যতে শিশু যাতে সুখলাভে সমর্থ হয় শিক্ষাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বর্তমানের শিক্ষা শিশুর কাছে প্রীতিপদ হবে এবং শিক্ষালাভ করে ভবিষ্যতে শিশু যাতে সুখের অধিকারী হতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঘ. **অভ্যাস সৃষ্টিঃ** মানুষকে যথোপযুক্ত সুদক্ষ কার্যকর একটি যন্ত্র হিসাবে তৈরি করতে হবে। এরজন্য আধুনিক জগতের উপযুক্ত কতকগুলো অভ্যাস শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করে দিতে হবে।

ঙ. **প্রবৃত্তির উদ্‌গতি সাধনঃ** সুখ অথবা দুঃখ আমাদের কাজের পরিণাম। প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ যে কাজ করে তাই তাকে সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং শিশু যাতে উত্তরকালে সুখী হয় তার জন্য তার প্রবৃত্তির উদগতি সাধনই লক্ষ্য।

রুশো তাঁর 'এমিল' বইটিতে *এমিল* নামে একটি ছেলের শৈশব থেকে শিক্ষা কী রকম হওয়া উচিত তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। 'এমিল' অর্ধ উপন্যাস, অর্ধ আলোচনামূলক গ্রন্থ। এমিলকে তার পিতার কাছ থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এক আদর্শ শিক্ষকের হাতে তুলে দেয়া হল। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভাবসম্পদের ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে 'এমিল' সেখানে শিক্ষালাভ করল। তার শিক্ষা হল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি অনুযায়ী। প্রকৃতিবাদীদের মতে, প্রকৃতির সৃষ্টিকারীর হাত থেকে যা কিছু আসে তাই ভাল কিন্তু মানুষের হাতে সবকিছুই বিকৃত হয়ে যায়।

রুশোর মতে, মানুষ শিক্ষালাভ করে তিনটি উৎস থেকে। যথা-

১. প্রকৃতির কাছ থেকে
২. মানুষের কাছ থেকে
৩. বহির্জগতের কাছ থেকে

যদি এ তিন উৎসের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য আনা না যায় তবে সে ব্যক্তির শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে এ তিন ধরনের শিক্ষা সমন্বয় লাভ করে তাঁর শিক্ষাকেই সার্থক শিক্ষা বলা চলে। রুশোর মতে,মানুষের কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করা যায় তার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করা যায় সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং মানুষ এবং প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে আর সে সামঞ্জস্য মানুষ আনবে। প্রকৃতির শিক্ষা অনুযায়ী শিশুর অন্য সব শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষায় তার উল্টোটি করা হয়। পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকেই বড় করে তোলা হয়। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবহেলা ও অবদমিত করা হয়।

প্রকৃতিবাদ দর্শনে শিক্ষার্থী

আত্ম-সংরক্ষণ জীবনের মূলনীতি। প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের মতে, **যেসব** বিষয় আত্ম-সংরক্ষণের সহায়ক সেগুলো শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো পাঠ্যতালিকায় থাকবে। যথা- প্রকৃতিবিজ্ঞান, উদ্যান বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি। কৃষ্টিমূলক বিষয় বা মানবধর্মী বিষয়গুলোকে প্রকৃতিবাদীরা শিক্ষাক্রমের স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী নন।

১. শিক্ষার্থী প্রকৃতিরই একটি অংশ; প্রাকৃতিক নিয়মে শিক্ষার্থীর জীবনের রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়;
২. যেহেতু শিক্ষার্থীর জীবন প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই প্রাকৃতিক নিয়ম ভালভাবে মেনে চলার জন্য তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়;
৩. শিক্ষার্থী একটি যন্ত্রমাত্র, প্রকৃতির নিয়মে এটি কাজ করে;
৪. শিক্ষার্থী স্বভাবতই সরল ও পবিত্র;
৫. শিক্ষার্থী নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে।

প্রকৃতিবাদ দর্শনে শিক্ষক

১. শিক্ষকের ভূমিকা হবে দর্শকের, তিনি শুধু শিশুর বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখবেন।
২. প্রকৃতিবাদী শিক্ষা শিশুর আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী তাকে পছন্দমত কাজের স্বাধীনতা দিবেন। শিক্ষার্থীর কাজে কোন বাধা আরোপ করবেন না, তিনি থাকবেন অন্তরালে।
৩. তিনি শুধু শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
৪. ''আদর্শ চরিত্র গঠন" সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে তিনি কোনো উপদেশ প্রদান করবেন না।
৫. 'শিক্ষার্থী পূর্ণবয়স্ক মানুষ হবার আগে একটি পবিত্র শিশু',একথা মনে রেখে শিক্ষক কাজ করবেন।

প্রকৃতিবাদ দর্শনে শিক্ষণ পদ্ধতি

প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুশো শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন,-'শিশুকে কোন মৌলিক শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, সে তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখবে (Give your scholar no verbal Lssons, he should be taught by experience).'

শিক্ষার্থীর কাজে তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে, সে হাতে কলমে নিজে কাজ করতে শিখবে। বাইরে থেকে কিছু শিখাবার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিখবে পরীক্ষাগারে, জ্যামিতি শিখবে খেলার মাঠ ও অন্যান্য জমি জরিপ করে, ভূগোল শিখবে পর্যটনের মাধ্যমে। সমাজের আইন কানুন শিখবে বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত শাসনের মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে মর্যাদা দিতে হবে, তারা যা কিছু শিখবে সবই ক্রীড়াচ্ছলে প্রকৃতিবাদী দার্শনিকগণ শিশুর লিখন, পঠন ও হিসাব নিকাশের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় (Nature study), বাগান করা (Gardening) এবং শরীর চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উচ্চ শ্রেণিতে তারা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় পড়বে। গতিশীল প্রয়োগবাদী ধারণা যেমন - কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning by doing), আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuirisrtic Method), মন্টেসরী, কিন্ডার গার্টেন, ডাল্টন প্ল্যান ইত্যাদি প্রকৃতিবাদ থেকে উদ্ভুত।

শিক্ষা হবে সহশিক্ষামূলক, ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে শিখবে, তাদের পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে পরস্পরের মধ্যে অস্বাভাবিক মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিবাদী দর্শনের অবদান। শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তাত্তিক ধারা এসেছে প্রকৃতিবাদীদের কাছ থেকে। তাঁদের মতে, শিক্ষার্থী নিজস্ব আগ্রহ, পছন্দ সামর্থ্যই শিক্ষার বিচার্য বিষয়। সেখানে শিক্ষকের প্রভূত্ব, বিদ্যালয়ের কৃত্রিম পরিবেশ, নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির বোঝা অথবা গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতির কোন স্থান নেই। প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য হল, শুধু বিনা বাধায় শিশুকে আত্ম-বিকাশের সুযোগ দেয়া। কিন্তু শিক্ষার্থীর আত্ম-বিকাশ যদি প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা আপনি হয় তবে আর শিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? তাই শিক্ষার এই নেতিবাচক ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ভাববাদের দ্বারা প্রকৃতিবাদের সংশোধন প্রয়োজন, কারণ ভাববাদই শিক্ষার একটি সন্তোষজনক লক্ষ্যের নির্দেশ প্রদান করতে পারে।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিক জ্যা জ্যাঁক রুশো (১৭১২-১৭৭৮)

দর্শন জগতে জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হিসেবে অধিক পরিচিত। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা ও দর্শনের ইতিহাসে রুশো এক স্মরণীয় মহাপুরুষ। শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। তাঁর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানের বহু শিক্ষানীতি গড়ে উঠেছে।

জন্ম পরিচিত: বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণে করেন। জন্মের পর পরই মাতৃবিয়োগ ঘটে। সৎ মায়ের ঘরে অবহেলা অনাদরে বড় হন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ ঘড়ি বিক্রেতা। বিদ্যালয়ে তিনি বেশিদূর পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারেননি। কারণ একদিকে ছিল আর্থিক অস্বচ্ছলতা আর অন্যদিকে বিদ্যালয়ের কৃত্রিম নিয়ম-কানুন তাঁর ভালো না লাগা । তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী ও অনুভূতিশীল। তিনি রাষ্ট্রনীতির ওপর Social Contract (১৭৬২) এবং শিক্ষানীতির উপর Emil নামক দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি ১৭৭৮ খ্রি. ৬৬ বছর বয়সে মারা যান।

দার্শনিক রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব

রুশো ছিলেন একজন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে যে মূল্যবান তত্ত্ব দিয়েছেন সেগুলো তাঁর বিখ্যাত *এমিল* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বানুযায়ী শিক্ষার মূলনীতিগুলো হলো–

- শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানার্জন নয়-বরং শিক্ষার্থীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা দেহ-মনের পূর্ণবিকাশ সাধন।
- শিক্ষা একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া, যা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যায় না।
- শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত হবে শিক্ষার্থীর নিজের ইচ্ছা, প্রবণতা ও চাহিদার মাধ্যমে।
- শিক্ষাদানের আগে শিক্ষককে অবশ্যই ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের জেনে নিতে হবে।
- শিক্ষা কর্মসূচি হবে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সমাজের চাহিদানুযায়ী।
- শিক্ষা গ্রহণ হবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।
- শিক্ষার্থী ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করবে প্রকৃতি হতে।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার স্তর

রুশো তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে শিশুর শিক্ষাকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা-

প্রথম স্তর (১-৫ বছর পর্যন্ত): এ সময়ে শিশুকে তার ক্ষমতা, ইচ্ছা, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এ পর্যায়ের শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুকে শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল করে তোলা। এ পর্যন্ত পিতা হবেন শিক্ষক এবং মাতা হবেন সেবিকা।

দ্বিতীয় স্তর (৫-১২ বছর পর্যন্ত): এ সময়ে শিশুকে কোনো মৌখিক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতি হতে নিজেই শিক্ষালাভ করবে। এ সময়ের শিক্ষা শিশুর ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

তৃতীয় স্তর (১২-১৫ বছর পর্যন্ত): কৈশোর এবং যৌবনের মিলনস্থল হচ্ছে এ সময়টি। একে বয়ঃসন্ধিকাল (adolescence) বলে। শিক্ষার জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট সময়। এ সময়ে শিশুর মনে নানা ধরনের কৌতূহল জাগে। সুতরাং তার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ স্তরে তাকে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

চতুর্থ স্তর (১৫-২০ বছর পর্যন্ত): এ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সাথে নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের ওপর জোর দিতে হবে। এ সময় তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা ও সমাজ চেতনা জাগাতে হবে।

প্রকৃতিগত শিক্ষা (Nature based Educaton)

রুশোর মতে, প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষাই হল আদর্শ ও সার্থক শিক্ষা। তিনি 'প্রকৃতি' কথাটিকে ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহার না করে তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। যথা-

১. মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (Psychological Nature)
২. জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি (Biological Nature)
৩. বস্তুজাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature)

তাঁর মতে, শিশুর শিক্ষা এ তিন রকম প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

১. **মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (Psychological Nature):** মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বলতে বুঝায়, শিশুর প্রকৃতি-প্রদত্ত শক্তি, সম্ভাবনা, চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদির সমন্বয়কে। শিশুর শিক্ষা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত করতে হবে।সাধারণত শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদির চাপে তার এ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলোর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়ে যায় এবং তাকে কতকগুলো কৃত্রিম আচরণ ও অভ্যাস শিখতে বাধ্য করা হয়। রুশোর মতে, এ শিক্ষা হল প্রকৃতি বিরোধী।

২. **জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি (Biological Nature):** জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি বলতে বুঝায় শিশুর সে প্রকৃতিকে, যা শিশু ব্যক্তিগত প্রাণীরূপে সঙ্গে নিয়ে জন্মেছে। জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ মতবাদটি বিবর্তনবাদ থেকে এসেছে। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী ক্ষুদ্রতম এককোষী প্রাণী থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন প্রাণী আকৃতির রূপান্তরের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানব আকৃতিতে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং, মানবজাতির মধ্যে যেসব কু-প্রকৃতির অসৎ মনোভাব, দুর্নীতি ইত্যাদি যা আজকাল মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা সে প্রকৃতির কাছ থেকে পায়নি, পেয়েছে পরিবেশের কাছ থেকে। রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার আগে মানুষ যে অবস্থায় বাস করত রুশো তার নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক অবস্থা (Natural State) আর প্রাকৃতিক মানুষ। রুশোর মতে, এ প্রাকৃতিক মানুষ ছিল সৎ, মহান ও সুন্দর। তাদের মধ্যে ছলনা, নীচুতা বা অসৌন্দর্যের স্থান ছিল না। এক কথায়, তারা ছিল বিশুদ্ধ প্রকৃতির । এ ধরনের মানুষের দয়া, মমতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছে। কিন্তু সমাজ এবং অন্য সংস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক মানুষের এ বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিকৃত ও কলুষিত হয়ে যায়। শিশু যখন জন্মায় তখন তার জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি থাকে বিশুদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু সে মুহূর্ত থেকেই তার সে প্রকৃতি বিকৃত ও কলুষিত হতে শুরু করে। অতএব শিশুর জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ হল যে, শিশুকে সমাজের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। শিশুর শিক্ষাকে পূর্ণভাবে পরিচালিত হতে দিতে হবে প্রকৃতির চাহিদার দ্বারা, কোন শক্তি বা অনুশাসনের দ্বারা নয়।

৩. **বস্তু জাগতিক প্রকৃতি (Physical Nauture):** বস্তু জাগতিক প্রকৃতি বলতে বুঝায় গাছপালা, নদী, পাহাড়, আকাশ-বাতাস, রোদ-পানি, পশু-পাখি ইত্যাদি নিয়ে জগতের যে প্রকৃতি তাকে। এ প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর শিক্ষা হবে পরিকল্পিতভাবে। শিশুকে সুযোগ দিতে হবে যাতে সে প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারে। খোলা মাঠে মুক্ত হওয়ায় ঘুরে ফিরে, রোদে পুড়ে, পানিতে ভিজে, পশু-পাখির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে সে যেন প্রকৃতির রূপ রস ও সৌন্দর্যকে অনুভব করতে পারে। এক কথায় শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো আহরণে তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষাদাতা হবে প্রকৃতি। তিনি শহরের জীবন থেকে গ্রামের জীবনকে উঁচুতে স্থান দিয়েছেনে। শহরকে তিনি মানবজাতির সমাধিস্থান বলে আখ্যায়িত করেছেন। রুশোর এ শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গঠন করা যায়।

নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)

প্রাচীনকালে মনে করা হত যে, শিশু যে প্রকৃতি নিয়ে জন্মায় সে প্রকৃতি থাকে অসৎ। এ অসৎ আদিম প্রকৃতিকে নির্মূল করে তার স্থানে সৎ প্রকৃতি স্থাপন করাই হল শিক্ষার প্রধান কাজ। সুতরাং, শিশুকে প্রথম দিক থেকে কঠোর ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের মধ্যে রাখতে হবে। রুশোর মতে, আদিম প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ প্রকৃতির। সুতরাং, শিশুর প্রথম জীবনের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)। তাঁর মতে, এ শিক্ষাকালে শিশুকে কোন সত্য বা সৎগুণ শেখান হবে না। তার মন কোন মন্দের দিকে না যায়, সে কোন ভুল না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিশুর শিক্ষাকে সম্পন্ন করতে হবে শিশুর প্রকৃতি, নানা প্রকার সহজাত শক্তি, সামর্থ্য এবং তার আগ্রহের বাধাহীন বিকাশের মধ্যে দিয়ে। শিশুকে সব ধরনের স্বাধীনতা দেয়াই নেতিবাচক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। শিশু তার নিজের চাহিদামত শিখবে, কাজ করবে। তাকে কোন বাধা দেয়া যাবে না, কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষা দেয়া যাবে না। সে স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমত বিষয়গুলো শিখবে। এ সময়ে কিছু না শেখানোই হবে প্রকৃত শিক্ষা।

রুশোর মতে, শিশু এ সময় কোন সৎগুণ না শিখলেও মন্দগুণ থেকে তার মনকে মুক্ত রাখে। আবার সে কোন সত্য আহরণ করে না ঠিকই কিন্তু কোন মিথ্যাও তার মনে প্রবেশ করতে পারে না। যখন সে বড় হয় তখন তার ইন্দ্রিয়গুলো পরিণত হয়ে উঠে এবং যখন সবকিছু বুঝার মত তার বয়স হয় তখন সে জ্ঞান, সত্য ও সৎকে নিজে থেকেই চিনে নিতে পারে এবং সেগুলোকে ভালবাসতে শিখে ও এগিয়ে যায়।

নারী শিক্ষা (Women Education)

নারী শিক্ষা সম্পর্কে রুশো তাঁর মতবাদ প্রদান করেছেন। ছেলেদের শিক্ষা সম্পর্কে রুশোর অভিমত প্রগতিশীল হলেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর মতামত অত্যন্ত রক্ষণশীল। তিনি নারী শিক্ষায় কোন প্রকার স্বাধীনতা সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে, নারী শিক্ষা অস্তিবাদক এবং কঠোর নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি নারীদেরকে স্বামীর সেবা ও গৃহকাজের উপযোগী শিক্ষাদানের পক্ষপাতী।

বাংলাদেশের শিক্ষায়রুশোর প্রভাব

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তন আনার জন্য প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। রুশো হচ্ছেন আধুনিক শিক্ষার জনক। তাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা, আগ্রহ, প্রবণতা, ক্ষমতা, রুচি, ইচ্ছা প্রভৃতি অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন রুশের শিক্ষাতত্ত্বের প্রতিফলন। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। এ নীতিকে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থায় যে আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন হচ্ছে তার বেশির ভাগই রুশোর তত্ত্ব থেকে নেওয়া।আধুনিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় রুশোর অবদান অপরিসীম। তাঁর তত্ত্বে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা জগতে বিশেষ করে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। শিক্ষা ব্যবস্থায় তার নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন হলে শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদের মধ্যে তুলনা

বিষয়বস্তু	ভাববাদ	প্রকৃতিবাদ	প্রয়োগবাদ
১. মূলসুর	ভাববাদ দর্শনের মতে, দৃশমান জগৎ ছাড়া আরও একটি জগৎ আছে, তাহল আধ্যাত্মিক জগত।	প্রকৃতিবাদ দর্শনের মতে, দৃশ্যমান জগতই সত্য আর সব মিথ্যা।	প্রয়োগবাদদর্শনের মতে, যার উপযোগিতা আছে তাই ভাল, যা ভাল তার উপযোগিতা আছে। জীবনের কোন পূর্ব নির্দিষ্ট মান বা মূল্যবোধ নেই যা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।
২. সমর্থক	এই মতবাদের সমর্থক হলেন, প্লেটো, ফিকটে, হেগেল, কান্ট, ফ্রয়েবেল, স্পিনোজা প্রমুখ।	এই মতবাদের সমর্থক হলেন এরিস্টটল, ফ্রয়েবেল, পেস্তালৎসী, লক, রুশো, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ।	এই মতবাদের সমর্থক হলেন ডিউই, কিলপ্যাট্রিক, উইলিয়াম জেমস, স্কিনার, প্রায়ার্স প্রমুখ।
৩. শিক্ষার লক্ষ্য	ভাববাদ দর্শনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি।	প্রকৃতিবাদ দর্শনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মপ্রকাশ ও আত্মসংরক্ষণ	প্রয়োগবাদদর্শনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য মূল্যবোধের জাগরণ।

বিষয়বস্তু	ভাববাদ	প্রকৃতিবাদ	প্রয়োগবাদ
৪. শিক্ষাক্রম	এর শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু হল, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক জ্ঞান।	এর বিষয়বস্তু হল, বস্তুমুখী জ্ঞান।	এর বিষয়বস্তু হল, সমঞ্জস্যপূর্ণ, সমন্বিত উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞান।
৫.শিক্ষকের কর্তব্য	ভাববাদী শিক্ষকের কর্তব্য হল,ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য বিস্তার।	প্রকৃতবাদী শিক্ষকের কর্তব্য হল, নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ।	প্রয়োগবাদী শিক্ষকের কর্তব্য হল, পরোক্ষভাবে উপযোগি পরিবেশ রচনা।
৬. শিক্ষণ পদ্ধতি	এই দর্শনের মতে শিক্ষা পদ্ধতি হবে আলোচনা বা ভাষাভিত্তিক	এর মতে শিক্ষণ পদ্ধতি হল, স্বাধীনতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সক্রিয়তা।	এর মতে শিক্ষণ পদ্ধতি হল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলগত সক্রিয়তা।

শিক্ষাক্ষেত্রেভাববাদ বা আদর্শবাদ (Idealism),বাস্তববাদ (Realism), প্রয়োগবাদ (Pragmitism),প্রকৃতিবাদ (Naturalism) ছাড়াও আরও অনেক দার্শনিক মতবাদ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একক কোন মতবাদ দ্বারা শিক্ষা পরিচালিত হয় না। শিক্ষানীতি প্রণয়নে সকল মতবাদকে বিবেচনায় নেয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে সকল মতবাদকে একীভূত করে একটি যুগোপযোগী,প্রগতিশীলও কার্যকর রুপরেখা দেয়া হয়েছে যা আগামীর বাংলাদেশকে বহুদূর নিয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভাববাদ বা আদর্শবাদ কাকে বলে?
২. ভাববাদের জনক কে?
৩. ভাববাদের মূল বক্তব্য কী?
৪. বাস্তববাদ কাকে বলে?
৫. বাস্তববাদের জনক কে?
৬. বাস্তববাদের মূল বক্তব্য কী?
৭. প্রয়োগবাদ কাকে বলে?
৮. প্রয়োগবাদের জনক কে?
৯. প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্য কী?
১০. প্রকৃতিবাদ কাকে বলে?
১১. প্রকৃতিবাদের জনক কে?
১২. প্রকৃতিবাদের মূল বক্তব্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাববাদ বা আদর্শবাদের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের শিক্ষায় ভাববাদের প্রভাব মূল্যায়ন করুন।
৩. শিক্ষায় ভাববাদী দার্শনিক প্লেটোর অবদান মূল্যায়ন করুন।
৪. বাস্তববাদের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
৫. শিক্ষায় প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই-র অবদান মূল্যায়ন করুন।
৬. প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
৭. প্রকৃতিবাদ (Naturalism) কাকে বলে? প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৮. প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হিসেবে রুশো নির্ধারিত শিক্ষা স্তর বর্ণনা করুন।
৯. বাস্তববাদ কী? শিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তববাদের অবদান উল্লেখ করুন।
১০. শিক্ষার আধুনিকীকরণে প্রয়োগবাদের অবদান অপরিসীম- বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট ৩ : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ প্রক্রিয়া

মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর মানুষ ধাপে ধাপে বড় হয়, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি স্তরে মানব শিশুর বৃদ্ধিতে কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় থাকে। এদের মধ্যে অন্যতম হল দৈহিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশও পরিণমন। মানব জীবনের এই বৃদ্ধিকালে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে পিতামাতা ও শিক্ষকের কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই সময়ে কিশোর-কিশোরী তাদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তাদের এই পরিবর্তনের সময় পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঠিক গাইডলাইন অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষার্থীরা যাতে সামাজিকতা, বন্ধু নির্বাচন, সামাজিক মূল্যবোধ- এই সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এজন্য বড়দের কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়।এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তি, HIV, AIDS-এসব বিষয়েও যথাযথ জ্ঞান দরকার। এই অধ্যায়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশ প্রক্রিয়াকে ৭টি পাঠে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১: বর্ধন-বিকাশ-পরিণমন
৩.২: বয়ঃসন্ধিকাল ও দৈহিক বিকাশ: শিক্ষার্থীর শারীরিক পরিবর্তন
৩.৩: মানসিক বিকাশ: বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব-এরিকসন ও গার্ডনারের তত্ত্ব
৩.৪: আগ্রহ ও মনোযোগ,ক্লান্তি ও অবসাদ, শিক্ষার্থীর মানসিক পরিবর্তনে শিক্ষক ও পরিবারের ভূমিকা
৩.৫: আবেগিক বিকাশ: আবেগ ও উদ্বিগ্নতা, আবেগ ওঠা-নামা, নিয়ন্ত্রণ কৌশল
৩.৬: সামাজিক বিকাশ: পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, বন্ধু ও স্বজন, বন্ধু নির্বাচন প্রক্রিয়া
৩.৭: এলএসবিই (LSBE-Life Skills Based Education), মাদকাসক্তি, HIV, AIDS, SRHR (Sex and Reproductive Health Rights) সর্ম্পকে সচেতনতা

৩.১ : বর্ধন-বিকাশ-পরিণমন

জীবনে প্রতি মুহুর্তে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এ পরিবর্তন ধারা মানব জীবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যমণ্ডিত শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে যাদেরকে নিম্নোক্ত নামে অভিহিত করা যায়। যেমন-

ক. বর্ধন (Growth)
খ. বিকাশ (Development)
গ. পরিণমন (Maturity)

ক. বর্ধন (Growth): শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার একটি নির্দিষ্ট ওজন (যেমন ৫-৭ পা.) এবং উচ্চতা (যেমন ১৬-২০ ইঞ্চি) থাকে। নবজাতকের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ওজনও দৈর্ঘ্য/ উচ্চতা বাড়তে থাকে। শিশুর ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধিকে বর্ধন (Growth) বলে।বর্ধন বলতে অপরিণত অবস্থা থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তিকে বুঝায়। বর্ধন হল পরিমাণগত পরিবর্তন যার অর্থ হল আকার ও গঠনের বৃদ্ধি।

Anderson এর মতে, বর্ধন ও বিকাশ বলতে শুধু দৈহিক আকার ও অনুপাতের পরিবর্তন বুঝায় না। মানুষের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বিকশিত হতে থাকে, তখন তাকে শিশুর ক্রমবিকাশ বলা হয়। মানব জীবনে বৃদ্ধি বলতে সাধারণত আকার ও আয়তনের পরিবর্তনকেই বুঝানো হয়। যেমন- শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি সাধিত হয়েছে বললে শিশুটির হাত-পা সহ দেহের কাঠামোগত বৃদ্ধিকেই বুঝায়। এটি মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক ও সাময়িক প্রক্রিয়া।

খ. বিকাশ (Development): মানব জীবনে বিকাশ বলতে বিশেষভাবে দৈহিক আকৃতির পরিবর্তনসহ কাজের উন্নতিকেই বুঝান হয়। অর্থাৎ মানব জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনকেই বুঝাতে বিকাশ (Development) শব্দটির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ হয়েছে বললে শিক্ষার্থীর দৈহিক বৃদ্ধিসহ তার কর্মদক্ষতার পরিবর্তন বা দক্ষতার বৃদ্ধিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। বিকাশ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এককথায়, মানব জীবনব্যাপী ক্রম উন্নতিশীল সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হল বিকাশ (Development)। পরিমাণ/পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ধারাকে বিকাশ বলে। বিকাশ হল গুণগত (Qualitative) পরিবর্তন। অর্থাৎ বিকাশ বলতে শুধু উচ্চতার বৃদ্ধি বা দক্ষতার উন্নতি বুঝায় না বরং বিকাশ হচ্ছে একটি জটিল প্রক্রিয়া যেখানে বর্ধন ও ক্ষয় উভয়ই ক্রিয়াশীল। যেমন- শিশুর বয়স বাড়ার স্যাথে সাথে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজও বাড়ছে। যে হাত দিয়ে সে হামাগুড়ি দিত সে হাত দিয়ে এখন সে লিখছে, খেলছে।

বিকাশ বলতে শুধু মানুষের উচ্চতা, ওজন, যোগ্যতার বৃদ্ধিকেই বুঝায় না বরং মানব শিশুর গর্ভধারণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এজন্য শিশুর বর্ধন ও বিকাশকে একটি গতিময় ধারা (Dynamic process) নামে আখ্যাত করা হয়। 'মানব শিশুর শারীরিক কাঠামোগত পরিবর্তন যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান তা বর্ধন এবং সুপ্ত ও অন্তর্নিহিত পরিবর্তন যেগুলো আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাকে বিকাশ (Development)বলা হয়।' পরিবর্তনশীল গুণাগুণ সম্পর্কীয় বিষয়ই হচ্ছে বিকাশ। সহজভাবে বিকাশ হল কর্মশক্তির পূর্ণতা বা পরিপক্কতা এবং জটিলতা।পরিবর্তন চারভাবে হয়-

১. আকারগত পরিবর্তন
২. আনুপাতিক পরিবর্তন
৩. পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি
৪. নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন।

গ. পরিণমন (Maturity) : ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উন্মোচনকেই পরিণমন (Maturation) বলা হয়। এটি মানব জীবনের বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাধারণত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির সুপ্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশই হল পরিণমন। শিশুর আগ্রহ, আগ্রহের স্থায়িত্ব এবং উন্নতি এগুলোর মাধ্যমে পরিণমনের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। শিশুর পরিণমন শিখনের ওপরও নির্ভর করে থাকে। শিশুরা সাধারণত শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা অর্জন না করা পর্যন্ত সঠিক দক্ষতা লাভ করতে পারে না। যেমন- ৭ মাস বয়সের শিশুকে কবিতা মুখস্থ করা যাবে না। এখানে কবিতা মুখস্থ করানোর জন্য তার গলার মাংসপেশী এবং স্নায়ুতন্ত্রের যে পরিমাণ পরিণমনের দরকার তা তখনও অর্জিত হয়নি।

৩.২ : বয়ঃসন্ধিকাল ও দৈহিক বিকাশ : শিক্ষার্থীর শারীরিক পরিবর্তন

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বা স্তর হল বয়ঃসন্ধিকাল। জীবনের এ ধাপে নিজেকে গৃহ, পরিবার, সমাজ তথা বিদ্যালয় ইত্যাদি সকল পরিবেশে খাপ খাওয়ানো হয়ে ওঠে অত্যন্ত সমস্যা সংকুল। এহেন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক পরিবর্তনও হয়ে ওঠে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সবদিক মিলিয়ে মানুষের এ সময়টিকে একটি জটিল স্তর হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সময়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় যে, তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদগণ বয়ঃসন্ধিকালকে আবেগ, উৎকণ্ঠা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কাল হিসেবে অভিহিত করেছেন। মানব জীবনের সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এ সময়ের মধ্যে। কাজেই শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব অপরিসীম।

বয়ঃসন্ধিকালের ইংরেজি প্রতিশব্দ Adolescence. এটি ল্যাটিন শব্দ Adolescere হতে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ পরিমাণ বা পরিপক্কতার পথে বিকাশ। অন্যদিকে Adolescence এর আর একটি ইংরেজি প্রতিশব্দ Puberty যা যৌন পরিণতিকে বুঝায়। সুতরাং অর্থগত দিক দিয়ে বয়ঃসন্ধিকাল বলতে মানব জীবনের শৈশব ও বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দ্রুত, বাড়ন্ত এবং পরিবর্তনশীল সময়কেই বুঝায়। মানব জীবনে এ কালের সীমা সাধারণত ১২-১৯ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। তবে স্থান-কাল পাত্র, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি এবং পরিবেশ তথা পারিপার্শ্বিক কারণে বয়ঃসন্ধিকালের এ বয়স সীমার কিছুটা রদবদল হতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত

মানব জীবনের বয়ঃসন্ধিকালের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীগণ নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

- **E. B. Hurlock-** মানব জীবনের বার হতে একুশ বছরের সময়ই হল বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল।
- **Stanley Hall-** বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীরা হল ফ্লেপার অর্থাৎ যে পাখির এখনও পরিপূর্ণ পাখনা গজায়নি, অথচ বাসাতেই উড়বার অব্যাহত চেষ্টা করছে।
- **Dorothy Rogers-**Adolescence the viewed as a sociocultural phenomenon is the period in his life when society crises to regard a person as a child but does not yet accord him full adult status role and function.
- মুহাম্মদ আনোয়ার আলীর মতে, বয়ঃসন্ধিকাল হল শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ শৈশবের সোনালী সকাল পেরিয়ে যৌবনের দোড়গোড়ায় পা রাখার বাড়ন্ত সময় ।

কাজেই বলা যায়-শৈশব এবং যৌবনের একটি মধ্যবর্তী সময়ই হল বয়ঃসন্ধিকাল। একে কৈশোর বা যৌবনাগম কালরূপেও অভিহিত করা যায়। এটি হল মানব জীবনের একটি বিশেষ সময়, যেখানে উপনীত হলে মনের রাজ্যে বার বার নতুন চেতনা জাগ্রত হয় এবং সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় শৃঙ্খলা, ভালমন্দ বিচারবোধ, যৌনস্পৃহা ও জীবন রহস্য সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন দানা বেঁধে ওঠে।

বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যাবলী

বয়ঃসন্ধিকালে মানব জীবনে নিম্নরুপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-

- বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা এবং সতেজতা বৃদ্ধি পায়।
- ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ ও ছেলেমেয়ে উভয়েরই বগল ও যৌনাঙ্গের পার্শ্বে পরিপক্ব লোম গজাতে শুরু করে।
- ছেলেদের বীর্যোৎপাদন ক্ষমতা এবং মেয়েদের মাতৃত্ব প্রবণতার সকল আঙ্গিক বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।
- ছেলেদের বক্ষ স্ফীত এবং মেয়েদের বক্ষীয় অক্ষ সুস্পষ্ট ও কোমর মোটা হয়।
- বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়ে উভয়েরই যৌনাঙ্গের সক্রিয়তা ও বিপরীতমুখী আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় ।
- দেহের ওজন এবং কণ্ঠনালীর ও গ্রন্থির সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।
- শ্বাসনালী, ফুসফুস এবং কণ্ঠনালীর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং স্বরের পরিবর্তন ঘটে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে বুদ্ধি প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং যুক্তিদানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- বয়ঃসন্ধিকালে সামাজিক রীতিনীতি,ধর্মীয় শৃঙ্খলার বিমূর্ত ধারণা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা জাগ্রত হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন চিন্তার প্রবণতা বাড়ে এবং আত্ম-অহঙ্কার বোধ সৃষ্টি হয়।

দৈহিক বিকাশঃ শিক্ষার্থীর শারীরিক পরিবর্তন

মানব শিশু অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সে সময় তার কয়েকটি সহজাত আচরণ যেমন-কান্না, হাঁচি, কাশি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। ধীরে ধীরে তার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। একমাসের শিশুর দৈহিক পুষ্টি অপেক্ষা এক বছরের শিশুর দৈহিক পুষ্টি লাভের হার দ্রুততর হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই হার আরো দ্রুত হয়। যৌবনের আগমন পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। দৈহিক বিকাশ অব্যাহত গতিতে সাধিত হলেও এতে কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। একটি স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের গতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত জীবন বিকাশের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রকৃতিকে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা যায়।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বর্ধনের প্রকৃতি	
বিকাশ বা বর্ধনের সময়কাল	**বিকাশ বা বর্ধনের প্রকৃতি**
শৈশব ১-৩ বছর	শারীরিক বিকাশের বয়স
বাল্য ৩-১১ বছর প্রথম বাল্যাবস্থা ৩-৬ বছর শেষ বাল্যাবস্থা ৬-১১ বছর	মানসিক বিকাশের বয়স শারীরিক বৃদ্ধির বয়স
কৈশোর/বয়ঃসন্ধিকাল ১১-১৮ বছর	মানসিক বিকাশের বয়স
প্রথম কৈশোর ব্যবস্থা ১১-১৪ বছর শেষ কৈশোর ব্যবস্থা ১৪-১৮ বছর	শারীরিক বিকাশের বয়স
যৌবন ১৮-২১ বছর	মানসিক বৃদ্ধির বয়স

শৈশবের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বিকাশ (১-৩ বছর)

শিশুর শারীরিক বিকাশ তার ভূমিষ্ঠ হবার দশমাস আগে মাতৃগর্ভকালীন অবস্থা থেকেই শুরু হয়। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই শিশুর দেহ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কেবল তার দাঁত গজায় না। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশ হতে আরম্ভ করে। প্রথমে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে এবং ক্রমশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কিছু কিছু কর্তৃত্ব লাভ করে। দেখার জন্য চোখ খোলে, কোন জিনিস ধরার জন্য হাত বাড়াতে পারে। ছয় মাস বয়সে শিশু মাথা স্থির রেখে বসতে পারে, ছয় মাসের পর কোন শব্দ হলে সে আগ্রহের সাথে শুনতে চায়। সাধারণত এক বছরে শিশু দাঁড়াতে শিখে এবং দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে সে হাঁটতে পারে। এ সময়ে সে আধো আধো কথা বলতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে সে অনেক শব্দ শিখে এবং অনেক জিনিসের নাম বলতে পারে। তৃতীয় বৎসরে সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। সে সারাক্ষণ ছুটাছুটি করে এবং ভালভাবে কথা বলতে পারে ও চায়।

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশও শুরু হয় শৈশব থেকে। ভূমিষ্ঠ হবার পর তার কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয় কিন্তু কোন বিষয়ের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। জন্মের অল্প পরেই তার স্বাদ, ঘ্রাণ,স্পর্শ-জ্ঞান জাগে। তার পরে তার চোখ এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয় কাজ করতে আরম্ভ করে। প্রথম বৎসরের মধ্যেই তার আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, দুঃখ ও বিরক্তি প্রভৃতি আবেগ উন্মেষের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়ে তার স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তিও বিকাশ শুরু হয়।

বাল্যকালের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বিকাশ (৩-১১ বছর)

প্রথম বাল্য অবস্থায় শিশুর শারীরিক বিকাশ তেমন দ্রুত হয় না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর তার অধিক কর্তৃত্ব জন্মে। সে দ্রুত হাঁটতে ও দৌড়াতে পারে এবং এক মুহূর্তও চুপ থাকতে চায় না। এ সময় তার অনুসন্ধিৎসাও খুব প্রবল হয়। কী এবং কেন শব্দ ও ভাব দুটো সারাক্ষণ তার মুখে ও চোখে লেগে থাকে। এ সময় শিশু হয় অনুকরণ প্রিয়। শেষ বাল্যাবস্থায় (৬-১১) শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। দুধ দাঁত পড়ে নতুন ও স্থায়ী দাঁত জন্মায়। শরীরের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা বছরে প্রায় দুই ইঞ্চি বাড়ে এবং মস্তিস্কের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ (৪/৫) পূর্ণ হয়।

প্রথম বাল্যাবস্থায় শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে। সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে ভালবাসে। এ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি সতেজ হয়। শিশুরা এ সময়ে ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং তার সকল আচরণে অহংকবোধ বা আমিত্বজ্ঞানের প্রতিফলন ঘটে। শেষ বাল্যাবস্থায় শিশুদের মানসিক বিকাশ আরও দ্রুত হয়। স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি সবকিছুই তীক্ষ্ম হতে থাকে। ইচ্ছা শক্তির বিকাশের ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসংযম মনোভাব গড়ে ওঠে। সে আর পূর্বের ন্যায় অন্ধভাবে আদেশ পালন করে না। তবে যে সমস্ত ব্যক্তি বা গল্পের নায়ক তার প্রশংসা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাদেরকে অনুকরণ করতে এবং তাদের আদেশ পালন করতে ভালবাসে। এই সময়ে তার সামাজিকীকরণ শুরু হয়।

কৈশোর/বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক বিকাশ (১২-১৮ বছর)

শিশুর জীবন-বিকাশে বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্তী দ্রুত পরিবর্তন কালই বয়ঃসন্ধিকাল। এটা দৈহিক ও মানসিক বিকাশের বিচিত্র পরিবর্তনের কাল। বাল্যকাল থেকে যৌবনে অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়স্কের স্তর থেকে প্রাপ্ত বয়স্কের স্তরে উন্নীত হওয়ার কালই বয়ঃসন্ধি। শিশুর দেহে এবং মনে তখন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। এর ফলে সে নতুন করে তার জীবন ও জগত সম্বন্ধে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে, অনেক মানসিক দ্বন্দের সম্মুখীন হয়।ডরোথি রোজার্স মনে করেন যে, বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের এমন একটা সময় যখন সমাজ ব্যক্তিকে শিশু হিসাবেও গণ্য করে না,আবার পরিপূর্ণ বয়স্কের মর্যাদা, ভূমিকাও তার ক্ষেত্রে আরোপ করে না।

কৈশোর/বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে দেহের সর্বাঙ্গে নানা পরিবর্তন যেমন শরীরের মাসংপেশী, হাড়, গ্রন্থি, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। শরীরের ওজন ও দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। তবে শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজন সমান অনুপাতে বাড়ে না। তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এই দৈহিক বৃদ্ধির হার সমান নয়। মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের চাইতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সের পরই সাধারণতঃ ছেলেরা মেয়েদের চাইতে অধিক দীর্ঘ ও সবল হয়ে ওঠে। যৌবনাগমনের পর এ বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে এবং একটি স্তরে এসে দৈহিক বৃদ্ধি অর্থাৎ উচ্চতা থেমে যায়। বয়ঃসন্ধিকালে রক্তসঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার ক্ষমতা ও গতি বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ছেলে-মেয়েদের ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বয়ঃসন্ধিকালের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল দেহাকৃতির-বিশেষভাবে মুখমন্ডলের পরিবর্তন। এ সময় ছেলেদের মুখের ওপর একটা কাঠিণ্যের ছাপ পড়ে। দেহের অন্যান্য অংশের মত মুখের মাংসও দৃঢ় হয় এবং উজ্জ্বল হয়। আর মেয়েদের মুখ কোমল, লাবণ্যময় এবং গোলগাল হয়ে ওঠে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের দেহে লোম বৃদ্ধি পায় এবং মেয়েদের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে লোম জন্মে। বিশেষ করে ছেলেদের এ সময় দাঁড়ি গোঁফ গজায় ও ছেলে মেয়েদের রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তনের ফলে দেহের যৌন হরমোন নিঃসৃত হয় এবং যৌনাঙ্গের ও দেহের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের যৌন- অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে। ফলে শিশুর জীবনে যৌনপরিণতি দেখা দেয়।

৩.৩ : মানসিক বিকাশ : বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব-এরিকসন ও গার্ডনারের তত্ত্ব

এরিকসনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ৮ ধাপ মতবাদ

এরিকসন (১৯৬৮) মনে করেন যে ব্যক্তির মনোসামাজিক বিকাশের সময় কিছু সংকটের মাধ্যমে তার আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। বিকাশের এই সংকটগুলো হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, নয়তো বিকাশকে বাধা দেয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব কতটা সংহতিপূর্ণ হবে তা এই সংকটসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরিকসন ধারণা পোষণ করেন যে, ব্যক্তি যখন বেড়ে ওঠে তখন সে সমাজের বিভিন্ন লোকজনের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই সুষ্ঠুভাবে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্যক্তি তার পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয় এবং চারদিকের জগত ও নিজেকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাঁর মতে, ব্যক্তি যখন গ্রহণযোগ্য উপায়ে তার সংকটগুলো বা মনোসামাজিক সমস্যাগুলো নিরসন করতে পারে তখনই তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে।

এরিকসন ব্যক্তিত্ব বিকাশের আটটি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট স্তরের কথা উল্লেখ করেন যাকে *Eight Stages of Man* বলা হয়। এগুলো হল–

১. মৌলিক বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস;
২. স্বাধীনতা বনাম লজ্জা ও দ্বিধাবোধ;
৩. উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ;
৪. সম্পাদন বনাম হীনমন্যতাবোধ;
৫. পরিচয় বনাম বিভ্রান্তি;
৬. ঘনিষ্ঠতা বনাম একাকীত্ব;
৭. সৃজন ক্ষমতা বনাম আবদ্ধতা;
৮. সংহতি বনাম হতাশা।

১.মৌলিক বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস: এই সংকট অতি শৈশব কালো ঘটে থাকে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম স্তরে শিশুর মনে আস্থা-অনাস্থার বোধ জন্মে। শিশুর মৌলিক চাহিদা যদি স্নেহ ও আদর-যত্নের সাথে ঘটানো হয় তাহলে তার মনে নিরাপত্তাবোধ জন্মে। সে পরিবেশে ও পরিজনদের প্রতি আস্থাশীল হয় এবং তাদেরকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এর বিপরীত হচ্ছে যে, শিশু চারপাশের সবাইকে সন্দেহ করে তখনই, যখন সে অবহেলিত বা অনাদৃত হয়। এরিকসন শিশু ও তার মায়ের সম্পর্কের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। কারণ মা ও শিশুর সম্পর্ক যত নিবিড় হবে শিশু তত সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।

২.স্বাধীনতা বনাম লজ্জা ও দ্বিধাবোধ: শৈশবকালের প্রথম পর্যায়ে এ সংকট উপস্থিত হয়। শিশু এ সময়ে তার পিতামাতা ও পরিবেশকে পরীক্ষা করে, কারণ সে বুঝতে চায় পরিবেশের কতটুকু তার নিয়ন্ত্রণে আছে। তার মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অনুভূতির বিকাশ ঘটাতে হলে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য দিতে হবে। এ সময় পিতা-মাতার অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা বাধা শিশুর মনে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ ও তার চাহিদার ব্যাপারে লজ্জার সৃষ্টি করে। মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে যখন যে নিজেকে মুক্ত মনে করে তখনই তার নিজেকে স্বাধীন মনে হয়।

৩.উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ: শৈশবকালের মধ্যপর্যায় হচ্ছে সংকটকালের। এ সময় বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার অনুভূতি নিয়ে শিশু কোন কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে নতুন দক্ষতা লাভ করে যা তার পূর্বে অর্জিত আস্থাবোধকে দৃঢ়তর করে। এ সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরবর্তীতে অপরাধবোধের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে বিবেকের জন্মে দেয়। যে সব ছেলেমেয়েরা বাবা-মা কর্তৃক কঠোর শাসনে লালিত হয় তাদের মধ্যে কোন কিছু করার উদ্যোগ কমে যায় এবং শিশু নিজেকে অক্ষম ও অসহায়ভাবে। কিন্তু আবার যে শিশুকে বাবা- মা ও শিক্ষকরা কখনোই তিরস্কার করেন না তাদের মধ্যে বিবেকের বিকাশ হয় না। যদি উদ্যোগ এবং অপরাধবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় তবে শিশুর মধ্যে বড়দের মত কাজ করার ক্ষমতা গড়ে ওঠে ও দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়।

৪. সম্পাদন বনাম হীনমন্যতাবোধ: প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার সময় থেকে বয়ঃসন্ধির আগের সময়ে এ সংকটের সৃষ্টি হয়। এ বয়সের শিশুকে লেখাপড়াসহ খেলাধুলায় নানা রকম দক্ষতা অর্জন করতে হয়। যে শিশু স্বাধীন ও উদ্যোগী মনোভাব অর্জন করে সে সহজেই শ্রমশীল হয়, অন্যথায় তার মধ্যে লজ্জা, পরাজয়ের মনোভাব ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সময়ে শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটি শিশুকে সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়া। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শিক্ষককে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং তাদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৫. পরিচয় বনাম বিভ্রান্তি: বয়ঃসন্ধিকালে এ ধরণের সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে ছেলে-মেয়েরা তাদের পরিচয় নিয়ে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে সমাজে তাদের কি ভূমিকা রয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করে। অন্যেরা তাদের কিভাবে প্রত্যক্ষণ করছে এবং তারা নিজেদের কিভাবে দেখে এ তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে তারা খুব দুঃশ্চিন্তায় ভোগে। নিজেকে বুঝতে পারার অক্ষমতাকে, নিজের পরিচয় নিয়ে সমস্যা তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং তা সমাধানে ব্যর্থ হলে প্রাপ্ত বয়স্কদের মত আচরণ করতে পারে না। ফলে জীবনের পরবর্তী সময়ে যে সংকট দেখা দেয় ছেলেমেয়েরা সেগুলোর সঙ্গে সফলভাবে খাপ খাওয়াতে পারে না। অপরদিকে কার্যকরভাবেযদি এ সংকটের মোকাবেলা করা যায় তবে তাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয় ও সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তাবোধ জেগে ওঠে।

৬. ঘনিষ্ঠতা বনাম একাকীত্ব: প্রাপ্ত বয়সের প্রথম পর্যায়ে এ ধরণের সংকট দেখা দেয়। যারানিজের সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হতে সক্ষম হয় তারা সমাজে নিজের স্থান করে নেয়। স্বভাবতই সে তখন স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঘনিষ্ঠতা আশা করে। এটা সম্ভব না হলে সে একাকীত্বে ভোগে, বন্ধু-বান্ধব এড়িয়ে চলে এবং পরিবারভুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। এ সংকটের সমাধান হলে ব্যক্তি আস্থার সাথে অন্যকে ভালবাসতে পারে এবং একই সঙ্গে অন্যের ভালবাসা লাভেও সমর্থ হয়।

৭. সৃজন ক্ষমতা বনাম আবদ্ধতা: সৃজন ক্ষমতা বলতে কিছু সৃষ্টি করার প্রতি আগ্রহ। এ বয়সের প্রধান কাজ হচ্ছে, একজনের সাথে স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং পরিবার ও সন্তানের মধ্য দিয়ে আত্মবিস্তৃতি লাভ করা। এ সময়ে যে পরিণমন হয়, তার সাহায্যে তার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হয়। যদি পরবর্তী বংশধরদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়া যায় তবে ব্যক্তি একঘেঁয়েমিতে ভোগে। ফলে অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং ব্যক্তি আবদ্ধতায় ভোগে। এ সংকটের সমাধান হলে ব্যক্তি সামাজিকভাবে নিজেকে সবকিছুর সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়।

৮. সংহতি বনাম হতাশা: পরিণত বয়সে এ সংকট উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তি পূর্বের ধাপগুলো সফলভাবে অতিক্রম করলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়এবং জীবনের অন্তিম সংকট মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়। নিজের সবকিছুর দায়িত্ব সে নিতে পারে এবং মর্যাদালাভে সক্ষম হয়। অপরপক্ষে সে যা অর্জন করেছে তা নিয়ে যদি অসুখী হয় তবে তার মধ্যে হতাশা ও নিজের প্রতি অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়।

গার্ডনারের তত্ত্ব-বুদ্ধি সম্পর্কে সমকালীন মতবাদ: বহুবিধ বুদ্ধি তত্ত্ব

বহুবিধ বুদ্ধি তত্ত্ব (Multipul Intelligence Theory) অনুযায়ী বুদ্ধিকে প্রশিক্ষণযোগ্য ক্ষমতা হিসাবে স্বীকার করা হয়। এ তত্ত্বের তাৎপর্য হচ্ছে, স্কুলে বেশি সম্ভব শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সনাক্ত করার জন্য বিদ্যালয়কে বুদ্ধির সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। শিক্ষাবিদ হাওয়ার্ড গার্ডনার (Howard Gardner,1983) অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধিকে বোঝার রীতি বর্জন করে অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুদ্ধির স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বুদ্ধি সম্পর্কে সাহিত্যিক বিবরণ, স্বায়ু বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদি, মেধাবী ও স্বল্পবুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণীর উপর ভিত্তি করে বুদ্ধির ধারণা গঠন করেছেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ সাত প্রকার বুদ্ধির কথা বলেছেন। যেমন-

১. **ভাষামূলক বুদ্ধি:** শব্দ প্রয়োগ করা, মৌখিক বিশ্লেষণ, লিখিত বিষয়বস্তু পড়ে বোঝা এবং ভাষায় ব্যবহৃত উপমা, অলঙ্করণ ইত্যাদি বুঝার ক্ষমতা এর অন্তর্ভুক্ত।

২. **সঙ্গীতবিষয়ক বুদ্ধি:** বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মোৎসার্ট এর প্রতিভা বা মেধায় এ ক্ষমতা প্রকটভাবে ফুটেছে। এ ক্ষমতাটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও শেখানো যায়।

৩. **যুক্তিসম্মত গাণিতিক বুদ্ধি:** গণিত বিশারদদের মধ্যে এরকম ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায়। গণিত, এ্যালজেব্রা এবং প্রতীকধর্মী যুক্তিবিদ্যায় এ ধরণের বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

৪. **অবস্থান বিষয়ক বুদ্ধি:** স্থপতি এবং প্রকৌশলীদের কাজে এরকম ক্ষমতা স্পষ্ট দেখা যায়। এরা বস্তুর অবস্থান বিষয়ক অনন্য মানসিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

৫. **দৈহিক স্পর্শ সংক্রান্ত বুদ্ধি:** খেলোয়াড়, নৃত্য শিল্পী এবং বাজীকররা এ ধরণের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে। নিজস্ব দেহ সম্পর্কে খাঁটি সচেতনতা এবং দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এটি।

৬. **আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি:** বুদ্ধি এক ধরণের আত্মজ্ঞান যা প্রায়ই প্রকৃত ধর্ম সাধকের মধ্যে দেখা যায় অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক ধারণার অধিকারী এবং ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

৭. **সামাজিক বুদ্ধি:** আমাদের জটিল সামাজিক পরিবেশে পরিবার, বন্ধুত্বা, স্কুল, ক্লাব এবং আবাসিক পরিমণ্ডলের সূক্ষ্ম বার্তা বা ইঙ্গিতের সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা বুঝায়।

বুদ্ধি সম্পর্কে গার্ডনারের মতবাদটি সমর্থন করার জন্য আমাদের চারপাশে এর প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন- অনেক সময় দেখা যায় একজন ব্যক্তি কথা বলতে পারে না কিন্তু তার সঙ্গীত প্রতিভা অটুট রয়েছে, কোন ব্যক্তি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৮ কে দিয়ে গুণ করতে পারে কিন্তু স্বল্প বুদ্ধির কারণে বিশেষ শিক্ষার স্কুলে পড়ে। আবার এমন অনেক ব্যক্তি দেখা যায় যে, চমৎকার ছবি আঁকতে পারে কিন্তু অন্য কাজ সামান্য করতে পারে। মানুষের মস্তিস্কে যে সঙ্গীত, গণিত ও শিল্প ইত্যাদির পৃথক পৃথক তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রণালী রয়েছে এগুলো তার সমর্থন যোগায়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, সাহিত্যিকদের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় ছোটবেলা থেকেই তারা ছন্দ ও সুর, রং ও আকার, অথবা শব্দ এবং ভাষার প্রতি বিশেষ ধরণের আকর্ষণবোধ করতেন। এমনও হতে পারে যে, তাদের মস্তিস্কে বিভিন্ন দক্ষতা সৃষ্টির জন্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের কর্মক্ষমতা দায়ী।

গার্ডনারের তত্ত্বের তাৎপর্য

গার্ডনারের সাত ধরণের বুদ্ধি তত্ত্ব সম্পর্কে যে কথাটি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী সেটি হল কিশোরদের মেধার বিকাশ করতে হলে স্কুলের সামগ্রিক কার্যক্রম কি রকম হওয়া দরকার তার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। বর্তমানে স্কুলের শিক্ষা প্রধানত ভাষা ও যুক্তি-গাণিতিক বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক বলা যায়। এর মাধ্যমে সঙ্গীত ও স্থান বিষয়ক বুদ্ধি বিকাশের সুযোগ কম। দৈহিক স্পর্শ বিষয়ক বুদ্ধির চর্চাকে পাঠক্রম বহির্ভুত মনে করা হয়। আন্তঃব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণের শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক। গার্ডনারের তত্ত্বের সমর্থক অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, ভাষা ও গাণিতিক সমস্যা সমাধানের নৈপুণ্য শেখানোর পাশাপাশি অন্যান্য ধরণের নৈপুণ্য শেখানোর দিকে স্কুলগুলোর যত্নবান হওয়া উচিত।

৩.৪ : আগ্রহ ও মনোযোগ,ক্লান্তি ও অবসাদ, শিক্ষার্থীর মানসিক পরিবর্তনে শিক্ষক ও পরিবারের ভূমিকা

আগ্রহ (Interest)

বুৎপত্তিগত অর্থে ল্যাটিন শব্দ 'Interest' এর অর্থ হল 'its matters' বা 'it concerns' অর্থাৎ আমাদের আগ্রহের বিষয় বা বস্তু যেগুলো আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেমন- 'টাকা' এর প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে কারণ টাকা আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

ম্যাকডুগাল-এর মতে, "আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ আর মনোযোগ হল সক্রিয় আগ্রহ (Interest is latent attention and attention is interest in action).

হার্বাটের মতে, " আগ্রহ হলো নতুন কোন জ্ঞান আহরণের জন্য মনের প্রস্তুতি।

'Interest is a feeling or emotion that causes attention to focus on an object, event, or process. In contemporary psychology of interest, the term is used as a general concept that may encompass other more specific psychological terms, such as curiosity and to a much lesser degree surprise.' - Wikipedia

আগ্রহ সৃষ্টির কৌশল

- শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা একান্তভাবে প্রয়োজন।
- কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা আগ্রহ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে, এ কথা মনে রেখে শিক্ষার্থীদের যতদূর সম্ভব হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।
- মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য বৃত্তিমূলক কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে যাতে পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অভিযোজন করতে পারে।
- বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণের (Field trip) ব্যবস্থা করে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ তাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষক যে বিষয়টি পড়ান, তার প্রতি আগ্রহ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মনোযোগ (Attention)

মনোযোগ হচ্ছে মনের একটি গুণ। প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞানীরা মনোযোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে বিশ্বাস করতেন। তাদের ধারণা ছিল মন কতগুলো ক্ষমতার সমষ্টি। স্মরণ করার ক্ষমতা, বিচার করার ক্ষমতা ইত্যাদির মতো মনোযোগও একধরনের ক্ষমতা এবং অনুশীলনের দ্বারা এর বিকাশ ঘটানো সম্ভব। কিন্তু আধুনিককালে এসে মনোবিজ্ঞানীগণ মনোযোগকে একটি মানসিক প্রক্রিয়া (mental process) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শিখন প্রক্রিয়ায় মনোযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থী যদি কোনো কিছু শিখতে মনোযোগ প্রদান না করেন বা শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন তবে শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে।

মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে মনোযোগকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

- **মনোবিজ্ঞানী Mcdougall-**এর মতে, যে মানসিক সক্রিয়তা আমাদের প্রত্যক্ষণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাই হলো মনোযোগ।"
- **ক্রাইডার এবং অন্যান্যদের মতে,-**"Although we constantly monitor the thousand of sensations created by our environment, we focus upon some and disregard others. The process by which we do this known as attention."
- **মরগান কিং এবং রবিনসন এর মতে-,**"Attention is the term given to the processes that select certain inputs for inclusion in the focus of experience."

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention)

মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিধায় এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন-

- **উদ্দীপক:** মনোযোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উদ্দীপক। কারণ উদ্দীপক ব্যতীত মনোযোগ সংঘটিত হয় না।
- **ইচ্ছা:** মনোযোগ একটি ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া যা চেতনাকে বস্তুর দিকে কেন্দ্রীভূত করে বস্তর ধারণাকে সুস্পষ্ট করে।
- **নির্বাচনধর্মী:** মনোযোগ নির্বাচনধর্মী। একটি বিষয় নির্বাচন করা এবং অপরগুলোকে বর্জন করা বা চেতনার ক্ষেত্র থেকে অপসারণ করাই হলো মনোযোগের ধর্ম। যেমন-কোনো ছাত্র যখন পাঠ্যবিষয়ের উপর গভীরভাবে মন নিবন্ধ

করে তখন সে অন্যান্য বিষয় (যেমনঃ রাস্তার গাড়ি চলার শব্দ,পাখির ডাক, ফেরিওয়ালাদের হাঁক-ডাক) চেতনার ক্ষেত্র থেকে বর্জন করে।

- **পরিবর্তনশীলতা:** মনোযোগ নীতিশীল ও পরিবতর্তনশীল। কারণ-এর Positive এবং Negative দুটি দিক রয়েছে। একই জিনিসের প্রতি অনেকক্ষণ একই হারে মনোযোগ দেয়া যায় না। মনোযোগের মাত্রা যেমন ওঠানামা করে, তেমনি এক বস্তু থেকে মনোযোগ অন্য বস্তুতে ধাবিত হয়। যেমন-অঙ্ক কষতে প্রথমে গভীর মনোযোগ থাকলেও তা আস্তে আস্তে কমে আসে এবং পরবর্তী সময়ে অন্য কিছু করতে ভাল লাগে।
- **স্পষ্টতা:** যে বস্তুটির প্রতি মনোযোগ নিবন্ধ করি কেবল সেই বস্তুটিই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- **ধারাবাহিকতা:** মনোযোগের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধারাবাহিকতা ও একীভূত প্রক্রিয়া। তাই আমরা এক সাথে অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না।
- **অনুসন্ধান:** মনোযোগ হলো অনুসন্ধানী। মনোযোগ নিত্য নতুন বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করে। বৈচিত্র খুঁজে বেড়ানোই মনোযোগের ধর্ম।
- **বিশ্লেষণধর্মী:** মনোযোগ হলো বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক মানসিক প্রক্রিয়া। যেমন: কোনো একটি গাছের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশ, তার কাণ্ড, শাখা-পশাখা, ফুল-ফল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগী হতে পারি। আবার বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে গাছের যে সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে তার প্রতি মনোযোগী হতে পারি।
- **প্রস্তুতি:** মনোযোগের মধ্যে এক ধরনের প্রস্তুতির ভাব থাকে। যার জন্য বাঁশির শব্দ শোনা মাত্রই খেলোয়াড়গণ খেলা শুরু করে।
- **মানসিক তৎপরতা :** মনোযোগের মধ্যে মানসিক তৎপরতা বিদ্যমান। মনোযোগ বলতে বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে মনের উপযোজন বোঝায়।

মনোযোগের প্রকারভেদ (Types of Attention)

মনোযোগের প্রকারভেদ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মনোযোগকে প্রধান দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যা নিম্নরূপ-

১. **ইচ্ছাকৃত মনোযোগ (Voluntary Attention):** মানুষ যখন নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে কোনো বিষয়বস্তুর ওপর মনোনিবেশ করি তখন তাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত মনোযোগ। এটি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। একে সক্রিয় মনোযোগও বলা হয়। যেমন- রুমে TV চলছে তথাপিও মেয়েটি পড়ছে। এটিই ইচ্ছেকৃত মনোযোগ।

২. **অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ (Non-voluntary Attention):** ব্যক্তির ইচ্ছার বাইরে যখন কোনো কিছুতে হঠাৎ মনোযোগ সৃষ্টি হয় তখন তাকে অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ বলে। যেমন - বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠল।

মনোযোগের কারণ বা শর্তাবলি

যে সকল বিষয় মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি করে থাকে সেগুলোকে মনোযোগের কারণ বা শর্ত বলা হয়। মনোযোগের কারণগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

ক) অভ্যন্তরীণ নির্ধারক বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্তাবলি এবং

খ) বাহ্যিক নির্ধারক বা বস্তুনিষ্ঠ শর্তাবলি।

ক) অভ্যন্তরীণ নির্ধারক বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্তাবলি

১. **আবেগ:** আবেগ মনোযোগের অন্যতম কারণ। যাকে আমরা পছন্দ করি, ভালোবাসি তার সদগুণের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। আর যাকে আমরা পছন্দ করি না তার দোষত্রুটির প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়।

২. **অনুরাগ বা আগ্রহ:** যার যে বিষয়ে আগ্রহ বা অনুরাগ বেশি সে সেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে। এজন্য ক্রীড়ামোদী ব্যক্তি দৈনিক সংবাদপত্রে খেলার খবরগুলো আগে দেখেন।

৩. **অভিজ্ঞতা :** পূর্ব অভিজ্ঞতাও মনোযোগ আকর্ষণ করার অন্যতম কারণ। যেমন-পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রেতা জানে কোন দোকানের কাপড় ভালো এবং তুলনামূলকভাবে সস্তা। কাজেই কাপড় কেনার সময় প্রথমেই তার দৃষ্টি সে দোকানের দিকে নিবন্ধ হয়।

৪. **অভ্যাস ও শিক্ষা:** অভ্যাস এবং শিক্ষা মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে। ঘুম থেকে উঠে যার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তার মনোযোগ পত্রিকা পড়ার দিকে ধাবিত হয়।

৫. **মানসিক প্রবণতা:** জন্মগত মানসিক প্রবণতা মনোযোগের নির্ধারক। দক্ষ গায়ক, শিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতি জন্মগত মানসিক প্রবণতার জন্যই তারা নিজের বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হন।

৬. **সহজাত প্রবৃত্তি:** ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনাবেগ প্রবৃতি আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির নিকট যে বস্তুর আবেদন আছে, সেই বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

৭. **মনোভাব ও মেজাজ:** ব্যক্তির মনোভাব ও মেজাজ মনোযোগ নির্ধারণের অন্যতম শর্ত। অশান্ত ও চঞ্চল প্রকৃতির লোকের চেয়ে শান্ত ও ধীর স্থির মেজাজের লোক যে কোনো ব্যাপারে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে।

৮. **দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা :** দৈহিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকলে যে কোনো কাজে মনোযোগ দেয়া সহজ হয়। আর অসুস্থ থাকলে কোনো ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না। মাথা ব্যথা, শারীরিক কোনো অসুস্থতা থাকলে কোনো কাজে মনোযোগ দেয়া বেশ কঠিন হয়।

খ) বাহ্যিক নির্ধারক বা বস্তুনিষ্ঠ শর্তাবলি

ব্যক্তি বা বস্তুর যে সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের মনকে তার দিকে আকৃষ্ট করে তাকে মনোযোগের বাহ্যিক কারণ বা নির্ধারক বলা হয়। কারণগুলো সম্পর্কে নিচে বর্ণনা দেয়া হলো-

১. **আকার-আকৃতি:** সাধারণ ক্ষুদ্র বস্তুর তুলনায় আমরা বৃহৎ বস্তুর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হই। যেমন-হাতি ও ছাগলের মধ্যে হাতিটি সহজে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে

২. **তীব্রতা:** উদ্দীপকের পক্ষে যেটি বেশি তীব্র, সেটির প্রতি সহজেই মনোযোগ আকর্ষিত হয়। যেমন: উজ্জ্বল আলো, তীব্র গন্ধ প্রভৃতির দিকে আমরা সহজেই মনোযোগী হই।

৩. **গতিশীলতা:** স্থির বস্তুর তুলনায় গতিশীল বস্তুর প্রতি সহজেই মনোযোগ আকর্ষিত হয়। যেমন:চলন্তবিমান।

৪. **নতুনত্ব:** যা কিছু নতুন, বৈচিত্র্যপূর্ণ তা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন : নতুন পোশাক, নতুন বই, নতুন খেলনা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৫. **পরিবর্তনশীলতা:** অবিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু চলতে আকস্মিকভাবে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে তার প্রতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। যেমন : চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলে সেদিকে সকলের দৃষ্টিনিবন্ধ হয়।

৬. **বৈসাদৃশ্য:** বৈসাদৃশ্য মনোযোগের অন্যতম কারণ। খুব লম্বা লোকের পাশে যদি কোনো বেঁটে লোক দাঁড়ায় তাহলে মনোযোগ সহজেই সেদিকে ধাবিত হয়।

৭. **গোপনীয়তা:** গোপন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজেই আকৃষ্ট হয়। কেউ যদি কোনো খবর গোপন রাখতে চায় তাহরে স্বভাবতই সেই খরবটির প্রতি মনোযোগী হই এবং খবরটি শোনার জন্য উদগ্রীব হই।

৮. **দীর্ঘস্থায়িত্ব:** উদ্দীপকের বেশি স্থায়িত্ব মনোযোগ সহজে আকর্ষণ করে। যেমন : কোনো শিশু যদি কেঁদে উঠে থেমে যায়। তাঁর চাইতে যে শিশু অনবরত একটানা কেঁদে চলে তার প্রতি আমরা বেশি মনোযোগী হই।

৯. **পুনরাবৃত্তি :** যে উদ্দীপক বার বার আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় তার প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে। রেডিও, টিভিতে একই বিজ্ঞাপন বার বার প্রচার করার কারণ শ্রোতা ও দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে সম্পর্ক

মনোযোগ এবং আগ্রহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো কিছু শিখতে হলে মনোযোগ অবশ্যই প্রয়োজন। আর এই মনোযোগ গভীরভাবে দেয়া সম্ভব হয় যদি বিষয়টি শেখার আগ্রহ থাকে। মনোযোগ বলতে কোনো বস্তু সম্পর্কে একান্ত সচেতন হওয়াকে বোঝায়। কিন্তু শুধুমাত্র সচেতনতাই মনোযোগ নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ প্রত্যেকেই মনোযোগের ক্রিয়াশীলতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ম্যাকডুনাল-এর মতে,-যে যে মানসিক সক্রিয়তা আমাদের প্রত্যেক্ষণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাই হলো মনোযোগ। অন্যদিকে আগ্রহ বলতে ব্যক্তির কোনো বিশেষ বস্তুর ক্রিয়া বাঅন্য ব্যক্তির প্রতি মানসিক আকর্ষণকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

মনোযোগের প্রধান পরিচালক হলো আগ্রহ। আগ্রহ সাময়িক হলে মনোযোগও সাময়িক হয়ে থাকে। এক কথায় আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। আগ্রহ ও মনোযোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার উপায়

- বিষয়বস্তু আলোচনায় শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশগত উপাদান সম্পৃক্ত করা;
- প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদর্শন করা;
- পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী করে তোলা;
- বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী করে তোলা;
- সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সামনে নানাধরণের সমস্যা উত্থাপন করা;
- শিক্ষার্থীর পঠন অভ্যাস গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীর নিজ ধারণা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ তৈরি করা।

শিক্ষায় মনোযোগের গুরুত্ব

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায়।

- শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনোযোগ তাকলে পাঠের বিষয়বস্তু পুরাতন থেকে নতুন, জানা থেকে অজানা এবং সহজ থেকে কঠিন বিষয়গুলো সহজেই শিখতে পারে।
- মনোযোগের ফলে পাঠ্যবিষয়গুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয় এবং তারা উপকৃত হয়।
- মনোযোগের ফলে শিক্ষার্থীদের মনে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়। তাই তারা পাঠে মনোনিবেশ করে।
- শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের বয়স, রুচি, ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাদান করান বিধায় শিক্ষার্থীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। কারণ এ ফলে এরা পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগী হয়।
- বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় শিক্ষকগণ সময় তালিকায় প্রতি মনোযোগী থাকেন। তাই শিক্ষার্থীদের একঘেয়েঁমিত্ব দূরীভূত হয়।

অবসাদ ও বিরক্তি (Deprssion and Vexation)

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন, "দেহকে সুস্থ রাখ সে তোমার মনের নির্দেশ মেনে চলবে।" দেহ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, মন যেন হাল ছেড়ে দিতে চায়। ফলে দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে। দেহ অবসন্ন হয় নানা কারণে । অনেকক্ষণ কাজ করার ফলে দেহ আর চলতে চায় না, চায় একটু বিশ্রাম। কিন্তু অবসন্ন দেহমন নিয়ে যখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় কাজের ভুবনে তখনই কাজে আসে বিতৃষ্ণা আর সৃষ্টি হয় বিরক্তি। কেননা তখন দেহ থাকে ক্লান্ত।সাধারণ মানুষ অবসাদ, ক্লান্তি ও বিরক্তিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন, যা ঠিক নয়। কাজ করার ক্ষমতা কমে গেলে তাকে অবসাদ বলে। কাজ করার শক্তি বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছে না থাকলে তাকে বিরক্তি বলে। আর শারীরিক পরিশ্রমের ফলে শারীরিক কারণে ক্লান্তি আসে।

অবসাদ (Depression)

দীর্ঘসময় ধরে কাজ করতে থাকলে কতক্ষণ পরে কাজের দক্ষতা বা কার্যদক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে। অর্থাৎ কর্মশক্তি হ্রাস পায়। ব্যক্তির মাঝে কর্মশক্তি হ্রাস পেয়ে যে অবস্থায় সৃষ্টি হয় তাকেই অবসাদ নামে অভিহিত করা হয়।

মনোবিজ্ঞানী Sandiford এর মতে, "অবসাদ হলো, কর্মে দক্ষতার হ্রাস"।

অবসাদ যেহেতু শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারেরই হতে পারে, সেহেতু তা দেহ ও মন উভয়েরই কর্মক্ষমতা হ্রাস করে। অবসাদ যত বাড়তে থাকে, কর্মক্ষমতা তত কমতে থাকে।

বিরক্তি (Vexation)

বিরক্তি এক প্রকার অসন্তোষ। যা আমরা কোনো কাজে আগ্রহের অভাবে অথবা একঘেয়েঁমি এড়ানোর জন্য অথবা কাজটির পরিবেশগত অসুবিধার কথা চিন্তা করে প্রকাশ করে থাকি। অর্থাৎ কাজ করার মত শক্তি দেহে আছে, কিন্তু একঘেয়েঁমিতার ফলে কাজ করতে ইচ্ছে করে না। কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অনীহা আসে তাকে বিরক্তি বা Boredom বলে।যে কোনো কাজের প্রতি বিরক্তির কারণগুলো জানতে পারলে ব্যক্তি বিশেষ কাজটি করতে উৎসাহী হয় এবং পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় কাজ করার শক্তি লোপ পেয়ে আনুপাতিক হারে শূন্যের কোটায় পৌঁছে যায়।

অবসাদের কারণ

অবসাদের কারণগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা -

ক) শারীরিক কারণ এবং

খ) বাহ্যিক কারণ

ক) শারীরিক কারণ: অবসাদের শারীরিক কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো -

- **ATP খরচ:** খাবার হজম হবার পর যেকোনো কাজের শক্তি বা ক্ষমতা উৎপাদনকারী এক প্রকার মিশ্র রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়, যাকে ATP বলা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মিশ্র পদার্থগুলো কমে যায় বা ক্ষয়ে যাওয়ায় কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবসাদ আসে।
- **অতিরিক্ত পরিশ্রম:** অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে পেশিতন্ত্র ক্ষয় হয়ে এক প্রকার আবর্জনা সৃষ্টি করে। রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে এসব আবর্জনা স্নায়ুসন্ধিতে পৌঁছে রক্ত চলাচলে বাধা দেয়। ফলে অবসাদ আছে।
- **অক্সিজেনের অভাব:** রক্তের লোহিত কণাগুলো অক্সিজেন বহন করেএবং শক্তি উৎপাদন করে। স্নায়ুশক্তি সন্ধির আবর্জনা দূর করতেও অক্সিজেনের প্রয়োজন। অক্সিজেনের অভাব ঘটলে রক্ত বহনতন্ত্রের রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অবসাদ আছে।

- **রোগব্যাধি:** অনেকদিন যাবৎ রোগে (বিশেষ করে ডায়াবেটিক) ভুগলে অবসাদ আসে। কোনো কোনো ব্যক্তির অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়ার কারণে অবসাদ আসে। যেমন-প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অতিক্ষরণে ও থাইরয়েড গ্রন্থির অল্পক্ষরণের ফলে অবসাদ আসে।
- **বয়ঃসন্ধিকালে ও বার্ধক্যে:** দৈহিক পরিবর্তনে বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম দিকে ও বার্ধ্যকের প্রথম দিকে কারও কারও অবসাদ আসে।

খ) অবসাদের বাহ্যিক কারণ: অবসাদের বাহ্যিক কারণগুলো বর্ণনা করা হলো-

- **শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ:** শ্রেণিকক্ষের ভেতরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে না পারলে শরীর ও মন দুই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- **বসার অস্বাস্থ্যকর স্থান:** বসবার ব্যবস্থা আরমাদায়ক বা স্বাস্থ্যসম্মত না হলে অবসাদ আসে।
- **অনেক্ষণ পরিশ্রম করলে:** অনেকক্ষণ ধরে একট মাত্র কাজ করলে মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- **পাঠের বিষয়বস্তু :** পাঠের বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহ্য না হলে শিক্ষার্থী তাড়াতাড়ি অবসাগ্রস্ত হয়।
- **শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা:** অসুস্থ শরীর ও অসুস্থ মন অবসাদের জন্য অনেকাংশে দায়ী।
- **সময়:** দিনের শেষ ভাগ ও সপ্তাহের শেষভাগে শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি অবসাদগ্রস্ত হয়।
- **পুষ্টিহীনতা:** পুষ্টিকর খাদ্য না খেলে শিক্ষার্থী পুষ্টিহীনতায় ভোগে ও অবসাদগ্রস্ত হয়।
- **দৃষ্টিশক্তির ওপর প্রবল চাপ:** অতিরিক্ত লেখা, ছবি আঁকা, বোর্ডের লেখা দেখে লিখতে লিখতে শিক্ষার্থীরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- **শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব:** শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শহীনতাও অনেক সময় শিক্ষার্থীর অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি:** শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং চিত্তাকর্ষক ও সহজ না হলে শিক্ষার্থীরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- **পরিবার ও সমাজ:** পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কলহপূর্ণ অবস্থা অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে অবসাদ নিয়ে আসে।

অবসাদের লক্ষণ

অবসাদের লক্ষণগুলো নিম্নরুপ-

১) একই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে যখন আগের তুলনায় বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়;
২) আগের তুলনায় লেখার, পড়ার এবং গণিত করার সময় যদি বেশি ভুল হয়;
৩) শিক্ষার্থী একই ধরনের বিষয়বস্তু পূর্বের তুলনায় স্মৃতিতে কম ধরে রাখতে পারে;
৪) একই বিষয়ের প্রতি অধিকক্ষণ মনোযোগের অভাব দেখা দেয় এবং একাধিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগের ঘাটতি হয়;
৫) সংক্ষিপ্ত কিন্তু চিন্তাপ্রসূত প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থী যখন অপারগ হয় তখন বুঝতে হবে সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

অবসাদের প্রকারভেদ

মনোবিজ্ঞানীগণ অবসাদকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১। পেশিগত অবসাদ: অধিক পরিশ্রমের ফলে পেশি কর্মক্ষমতা হারায়। যেসব কাজে পেশির ভূমিকা বেশি সাধারণত সেসব কাজে এ ধরনের অবসাদ আসে। যেমন- দৌড়ানোদৈহিক পরিশ্রমের কাজ।

২। মানসিক বা স্নায়ুকেন্দ্রিক: মানসিক কাজ অতি মাত্রায় করার ফলে স্নায়ুকেন্দ্র কর্মক্ষমতা হারায়। ফলে এ ধরনের অবসাদ আসে। যেমন- পড়ার কাজ, অঙ্ক করার কাজ ইত্যাদি।

৩। ইন্দ্রিয়ের অবসাদ: যে কোনো কাজে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করতে হয়। আর অধিকক্ষণ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করলে ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা থাকে না যাকে ইন্দ্রিয়ের অবসাদ বলে। যেমন- কোনো স্বাদ বা গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে নেয়া হলে স্বাদেন্দ্রিয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবশ হয়ে পড়ে।

অবসাদ দূরীকরণের উপায়

- **পুষ্টিকর খাবার:** পরিশ্রমের পরে পুষ্টিকর খাবার এবং বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় খাবার, চা, কফি ইত্যাদি খেলে অবসাদ দূর হয়।
- **কর্মবিরতি:** কাজ করতে করতে যখন অবসাদ আসলেকাজে বিরতি দিলে অবসাদ দূর হয়ে যায়।
- **ঘুম:** ঘুমের মধ্য দিয়ে আমরা পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করি। এটি অবসাদ দূরীকরণের অন্যতম উপায়।
- **অঙ্গ সঞ্চালন:** প্রতি ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা পর ৫ মিনিটের অঙ্গ সঞ্চালন বা হাল্কা ব্যায়ামে অবসাদ দূর হয়।
- **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি :** শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীদের জীবনভিত্তিক, বয়স উপযোগী, ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী এবং হৃদয়গ্রাহী হলে অবসাদ আসে না।

- **শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা:** শিক্ষার্থীদের বয়স, রুচি ও ক্ষমতাভেদে বক্তৃতা পদ্ধতি, কখনও প্রদর্শনী পদ্ধতি ইত্যাদি উপায়ে শিক্ষাদান করতে হবে। শিক্ষককে স্নেহসীল,নীতিবান, ধী-শক্তি সম্পন্ন ও উদ্যমী হতে হবে।
- **কাজের স্বীকৃতি:** কাজের স্বীকৃতি পেলে অবসাদ থাকে না।
- **পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ:** পরিবার ও সমাজে কলহপূর্ণ পরিস্থিতির বদলে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করলে অবসাদ দূর হয়।

শিক্ষার্থীর মানসিক পরিবর্তনে শিক্ষক ও পরিবারের ভূমিকা

মনোযোগ ছাড়া কোনো শিক্ষাই সার্থক হতে পারে না। তাই শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনোযোগের রীতি-নীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি অবশ্যই জানতে হবে । শিশুকে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী করে তোলাই হচ্ছে শিক্ষকের প্রধান কাজ। শিক্ষার্থী যখন শিক্ষা গ্রহণে আপনা থেকেই আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ হবে তখনই শিক্ষা সার্থক হবে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বলেন, কোনো শিক্ষাই শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতন প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। সেই আত্মপ্রচেষ্টার মূল কথাই হলো শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং মনোযোগ। শিক্ষার ক্ষেত্রে যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় তখন সেই সমস্যার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ পুরোপুরি আকর্ষিত না হলে কখনই সেই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে পারবে না। তাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হলো পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের উপায়সমূহ হলো–

১. **মনোরম পরিবেশ:** বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া বসার জায়গা, চলাফেরার সুবিধা থাকা উচিত। এতে করে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি আগ্রহী এবং মনোযোগী হবে।

২. **সুন্দর উপস্থাপনা:** শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা, চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও জীবনভিত্তিক উপায়ে সুন্দর ও সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে পাঠ পরিবেশন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকের নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়।

৩. **মনোবৈজ্ঞানিক রীতির অনুশীলন:** শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের সামনে রেখে শিক্ষক বিষয়বস্তুকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই তা বুঝতে পারে। যেমন-পাঠের বিষয়বস্তু সহজ হতে কঠিন, জানা থেকে অজানা, পুরাতন থেকে নতুন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নতুন পাঠের উপস্থাপনা করতে হবে।

৪. **উপকরণ ব্যবহার:** শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উপযোগী শিক্ষাপোকরণ অর্থাৎ ম্যাপ, চার্ট, ছবি, মডেল প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে।

৫. **শৃঙ্খলা বিন্যাস:** বিদ্যালয়ের পরিবেশ শৃঙ্খলাপূর্ণ সুন্দর ও মনোরম রাখার ওপর শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আগ্রহ ও প্রবণতা বর্ধিত হয় এবং সহজেই পাঠে মনোযোগী করে তোলা হয়।

৬. **মেজাজের ভারসাম্যহীনতা:** শিক্ষকের মেজাজ কড়া ও রুক্ষ হলে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছ হতে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুন্দর মনোভাব এবং আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করে তোলা যায়।

৭. **সময় তালিকা প্রণয়ন :** বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় শিক্ষককে সময় তালিকার প্রতি খুবই মনোযোগী হবে। কারণ সময়ের প্রতি যদি খেয়াল না থাকে তবে ক্লাস দীর্ঘ হবে এবং শিক্ষকদের মাঝে একঘেঁয়েমি মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

৮. **ভালো আচরণ:** শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকগণ সহানুভূতিশীল ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করবেন। শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়ে অংশগহণ করার সুযোগ করে দিবেন। এগুলো তাদেরকে আগ্রহ সৃষ্টি কতে সাহায্য করবে।

৯. **মনোভাব:** শিক্ষকের মনোভাব মনোযোগ আকর্ষণের একটা প্রধান উপলক্ষ। শিক্ষককের সহৃদয় স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, পাঠদানের সময় সরস পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পিতৃ/মাতৃসুলভ আন্তরিক প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীদের মনকে স্বভাবতই পাঠে উন্মুখ করে তোলে।

১০. **বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাদান:** বিষয়বস্তু বাস্তবভিত্তিক, শিক্ষার্থীদের চাহিদামাফিক ও জীবনভিত্তিক হলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ে এবং মনোযোগী হয়।

শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যদের ভাবভঙ্গি, সুন্দর ও রুচিসম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, পাঠদানে সুষ্ঠু পরিবেশ, পিতৃ/মাতৃসুলভ বাচনভঙ্গি, আন্তরিক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠে মনোযোগী করে তুলতে পারে।

৩.৫ আবেগিক বিকাশ: আবেগ ও উদ্বিগ্নতা, আবেগ ওঠা-নামা, নিয়ন্ত্রণ কৌশল

আবেগ হল শরীরের একটি আলোড়িত বা উত্তেজিত অবস্থা। এটি হল কোন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীদেহের একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া। এটি 'মানসিক অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মপ্রবণতা জাগায়।' আবেগ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Emotion. এটি ল্যাটিন শব্দ *Emovere* হতে উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত প্রাণী বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে যে উত্তেজিত বা আলোড়িত অবস্থায় উপনীত হয় তাকেই আবেগ (Emotion) বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। একে 'প্রক্ষোভ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। জীবমাত্রই আবেগ রয়েছে।

যেকোন প্রতিক্রিয়া উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাণীর মধ্যে মানসিক এবং শরীরবৃত্তীয় যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে আবেগ বলা হয়। আবেগ মানুষের সহজাত ধর্ম। আবেগহীন মানুষ যন্ত্রসম। আবেগ হল এক ধরণের জটিল অনুভূতি যার মূলে রয়েছে কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি (Basic instinct) এবং কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণাা একে জাগরিত করে এর দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতগুলো বিশেষ ধরণের দৈহিক বিকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানারকম কাজে প্রবৃত্ত হই।

মানব জীবনে আবেগের অপরিসীম প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আবেগ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। মানুষ নিজের ইচ্ছামত আবেগ সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সমাজ, সংস্কৃতি, বয়স, লিঙ্গ, শিখন প্রভৃতি কারণে মানুষ বিভিন্নভাবে আবেগ প্রকাশ করে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ আবেগের নিয়ন্ত্রণ, আবেগ গোপন বা অবদমিত করতে শিখে।
আবেগ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল-

- **ম্যাকডুগাল** বলেন- "আমাদের আচরণ ও চিন্তার মূলে রয়েছে কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সাথে জড়িত আছে একটি করে আবেগ।"
- **ওয়েবস্টার** এর মতে-"আবেগ একটি ভারসাম্যচ্যুত অভ্যন্তরীণ শারীরিক অবস্থা যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভব করা যায় এবং স্নায়ুবিক ও মাংসপেশী, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদয়যন্ত্রো ক্রিয়া, হরমোনা এবং অন্যান্য দৈহিক কাজের প্রস্তুতি তৈরি করে যা প্রকাশ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। "
- **ক্রাইডার** এবং অন্যান্য (১৯৮৪)-"আবেগ হল ব্যক্তিনিষ্ঠ দৈহিক এবং প্রকাশভঙ্গির একটি জটিল অবস্থা।"
- এফ.বি.ম্যাকমোহন এবং জে.ডব্লিউ ম্যাকমোহন (১৯৮৬) বলেন-"আবেগ ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ উপাদানের একটি জটিল মিশ্রণ যা স্নায়ুতন্ত্র এবং গ্রন্থিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়।"

আবেগ বা প্রক্ষোভ হল মনের এক আলোড়িত, বিচলিত বা উত্তেজিত-উৎক্ষিপ্ত অবস্থা এবং যা জীবের শারীরিক পরিবর্তন ও আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এটি কোন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীদেহের একটি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া। প্রতিটি প্রাণীর আবেগের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দৈহিক পরিবর্তন এবং বহিঃপ্রকাশ- এ তিনটি অবস্থা বর্তমান থাকে।

আবেগ নিয়ন্ত্রণ

আবেগের অভিব্যক্তি ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সমাজে কেউ সামান্য কারণে রেগে যায়, কেউ অল্পতেই ভীত বা উত্তেজিত হয়ে পড়ে যার পরিণাম বা ফল কখনই শুভ হয় না। তাই আবেগের সুষ্ঠ বিকাশ ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে তথা জাতীয় জীবনে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে। নিম্নে আবেগ নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় তুলে ধরা হল-

- আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যহে ব্যক্তির আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- শিক্ষা মনীষীদের অভিমত হল পারস্পারিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিক আদর্শের মাধ্যমেই সামাজিক জীবনে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- শিশুদের মাঝে সহমর্মিতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে অতিরঞ্জিত আবেগ দমন করা যায়।
- শিক্ষার্থীরা তীব্র আবেগকে উপেক্ষা না করে তার ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরে নিয়ন্ত্রিত আবেগের সুফল বুঝিয়ে দিয়ে সঠিক ভাবে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল অনুশীলন করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সেবামুলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আবেগ দমন করা যায়।

সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনের জন্য অতিরঞ্জিত আবেগ অবশ্যই দমন করতে হবে। সামান্য কারণে কেউ রেগে উঠলে অসুখ-বিসুখে চঞ্চল হয়ে উঠলে যথাসম্ভব ধীরস্থির প্রক্রিয়ায় আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এখানে আত্মসংযমই হল প্রধান হাতিয়ার।

৩.৬ সামাজিক বিকাশ : পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, বন্ধু ও স্বজন, বন্ধু নির্বাচন প্রক্রিয়া

বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে এবং তাদের কৈশোর আবেগকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবক এবং মাতা-পিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারলে গৃহ, পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয় তথা দেশের প্রভূত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য যৌবন প্রাপ্তদের সর্বতোমুখী বিকাশকে স্বাস্থ্যময় ও সুষম করে তুলতে হলে পিতামাতা, শিক্ষক এবং অভিভাবকদেরকে কতগুলো বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয়, শিক্ষক, অভিভাবক এবং পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো-

১. যৌবনপ্রাপ্তদের সাথে শিক্ষক, অভিভাবক এবং মাতাপিতাকে অবশ্যই সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সাথে আচরণ করতে হবে এবং আচরণ বা চিন্তার সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে।
২. তাদের মাঝে সৃষ্ট শারীরিক পরিবর্তনগুলোকে খুব সহজভাবে নিতে হবে। কখনই একে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা যাবে না।
৩. তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদাকে যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে এবং সংসারের ছোটখাটো কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।
৪. বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ এবং যুক্তিদানের সুযোগ দিতে হবে।
৫. তাদের সঠিক বিকাশের নিমিত্তে যোগ্যতা অনুযায়ী সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সুযোগ দিতে হবে।যেমন- খেলাধুলা, বনভোজন, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি।
৬. বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলো তুলে ধরে তার সুন্দর সমাধানের জন্য সঠিক পরামর্শ, উপদেশ ও নৈতিক আদর্শ তুলে ধরতে হবে।
৭. শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে ধরতে হবে।
৮. অশ্লীল বই, পত্র-পত্রিকা এবং অপসংস্কৃতি হতে সকলকে বিরত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে মনোযোগী করে তুলে তাদের ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করতে হবে।
১০. শিক্ষার্থীদেরকে আত্মনির্ভর ও কর্মমূখী জীবনে উদ্বুদ্ধ করে তাদের সামনে সঠিক নীতিবোধের শিক্ষা তুলে ধরে তাদের সকল কৌতূহলের সঠিক সমাধান দিতে হবে।

বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীরা নানারকম সমস্যা ও বিপদের মধ্য দিয়ে চলছে। বর্তমানে যারা বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করছে, তারা মাদকাসক্তি, এইচআইভি/এইডস ও বিভিন্ন যৌনরোগ, শিশু পাচারা, সহিংসতা ও সন্ত্রাস, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন, নানা রকমের বৈষম্য ইত্যাদি ব্যক্তিক ও সামাজিক সমস্যার মধ্য দিয়েই প্রতিনিয়ত পথ চলছে। অথচ এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় তাদের জানা নেই। এসব বিপদ ও সমস্যা মোকাবেলায় তাদের সহায়তা করবে, বুদ্ধি যোগাবে, এমন মানুষের প্রয়োজন। কারণ, শিশু-কিশোরদের প্রধান আশ্রয় তাদের মা-বাবা এসব সমস্যার মধ্য দিয়ে আসেননি। তাছাড়া তাঁরা ব্যস্ত থাকেন জীবিকার তাগিদে। একান্নবর্তী পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে গেছে বলে প্রয়োজনে দাদা-দাদি বা নানা-নানিরও দেখা মেলে না। পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সখ্য অতীতের বিষয়; বন্ধু, সহপাঠী সতীর্থরাও তাদের মতোই বিপন্ন। এই বিপন্ন অবস্থা সাহস ও শক্তির সাথে মোকাবেলায় কিশোর-কিশোরী তরুণদের সমর্থ করে তোলা একান্ত জরুরি।

৩.৭ এলএসবিই (LSBE-Life Skills Based Education), মাদকাসক্তি, HIV, AIDS, SRHR (Sex and Reproductive Health Rights) সম্পর্কে সচেতনতা

এলএসবিই (LSBE-Life Skills Based Education)

জীবন দক্ষতা হচ্ছে কিছু মনোসামাজিক দক্ষতা যা শিক্ষার্থীকে তার দৈনন্দিন জীবনের সম্ভাব্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সফলভাবো মোকাবেলা করার এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করে। এ দক্ষতাগুলো তাকে সকল পরিস্থিতিতেই ইতিবাচক আচরণে সমর্থ করে; নিজের ও অপরের সকল রকম অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার মতো দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। জীবন দক্ষতা শিক্ষার্থীকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সক্ষম করে তোলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, æLife skills are the abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effecitvely with the demands and challanges of everyday life.”

জীবন দক্ষতা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এক নয়। যদিও এ দুই ধরণের দক্ষতাকে প্রায়শই সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়। বৃত্তিমূলক ও কারিগর দক্ষতা, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, উদ্যোগ গ্রহণের দক্ষতা ইত্যাদি সরাসরি যা জীবিকা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত।জীবন দক্ষতা হচ্ছে মনোসামাজিক দক্ষতা। এগুলো জীবিকা অর্জনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনারা সার্বিক বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা এমন একটি শিখন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণ- শিখন এ্যাপ্রোচ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন ও আয়ত্ত করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০টি জীবন দক্ষতা সনাক্ত করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)কর্তৃক সনাক্তকৃত ও সংজ্ঞায়িত ১০টি জীবন দক্ষতা হলো–

জীবন দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে
১. আত্মসচেতনতা (শারীরিক ও মানসিক)	নিজের শারীরিক ও মানসিক সবলতাা ও দুর্বলতা, গুণাবলি ও ত্রুটিসমূহ, অধিকার, মূল্যবোধা, সামর্থ্য, মানসিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা সৃষ্টির সামর্থ্য। গুণাবলি উন্নয়ন ও ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে সচেতনতা। আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টির সামর্থ্য।
২.সহমর্মিতা	ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় আছে এমন ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা যথাযথভাবে বোঝা, তার কথা শোনা এবং তার প্রতি সমঅনুভূতি প্রদর্শনে সক্ষমতা।
৩.আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা: (উপদক্ষতামূহ: দৃঢ়া প্রত্যয়মূলক দক্ষতা, 'না' বলার দক্ষতা, আলাপ আলোচনা দক্ষতা, অন্যকে স্বমতে আনার দক্ষতা)	অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনা ও বজায় রাখার সামথ্য। সম্পর্ক ছেদ করতে হলে গঠনমূলকভাবে তা করার সক্ষমতা। নিজের যুক্তিসঙ্গত মত প্রতিষ্ঠায় অটল থাকা। অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনাকাঙ্খিত চাপ প্রত্যাখ্যানা করা, অন্যের ভালো কাজ ও অবদানকে সম্মান প্রদর্শন করা। অন্যকে ভালো কাজা করায় প্রভাবিত করার সামর্থ্য।
৪.বিশ্লেষণমূলকা গভীর চিন্তনা দক্ষতা	প্রভাব, তথ্য ও পরিস্থিতি, বিজ্ঞাপন, বিবৃতি ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা।
৫. সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা	কোনো পরিস্থিতি বা বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের সামর্থ্য ও নতুন ধারণা সৃষ্টি ও তা বাস্তবায়নের সামর্থ্য।
৬.সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা	যথাযথভাবে কোনো পরিস্থিতি অনুধাবনের দক্ষতা। বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেরা সক্ষমতা।
৭.সমস্যা সমাধান দক্ষতা	সহজ এবং গঠনমূলক ভাবে সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য।
৮.আবেগ সামলানোর দক্ষতা	অনুভূতির উপর যুক্তিকা প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষমতা। মানসিক অবস্থাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে সহজ ও ইতিবাচক সমাধানে পৌছানোর সামর্থ্য।
৯.চাপ মোকাবেলার দক্ষতা	মানসিক চাপের উৎস সনাক্ত করার দক্ষতা এবং চাপের তীব্রতা.হ্রাস করার সামর্থ্য।
১০.যোগযোগ দক্ষতা	নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ (মৌখিক ও শরীরী ভাষার মাধ্যমে এবং লিখিতভাবে) করার সামর্থ্য। অন্যের কথাা সক্রিয়ভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে শোনার দক্ষতা। অন্যকে দোষারোপ না করে এবং অন্যের মনে কষ্ট না দিয়ে কথা বলার দক্ষতা। অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা।

কেন জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা

বিশ্বের সকল দেশের কিশোর- কিশোরীদের মতো বাংলাদেশের ছেলে- মেয়েরাও বর্তমানের এই সমস্যা-সংকুল সময়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জ, সমস্যা ও যন্ত্রণা মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিপন্ন ও অসহায়। স্কুলগামী কিশোর- কিশোরীদের সহায়তা প্রদানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে স্কুল, সবচেয়ে বড় সহায়ক হচ্ছেন শিক্ষক এবং মা- বাবা ও সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক।তাই স্কুলে পাঠ্যপুস্তক এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে মনোসামাজিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের ব্যবস্থা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যমান শিক্ষাক্রম অধিকতর দক্ষতাভিত্তিক করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য বহুবিদ দক্ষতার সাথে জীবন দক্ষতাও এর অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানকে দক্ষতায় পরিণত

করে এর প্রায়োগিকতা নিশ্চিত করা না গেলে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের অগ্রগামিতা নিশ্চিত করা যায় না।এই সব কারণেই আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক শিক্ষায় জীবন দক্ষতা ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোতে (যেমন- শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার,পাকিস্তান) এক দশকেরও বেশি সময় আগে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

- বয়সোপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাসম্পন্ন দক্ষ নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। তাদের সকল সম্ভাবনা ও প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিয়ে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সামর্থ্যও প্রণোদনা সৃষ্টি;
- শিক্ষার্থীদের আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন এবং সফলতা অর্জনে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দৈনন্দিন জীবনের প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণে সক্ষমতা অর্জন;
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, সবল ও নিরাপদ জীবন যাপনে সক্ষমতা অর্জন;
- ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে অবদান রাখার সামর্থ্য অর্জন।

মাদকাসক্তি

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটা মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের পারস্পারিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতাা সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমই প্রশ্ন বাড়তে থাকে, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে এবং ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাকদকসক্তি।

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি নেশাকে বোঝায়। যে সব দ্রব্য সেবন করলে আসক্তির সৃষ্টি হয়, জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি কমে যায়, সেগুলো মাদকদ্রব্য। সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, তাড়ি, গাঁজা, চরস, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের নাম । কখনো কখনো অনেক ঔষধও মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মধ্যে ঘুমের ঔষধেরই বেশি অপব্যবহার করা হয়। কোনো ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ম মেনে গ্রহণ করলে সেটা উপকার করে। কোনো কোনো ঔষধ আছে, যদি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া, নিয়ম না মেনে পরিমাণ ঠিক না রেখে ব্যবহার করা হয়, তা হয় অপকারী মাদকদ্রব্য। যেমন- ঘুমের ঔষধ।

মাদক গ্রহণের ফলে মাদকের প্রতি প্রচন্ড মানসিক ও শারীরিক নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। একবার কারও মাদকের নেশা হলে তার দেহ ও মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। যার ফলে সে বারেবারেই মাদক গ্রহণ করে। এ সব ব্যক্তির মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন শরীরের চিকিৎসা, মনোচিকিৎসা এবং সহমর্মিতা।

মাদকাসক্তি বিস্তারের কারণ

সমাজে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ হলো মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতুহল। অনেক সময়ই দেখা যায় কিশোর-কিশোরীরা বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ শুরু করে। অনেক সময় মেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য বা সে যে বড় হয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য ছেলেরা ধুমপান শুরু করে। মাদকাসক্তির আর একটি কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিশোর-কিশোরী ও যুব সমাজ সবকিছু জানে না বলে তারা মাদকদ্রব্য গ্রহণে কৌতূহলী হয়। এছাড়াও যে কারণ রয়েছে সেগুলো হলো-

- **ভৌগোলিকা অবস্থান ও মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতাঃ** বাংলাদেশের প্রতিবেশী কিছু দেশে প্রচুর পরিমাণ মাদকদ্রব্য (হেরোইন, আফিম) উৎপন্ন হয়। এগুলো বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলে যায়। ফলে দেশে খুব সহজেই এ সকল মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। দেশের ভিতরে মাদকদ্রব্যের এই সহজলভ্যতা মাদকাসক্তি বিস্তারের একটি প্রধান কারণ।

- **দারিদ্র, বেকারত্ব ও হতাশাঃ** উপার্জনক্ষম ও কর্মক্ষম অনেক তরুণ ও যুবক কাজ করার সুযোগ না পেয়ে বেকার বসে থাকে। ফলে তাদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়। এসব লোক হতাশা দূর করার জন্য মাদকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এভাবে মাদকাসক্তির বিস্তার ঘটে। এছাড়া কৌতূহলের বশে অনেকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

- **ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাবঃ** সমাজে বিভিন্নভাবে বিদেশের অপসংস্কৃতি প্রবেশের ফলে অনেকের মাঝেই ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব দেখার ফলে তারা মাদক গ্রহণ করছে। এতে দেশে মাদকাসক্তির বিস্তার ঘটছে।

- **ব্যক্তির হীনমন্যতা ও দুর্বলতাঃ** মাদকদ্রব্য ক্ষতিকর জেনেও কোনো কোনো ব্যক্তির হীনমন্যতাবোধ এবং মানসিক দুর্বলতার কারণে মাদকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।
- **পারিবারিক অশান্তিঃ যে** সকল পরিবারে সবসময় ঝগড়া লেগে থাকে, সন্তান মা-বাবার আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত বঞ্চিত, যে সব ছেলেমেয়েরা হতাশার কারণেও অশান্তিতে এড়াতে মাদকদ্রব্য গ্রহণে উৎসাহিত হয়। ফলে মাদকাসক্তি বিস্তার লাভ করে।

এইচআইভি, এইডস্

প্রত্যেক মানুষের শরীরেই নিজস্ব রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে শরীরে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে সেটা সহজে শরীরের কোনোা ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ভাইরাস আছে যা শরীরের এ বিশেষ ক্ষমতাকে আস্তে আস্তে দুর্বল করে এবং এক সময় তা সম্পূর্ণভাবেই নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। এইচআইভি এমনই একটি ভাইরাস।এইচআইভি মানুষের শরীরে উৎপন্ন তরল যেমন- রক্ত, বীর্য, যোনিরস, বুকের দুধ ইত্যাদিতে থাকে। তাই এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য, যোনিরস সুস্থ শক্তির শরীরে প্রবেশ করলে এবং সংক্রমিত মায়ের বুকের দুধ সুস্থ শিশু পান করলে তারও এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে।

HIV এর পূর্ণরূপ–

H = Human (মানুষ)

I = Immuno – deficiency (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস)

V = Virus (জীবাণু)

HIV কে সম্প্রসারণ করলে দাঁড়ায় Human Immuno deficiency Virus যার বাংলা অর্থ- মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী ভাইরাস। এ ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে পরিণামে তার এইডস হয়।

এইডস

এইচআইভি কোন মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করার মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানাধরণের রোগে (যেমন- ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) ঘন ঘন আক্রান্ত হয়। প্রচলিত চিকিৎসায় এ সমস্ত রোগ ভালো হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস (AIDS)বলে।

AIDS এর পূর্ণরূপ-

A = Acquired (অর্জিত)

I = Immune (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা)

D = Dificiency (হ্রাস)

S = Syndrome (লক্ষণসমূহ)

এইডস কোনো রোগ নয়, এটি একটি অবস্থা। এর কোনো টিকা বা নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা বা প্রতিষেধক ঔষধ আজও আবিস্কার হয়নি। তাই কোনো ব্যক্তির এইডস হলে মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি।এইচআইভি নামক বিশেষ ভাইরাসের কারণে এইডস হয়।এইচআইভি কোনো ব্যক্তির শরীরের প্রবেশের সাথে সাথে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। ভাইরাস আক্রমণের অনেক বছর পর এইডস-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারে। এ কারণে সে নিজেও জানেনা যে তার এইচআইভি সংক্রমণ ঘটেছে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের অজান্তে বিভিন্নভাবে অন্যদের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে।

সে জন্য জানতে হবে কীভাবে এ ভাইরাস ছড়ায় এবং কীভাবে ছড়ায় না।

এইচআইভি যে সব উপায়ে ছড়ায়-

- এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে;
- এইচআইভিা সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ/ সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে;
- এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে;
- এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির অপারেশনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে;
- এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ পান করার মাধ্যমে এ রোগ সন্তানের দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে।

এইচআইভি যে সব উপায়ে ছড়ায় না–

- মশা বা পোকামাকড়ের কামড়ের মাধ্যমে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ওঠাবসা করলে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে এক থালায় খাবার খেলে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গোসলখানায় বা পুকুরে গোসল করলে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়, বিছানা বা আসবাবপত্র ও বাসন-কোসন ব্যবহার করলে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে লেখাপড়া বা খেলাধুলা করলে;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে।

এইচআইভি-র লক্ষণ

এইচআইভি কারো শরীরে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। লক্ষণ দেখা দিতে অনেক সময় লাগে। এ সব লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তির এইডস হয়েছে। এইডস এর কিছু লক্ষণ রয়েছে। এ লক্ষণগুলো হচ্ছে-

- অতি দ্রুত ওজন হ্রাস পাওয়া;
- রাতে জ্বর আসা;
- শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া;
- অবসাদগ্রস্ত থাকা;
- দুমাসের অধিক সময় ধরে ডায়রিয়া;
- দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি।

SRHR সম্পর্কে সচেতনতা

SRHR এর পূর্ণরূপ হলো Sex and Reproductive Health Rights. এর মূল কথা হলো-

- You have the right to make decisions about your own body. Nobody should force you to do anything you don't want to do.
- You have the right to information and education about sex and sexuality, so you can make informed decisions when it comes to issues such as whether or not to have sex, using contraceptives, protecting yourself from infection.
- You have the right to equality and to be free from discrimination, whatever your sexual orientation
- You have the right to be free from sexual violence and sexual abuse
- You have the right to decide if you want to have children or not
- You have the right to choose if you want to get married or not
- You have the right to good quality health care
- You have the right to be involved on all levels when it comes to addressing these rights.

প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানব শরীরের যে সব অঙ্গ শিশু জন্মদানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত সে সব অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। প্রজনন স্বাস্থ্য প্রজননতন্ত্র এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি শিশু সে ছেলে কিংবা মেয়ে যেই হোক না কেন, তার জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি জড়িত। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এটি রক্ষা করার বিষয়ে সবারই জানা প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকার কারণে তারা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অনেক জটিলতার সম্মুখীন হয়। বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের মাসিক আরম্ভ হয় এবং ছেলেদেরও শারীরিক পরিবর্তন হয়। তাদের স্বপ্নদোষ ঘটে। বয়ঃসন্ধিকালের এসকল পরিবর্তনের সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। কারণ এসময়েই একটি ছেলে ও মেয়ের শরীর পুরুষ ও নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিক এবং ছেলেমেয়েদের স্বপ্নদোষ দ্বারা তাদেরা প্রজনন ক্ষমতার শুরু হয়।

প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

ঋতুস্রাবা বা স্বপ্নদোষ ঘটলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত গোসল করা দরকার। পুষ্টিকর খাবার ও প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। কোনো রকম জটিলতা দেখা দিলে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এখনও হাজার হাজার মা মৃত্যুবরণ করেন। এর কারণ অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে এবং সন্তান ধারণ। এর ফলে অনেকে বিভিন্ন রকম রোগের শিকার হন।মেয়েরা প্রাপ্ত বয়সে বিয়ে করলে এবং সন্তানধারণ করলে প্রসূতি মায়ের এবং শিশুর মৃত্যুঝুঁকি কমবে।ঘন ঘন সন্তান নিলে মা ও শিশুর জীবন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। উপযুক্ত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে ঘন ঘন সন্তান ধারণের ঝুঁকি থেকে মেয়েরাই পাবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যা সীমিত রাখলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রজনন স্বাস্থ্যের সুস্থতা নারী-পুরুষের পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এর প্রভাবে পরিবার ও সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। শিশুরা স্বাস্থ্যবান হবে ও নীরোগ থাকবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বর্ধন কী
২. বিকাশ ও পরিণমনের সংজ্ঞা দিন।
৩. বয়ঃসন্ধিকাল কী?
৪. এরিকসনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধাপগুলি উল্লেখ করুন।
৫. হাওয়ার্ড গার্ডনারের বহুবিধ বুদ্ধিতত্ত্ব কী?
৬. আবেগ কী?
৭. বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে অভিভাবক ও পিতামাতার কর্তব্যগুলো তুলে ধরুন।
৮. জীবন দক্ষতা কী?
৯. জীবন দক্ষতা ভিত্তির শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।
১০. মাদকাসক্তি কী?
১১. HIV ও AIDS কী?
১২. প্রজনন স্বাস্থ্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমনের ব্যাখ্যা দিন।
২. বয়ঃসন্ধিকাল কী? বয়ঃসন্ধিকালের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যাবলি লিখুন।
৩. এরিকসনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধাপগুলি উল্লেখ করে প্রত্যেকটি ধাপের ব্যাখ্যা দিন।
৪. গার্ডনারের বহুবিধ বুদ্ধিতত্ত্ব কী? শিক্ষায় এর প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যা করুন।
৫. আবেগ কী? আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো উল্লেখ করুন।
৬. WHO কর্তৃক সনাক্তকৃত ১০টি জীবন দক্ষতাগুলো অর্জনের উপায় লিখুন।
৭. মাদকাসক্তি কী? মাদকাসক্তি বিস্তারের কারণ ও নিরাময়ের উপায় লিখুন।
৮. HIV কী কী উপায়ে ছড়ায়? HIV বিস্তারের কারণ ও নিরাময়ের উপায় লিখুন।
৯. SRHR সর্ম্পকে সচেতনতা ওপ্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় আমরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারি?

ইউনিট ৪ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রমের ইংরেজি পরিভাষা Curriculum। এটি ল্যাটিন শব্দ*currere*থেকে এসেছে যার অর্থ 'course of study'অর্থাৎ পাঠ্যবিষয়। আবার অনেকে মনে করেন এটি ল্যাটিন শব্দ*currer* থেকে এসেছে যার অর্থ হল ঘোড় দৌড়ের মাঠ। শাব্দিক অর্থে যাই হোক না কেন, আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পরিচালিত কোর্সকে বুঝায়।শিক্ষাক্রম বিষয়ক ইউনিটের সমগ্র বিষয়টি মোট৫টি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে পাঠের শিরোনাম ও বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো-

৪.১: শিক্ষাক্রমের ধারণা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি
৪.২: শিক্ষাক্রম প্রনয়ণের যৌক্তিকতা
৪.৩: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল
৪.৪: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২: কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৪.৫: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন

৪.১ : শিক্ষাক্রমের ধারনা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ধারণা

আক্ষরিক অর্থে যাই হোক না কেন শিক্ষাক্রম শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যুগের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্রমের ধারণা ক্রমাগত বির্বতিত হচ্ছে। তাই শিক্ষাক্রমের সর্বজনস্বীকৃত কোন একক সংজ্ঞা বা ধারণার উদ্ভব হয় নাই। প্রাচীনকালে মানুষের বেঁচে থাকার দক্ষতা অর্জনই ছিল শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয়। ফলে তখনকার অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্রমের ধারণা বাস্তব রূপ পেতে থাকে এবং স্কটল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে তা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকায় শিক্ষাক্রমের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাক্রম বলতে মূলত *course of study* বা কতগুলো পাঠ্যবিষয়কে বুঝাত, যা অনুসরণ করে শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদান করতেন। সে সময় শিক্ষাক্রমের মূল ফোকাস ছিল শিশুর মানসিক এবং জ্ঞানের বিকাশ। এজন্য শিক্ষাক্রমে বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও মানসিক শৃঙ্খলা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত । প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদদেরও ধারণা ছিল যে, শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ ঘটাতে হলে স্কুলে শিক্ষাক্রমে কতগুলো অপরিহার্য বিষয়, অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এগুলো হলো মাতৃভাষা,গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, পশ্চিমা ও দেশীয় ভাবধারা। ফলে সে সময় শিক্ষাক্রমে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে অন্তভূর্ক্ত করা হতো।

শিক্ষাক্রম আধুনিক ধারণা

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও সংকীর্ণ ধারণার পরিবর্তন হয়ে আধুনিক ধারণার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এসময় শিক্ষাক্রম বলতে স্কুল কর্তৃক পরিচালিত সকল শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বুঝানো হতো। এ প্রসঙ্গে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাসওয়েল ও কম্পবেল (Caswell and Combell) শিক্ষাক্রমের পুরাতন ধারণার অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন ধারণা "শিক্ষাক্রম হল শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা" প্রস্তাব করেন। সে সময়ের অন্যান্য শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণও (Smith et.al, 1957 এবং Korr, 1968) শিক্ষাক্রমের এ ধারণাকে সমর্থন করেন। এভাবে শিক্ষাক্রম তার সংকীর্ণ ধারণার গন্ডি পার হয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং শিক্ষাক্রম কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তে স্কুলের নিয়ন্ত্রিত সকল শিখন-অভিজ্ঞতার সমষ্টিরূপে পরিগণিত হতে থাকে। কিন্তু তার পরও প্রশ্ন থেকে যায় স্কুল কর্তৃক কোন কোন অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে? শিক্ষার্থী ও বৃহত্তর সমাজ স্কুলের কাছে কোন অভিজ্ঞতাগুলো প্রত্যাশা করে? তাছাড়া স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতারগুলোর মধ্যে কোনগুলো কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত তা শিক্ষাক্রমের এই ব্যাপক ধারণা থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রমের আরও সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য ধারণার অনুসন্ধান করতে থাকেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ **রাফ টাইলার** কর্তৃক প্রদত্ত ধারণায় শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত এ সমস্যার কিছুটা সমাধান পাওয়া যায়। তিনি প্রথম বলেন-*শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষার্থীর সকল শিখন অভিজ্ঞতা*। এতে দেখা যায় তিনি শিক্ষাক্রমকে স্কুল পরিচালিত সকল কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা করার উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়া ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি শিক্ষার্থীর জীবনে স্কুলের প্রভাব প্রকটরূপে দেখা যায়। ফলে এ সময় শিক্ষাক্রমের ধারণা পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে আমেরিকায় বেশ কিছু শিক্ষামূলক প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু পাঠ শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্রমকে পরিকল্পনা (Instructional plan) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের প্রথমে অনেকে স্কুলের কাজকে শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন। শিল্প কারখানার যেমন কাচাঁমাল প্রক্রিয়াজাত করে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তেমনি স্কুলের কাজ হবে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এর ফলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন এবং স্কুলের জবাবদিহিতার প্রশ্ন গুরুত্ব পেতে থাকে। ফলে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত করার মানসে এ সময় শিক্ষাক্রমে আচরণিক উদ্দেশ্য লেখার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাক্রমের ধারণায় নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় ও পুরাতন ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের ধারণা

নিচে কয়েকজন মনীষী ধারণা উল্লেখ করা হলো যা শিক্ষাক্রমের ধারণা বুঝাতে সহায়ক হবে-

- হিলডা তাবা (১৯৬২) বলেন-, যুগের চিন্তাভাবনার অবয়বহীন ফসলই হলো শিক্ষাক্রম।
- হুইলার(১৯৬৭) শিক্ষাক্রম বলতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার গতিশীল কার্যক্রমকে বুঝিয়েছেন।
- কার (১৯৬৮)-এর মতে, বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন যা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করা হয় তাই শিক্ষাক্রম।
- জনসন (১৯৭০), শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার্থীও পারদর্শিতা বা ফল।
- লটন (১৯৭৩)- শিক্ষাক্রমের উপাদান অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সামাজিক কৃষ্টি থেকে নির্বাচিত করতে হবে।
- মার্শ এবং স্ট্যাফোর্ড (১৯৮৮) বলেন, শিক্ষাক্রম হলো 'পরিকল্পনা' ও 'অভিজ্ঞতার' পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সেট যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

শিক্ষাক্রমের কার্যকর সংজ্ঞা ও উপাদান

শিক্ষাক্রমের বিবর্তন এবং উপরিল্লিখিত ধারণাগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় শিক্ষাক্রমের ধারণা যুগ যুগ ধরে নিম্নোক্তভাবে বিবর্তিত হয়েছে। যেমন: শিক্ষাক্রম হচ্ছে-

১। বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান
২। মানসিক শৃঙ্খলা
৩। স্কুল নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা
৪। পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা
৫। শিক্ষাদান পরিকল্পনা
৬। শিখনফল
৭। জ্ঞানমূলক/অনুভূতিমূলক বিষয়বস্তু এবং প্রক্রিয়া
৮। প্রযুক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা

এসকল দিক ব্যাখ্যা করে Daniel Tanner and Laurel N. Tanner ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্রমের একটি কার্যকর সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন-"Curriculum is that reconstruction of knowledge and experience, systematically developed under the auspices of the school (or university) to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience."

শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে এর চারটি মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়-উদ্দেশ্য,বিষয়বস্তু,পদ্ধতি ও মূল্যায়ন।এগুলো পরস্পর সর্ম্পকযুক্ত ও নির্ভরশীল এবং পরিপূরক। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নকালে এর প্রত্যেকটি উপাদান সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়।প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্রম হচ্ছে একটি ব্যাপক ধারণা যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যতে মানবসম্পদ গড়া ও তাদেও কর্মে নিয়োজিতকরণের একটি সুদূরপ্রসারী কর্মপরিল্পনার দিকনির্দেশনা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য

অনেকেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কতগুলো সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. শিক্ষাক্রম একটি ব্যাপক ধারণা। পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমের একটি অংশমাত্র।
২. শিক্ষাক্রম হল একটি শিক্ষাস্তরের সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের(জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি) ও কর্মকান্ডের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। আর পাঠ্যসূচি হল একটি পাঠ্যবিষয়ে কী কী বিষয়বস্তু শেখানো হবে তার তালিকা।

৩. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের বিকাশসাধন। পক্ষান্তরে পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ দিকের বিকাশ সাধন।
৪. শিক্ষাক্রম একটি স্তরের বা বিষয়ের হতে পারে। কিন্তু পাঠ্যসূচি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা প্রণয়ন হয়।
৫. সামগ্রিক বিচারে শিক্ষাক্রম একটি বৃক্ষ হলে পাঠ্যসূচি হবে ঐ বৃক্ষের শাখা।

৪.২ : শিক্ষাক্রম প্রনয়ণের যৌক্তিকতা

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিশ্বের প্রায় সকল দেশই নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/পরিমার্জন করে থাকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/পরিমার্জনের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা আছে যা এক্ষেত্রে অনুসরণ করা প্রয়োজন। এছাড়া সমাজ ও সভ্যতার আধুনিকায়নের ফলে এমন অনেক চাহিদার সৃষ্টি হয়, যা শিক্ষাক্রমে যথার্থভাবে প্রতিফলন ঘটাতে হয়।

ক) শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা ও একাডেমিক যৌক্তিকতা

১. **শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** শিক্ষানীতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় দলিলে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে সে সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে এসব দিকগুলো প্রতিফলন ঘটাতে হয়।
২. **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক:** শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, সামর্থ ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষাক্রম হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
৩. **ব্যক্তির সামাজিক চাহিদার প্রতিফলন:** সামাজিক জীব শিক্ষার্থী সমাজেই জন্মগ্রহণ করে ও বেড়ে উঠে। আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তির নিজস্ব সত্ত্বা ও সামাজিক সত্ত্বা উভয় দিকের বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৪. **সৃজনশীলতার বিকাশ:** শিক্ষার কাজ কেবলমাত্র অতীত অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করা নয়। শিক্ষার্থী নিজস্ব সম্ভাবনা ও সৃজনশীলভাবে উন্নয়নেও শিক্ষার কাজ। অতএব, শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশকে গুরুত্ব দিতে হয়।
৫. **ভবিষ্যৎমূখী করা:** শিক্ষা হবে জীবনভিত্তিক। তবে শিক্ষা শুধু বর্তমান জীবন পরিস্থিতিকেই গুরুত্ব দিবে না, শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত জীবনের দায়িত্ব পালনেও প্রস্তুত করবে। সুতরাং শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সমাজের ভবিষ্যত চাহিদাকেও বিবেচনা করতে হবে।
৬. **জীবনের ধারণের প্রস্তুতি:** শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কর্মকান্ড এবং এগুলোর মাধ্যমে কীভাবে ব্যক্তির জীবনের চাহিদাসমূহের পরিপূরণ হচ্ছে সে সম্পর্কে জানার সুযোগ শিক্ষাক্রমে থাকবে।
৭. **সংরক্ষণ করা:** মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের মাধ্যমে আগামী দিনের পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার উপযোগী করে তুলতে হবে। মানবজাতির সাংস্কৃতিক/ঐতিহ্য সংরক্ষণের ও তাকে ভবিষ্যতমুখী করার অন্যতম মাধ্যম শিক্ষা। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা দ্বিমুখী-১) অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং ২) ভবিষ্যত সমাজের মধ্যে তার সঞ্চালন। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৮. **বিষয়বস্তুর সমন্বয় ও সহসম্পর্ক রক্ষা:** শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে বিষয়বস্তুসমূহ যৌক্তিভাবে ও মনোবিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় ও সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে।
৯. **ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে গুরুত্ব দেওয়া:** শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে প্রতিটি শিশুর/শিক্ষার্থী আত্ম-প্রকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ থাকে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমকে ব্যক্তিক পার্থক্যের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে যা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জটিলতা উপলব্ধি করতে ও তার সমাধানে সহায়ক হবে।
১০. **শিখন সক্ষমতা:** শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়/বিষয়বস্তু শেখার উপযোগী হতে হবে। সেই সাথে বিষয়বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তাও থাকতে হবে।

১১. **সামাজিক সংশ্লিষ্টতা ও উপযোগিতা:** শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহে এমনভাবে চয়ন করতে হবে যাতে করে শিখন ক্ষেত্র (discipline) হিসেবে তার গুরুত্ব থাকে। সেই সাথে তার নিজস্ব গুরুত্ব, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা থাকে।

১২. **অবকাশ সময়ের সদ্ব্যবহার:** খেলাধুলা, স্পোর্টস, শিল্পচর্চা, নান্দনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অবসর সময়টাকে কার্যকর ও আনন্দঘন ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে শিক্ষাক্রমে।

১৩. **বিভিন্নতার স্বীকৃতি ও নমনীয়তা:** শিক্ষাক্রমের সাধারণ উদ্দেশ্য হবে সকলের স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নয়ন। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্নতাকে (ছেলেমেয়ে, জাতি, গোষ্ঠী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করবে ও প্রত্যেকের বিশেষ চাহিদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ।

খ) শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিশ্বজনিন যৌক্তিকতা

বিশ্বের সকল দেশে দ্রুত সামাজিক বির্বতন ঘটেছে। এ বিবর্তনের সাথে শিক্ষার্থীদের খাপ খাইয়ে চলার জন্য কী ধরনের শিক্ষার দরকার তা নিয়ে ক্রমাগত চিন্তাভাবনা ও গবেষণা হচ্ছে। সামাজিক বিবর্তনের সূচকগুলো শিক্ষাকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এদিকগুলো বর্তমানে গুরুত্বেও সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

১. **জ্ঞান জগতের বিস্ফোরণ:** জ্ঞান জগৎ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন সৃষ্টি প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পরিবর্তিত ও জটিল পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২. **প্রযুক্তিগত অগ্রগতি:** বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে যা আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন কলাকৌশল উপহার দিচ্ছে। এগুলো ব্যবহার করে দ্রুত ও অধিকতর সক্ষমতার সাথে শিক্ষামূলক কর্মকান্ডসহ অন্যান্য পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এসব নবতর জ্ঞান ও কলাকৌশল সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া বর্তমান যুগ আইসিটি-র যা মানুষের জীবনের সকল দিককে স্পর্শ করেছে। প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অনেক কাজকে সহজ, সুবিধাজনক এবং মানসম্পন্ন করেছে। ফলে প্রযুক্তি নির্ভরতার এ যুগে সকলের এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম কাজ ব্যক্তির জীবন দক্ষতাও বাড়ানো। ফলে শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের শিক্ষার্থীদের আইসিটি-এর জ্ঞান ও দক্ষতা অপরিহার্য। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায়ও এর ফলপ্রসূ ব্যবহার জরুরি । শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নে অবশ্যই এ দিকটি গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. **চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাক্রম:** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৪. **একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতায় গুরুত্বারোপ:** বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা, সূক্ষ্ম চিন্তা, ফলপ্রসূ যোগাযোগ দক্ষতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সহমর্মিতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে একবিংশ শতাব্দীর এ দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. **আন্তর্জাতিকতার ধারণা:** বিশ্বায়নের ধারণা পুরো পৃথিবীকে একটি বিশ্বগ্রামে পরিণত করেছে। সুতরাং পুরো বিশ্বটাকে একটি পরিবার হিসেবে ধরে নিয়ে শিক্ষাক্রমের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষাক্রমের কাজ হবে শিক্ষার্থীদে মধ্যে এ ধরনের পরিবেশ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি।

৬. **গঠনবাদ:** বর্তমানে গঠনবাদকে শিক্ষার একটি মৌলিক নীতিমালা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গঠনবাদে বিশ্বাস করা হয় যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা গঠনের স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে জোর করে কিছু শেখানো বা চামুচে তুলে খাওয়া পরিহার করতে হবে। শিক্ষার্থীকে শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে শেখাতে হবে। যদি শিক্ষার্থী জ্ঞান/ধারণা গঠনে পুরোপুরি সক্রিয় থাকে তাহলে শিখন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হবে।

৭. **বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন:** বর্তমানে বহু দেশে শিক্ষার বিষয়বস্তুর কয়েকটি ক্ষেত্রকে সংগঠিত করে একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদেও মধ্যে কোন বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের সুযোগ ঘটে, যা বাস্তব সমস্যা সমাধানে অধিকতর কার্যকরী হয়।

৮. **কৃতিত্ব মূল্যায়নে গুরুত্বারোপ:** বর্তমানে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ প্রথাগত ২/৩টি আনুষ্ঠানিক সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সমস্যা সমাধান, বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক কাজ, মৌখিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব অধিকতর মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে উপরিল্লিখিত দিকগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণকে এ বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।প্রয়োজনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টজনদের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ করবেন।

৪.৩ : শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব/মডেল

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত নানারকম মডেল উপস্থাপন করেছেন যেগুলো শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশেষ দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যদিও মডেল বলতে কোন বস্তুর বাস্তব প্রতিরূপ বুঝায়, তবে শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে মডেলের ধারণাটি ভিন্ন। এক্ষেত্রে মডেল হল শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের একটি যৌক্তিক পরিকল্পনা বা ডিজাইন। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মডেল রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং একে অপরের পরিপূরক। এসব মডেল সম্পর্কে জানার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ শুরু করলে সুবিধা হয়।

টাইলের রৈখিক মডেল

রাফ টাইলার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রদান করেন। রাফ টাইলারের তত্ত্বটি সরল/রৈখিক, উদ্দেশ্যভিত্তিক ও চারধাপ বিশিষ্ট। তিনি চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে এ চারটি ধাপকে সহজরূপে চিত্রায়িত করেছেন। ধাপগুলো হল-

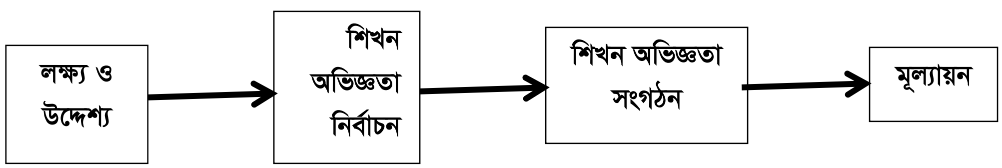

চিত্র ১: রাফ টাইলারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব

রাফ টাইলার প্রথম উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে প্রথমে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। উদ্দেশ্যর ভিত্তিতে বিষয়বস্তুও শিখন অভিজ্ঞতা চয়ন করতে হয়। তৃতীয় ধাপে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে সংগঠন ও বিন্যাস করতে হয়। সর্বশেষে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে।

হিলডা তাবার ধারাবাহিক মডেল

সমসাময়িক শিক্ষাবিদগণ টাইলর তত্ত্ব সমালোচনা করে বলেন এটি অতিমাত্রায় সরল ও সংক্ষিপ্ত। এছাড়া এতে উদ্দেশ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে যে অনভিপ্রেত শিখন ঘটে সেগুলো মূল্যায়নের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। এ প্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে হিলডা তাবা টাইলার তত্ত্বের উন্নততর মডেল উপস্থাপন করেন। তাঁর তত্ত্বটি সাত ধাপ বিশিষ্ট। এগুলো হল-

ধাপ-১: প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ: লক্ষ্য দলের চাহিদার আলোকে প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করেন।

ধাপ-২: উদ্দেশ্য নিরূপণ: যুক্তিসিদ্ধ পর্যবেক্ষণ বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার আলোকে উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেন ।

ধাপ-৩: বিষয়বস্তু নির্বাচন: নির্বাচিত উদ্দেশ্যের আলোকে যথাযথ বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে বলেন।

ধাপ-৪: বিষয়বস্তু সংগঠন: নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে পাঠদান সহায়ক বিভিন্ন ভিত্তিতে সংগঠিত করতে বলেন।

ধাপ-৫: শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন: চয়িত বিষয়বস্তু থেকে কী ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব শনাক্ত করেন।

ধাপ-৬: শিখন অভিজ্ঞতা বিন্যাস: শনাক্তকৃত অভিজ্ঞতাসমূহকে যথাযথভাবে বিন্যাসকরণ।

ধাপ-৭: মূল্যায়ন:প্রণীত শিক্ষাক্রম মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যদলের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা এবং শিক্ষাক্রম নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়নকরণ।

কারের শিক্ষাক্রম মডেল

কারের তত্ত্বটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি বিশদ মডেল। তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই তত্ত্ব প্রদান করেন। কার তত্ত্বে শিক্ষাক্রম প্রণয়নকালে যে সব বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ মডেল অনুসারে শিক্ষাক্রমকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চারটি মৌলিক উপাদানে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো- ১) উদ্দেশ্য,২) জ্ঞান, ৩) শিখন অভিজ্ঞতা, ও ৪) মূল্যায়ন। এতে একটি অংশের সাথে তার পূর্ববর্তী অংশের নিবিড় সম্পর্ক ও পারস্পর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে অপরাপর যে যে দিকে বা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয় এর সব কিছুই তাতে রয়েছে। কার- এর তত্ত্ব অনুসারে যখন যে অংশের উপর কাজ করা হয় তখন অন্যান্য অংশ সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হয় যাতে পরবর্তী সময়ে কোন কাজে ব্যাঘাত না হয়। নিচে কার তত্ত্বে চিত্র দেওয়া হল-

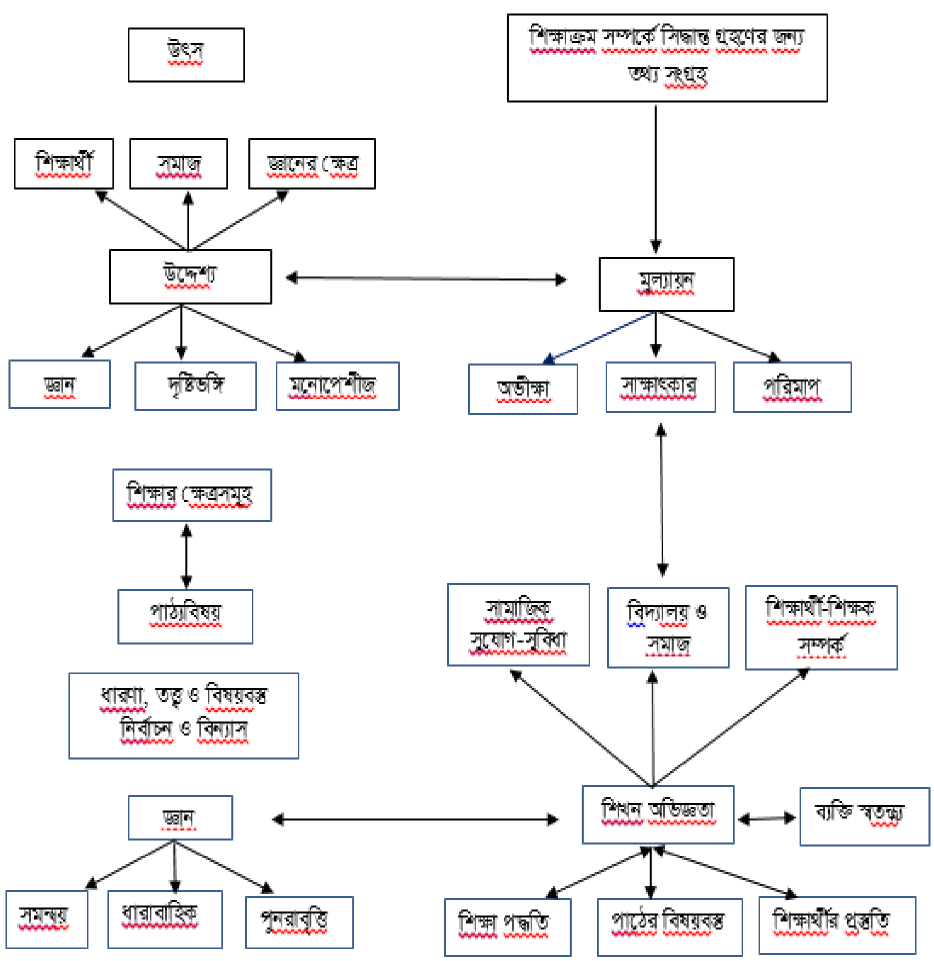

চিত্র: কারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব

কারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্বটি আধুনিক,বিশদ ও বিজ্ঞানসম্মত। এ মডেলে একটি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে নতুন আরেকটি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি জটিল মনে হলেও এর ব্যবহারযোগ্যতা অনেক বেশি। তবে এ তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলেজনবল, মেধা , শ্রম, সময়,অর্থ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে কার তত্ত্ব অনুসরণ করা সম্ভব হলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে বলে শিক্ষাক্রম বিশ্লেষকগণ মনে করেন।

হুইলার মডেল বা শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বৃত্তাকার মডেল

উদ্দেশ্যভিত্তিক বা রৈখিক মডেলে শিক্ষার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর সুযোগ নেই। এগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একবার করার পরও আবার নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন হতে পারে। এটি বিবেচনা করে বৃত্তাকার মডেলের উদ্ভাবন হয়েছে। এতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। এ তত্ত্বানুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। ফলে এ মডেলটিতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের যে কোন চাহিদার সাথেই খাপ খাওয়ানোর সুযোগ আছে। বৃত্তকার মডেলের প্রবক্তা হলেন হুইলার। এছাড়া নিকলস এবং প্রিন্ট মুরও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বৃত্তাকার মডেলের রূপরেখা প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম মডেলটিও বৃত্তাকার ।

হুইলার মডেলটি পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট। এ মডেলটি মূলত টাইলার মডেলের উন্নত সংস্করণ। হুইলার ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রদান করেন। নিচে হুইলার মডেলটি উপস্থাপন করা হল-

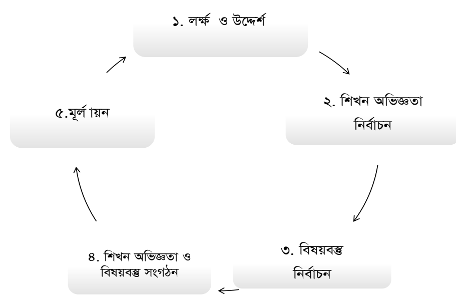

চিত্র ৩: হুইলার মডেল

হুইলার মডেলের ধাপসমূহ হলো–

- প্রথম ধাপে শিক্ষার ও শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে হয়।
- দ্বিতীয় ধাপে শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করতে হয়।
- তৃতীয় ধাপে বিষয়বস্তু শনাক্ত/নির্বাচন করতে হয়।
- চতুর্থ ধাপে শিখন অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু বিভিন্ন নীতি অনুসরণে বিন্যস্ত করতে হয়।
- পঞ্চম ধাপে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রম চক্রটি মূল্যায়ন করে দেখা হয় প্রতিটি ধাপ সঠিকভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা। যদি কোনরূপ ধরা পড়ে তবে পুনরায় সমগ্র চক্রটি সম্পন্ন করতে হয়।

হুইলারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলটি বৃত্তাকার। এর প্রধান অবদান হলো তিনি শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ধাপগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম সকল ধাপকে পরস্পর সম্পর্কযুক্তভাবে এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নকে একটি ধারবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। এর ফলে শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন ধাপের কাজ প্রয়োজনে একসাথে করার সুযোগ রয়েছে। যেমন- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের সাথেই শিখন অভিজ্ঞতা নির্ধারণের কাজ করা যাবে। আবার যখন বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও বিন্যাস করা হবে একইসাথে এটি পাঠদান পদ্ধতির সম্পর্কেও চিন্তা করতে পারে।

নিকলস মডেল

হাওয়ার্ড নিকলস ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য একটি বৃত্তাকার মডেল উপস্থাপন করেন। শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ার এ বৃত্তাকার মডেলে একটি নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে যার নাম 'বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ'। যাদের জন্য নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন বা পরিমার্জন করা হবে তাদের চাহিদা,সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা এবং প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণকেই এখানে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে সমাজে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন হবে তার বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ ও শিক্ষার্থীর চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে। হিলডা তাবার মডেলেও একইভাবে শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণের বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায় নিকলস মডেলটি যৌক্তিক কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পাঁচটি উপাদান রয়েছে-

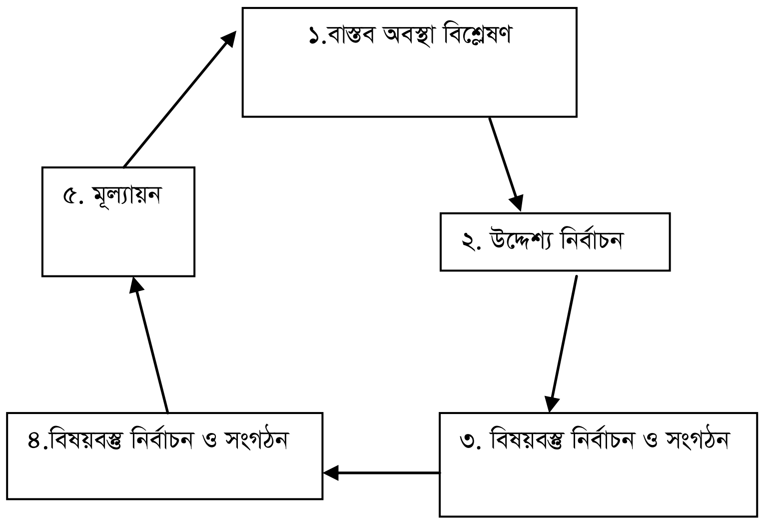

চিত্র ৪: নিকলস মডেল

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ দেয়। এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করলে তা জীবন ঘনিষ্ঠ হয়।

মুরের প্রিন্ট মডেল

বর্তমানে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে এর মিল রয়েছে। কারণ এটি একই সাথে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করে। কিন্তু পূর্ববর্তী মডেলগুলোতে কেবলমাত্র শিক্ষাক্রম উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুরের মডেলে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সকল কাজকে তিনটি সুনির্দিষ্ট Phase/পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

১. সংগঠন (oranization)
২. উন্নয়ন (development)
৩. প্রয়োগ/বাস্তবায়ন (application)

১। <u>সংগঠন</u>: এ পর্যায়ে যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করবেন তাদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনভাবে তা করা যায়। যেমন-

ক) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটিতে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক নিয়ে গঠন করতে হবে।

খ) সদস্যদের শিক্ষার ভিত্তিগত জ্ঞান ও শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রম মডেল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

গ) অন্যান্য উপাদান যা শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় কিন্তু শিক্ষাক্রম প্রণেতার কাজকে প্রভাবিত করবে সে দিকগুলো যথাসম্ভব নিশ্চিত করতে হবে। যেমন- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাতীয় নীতি, সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

২। উন্নয়ন: এ পর্যায়ে যথাযথ ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা (বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন, বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিখন কার্যক্রম, মূল্যায়ন ইত্যাদি)

৩। বাস্তবায়নঃ শিক্ষাক্রমকে কার্যে পরিণত করা (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন)

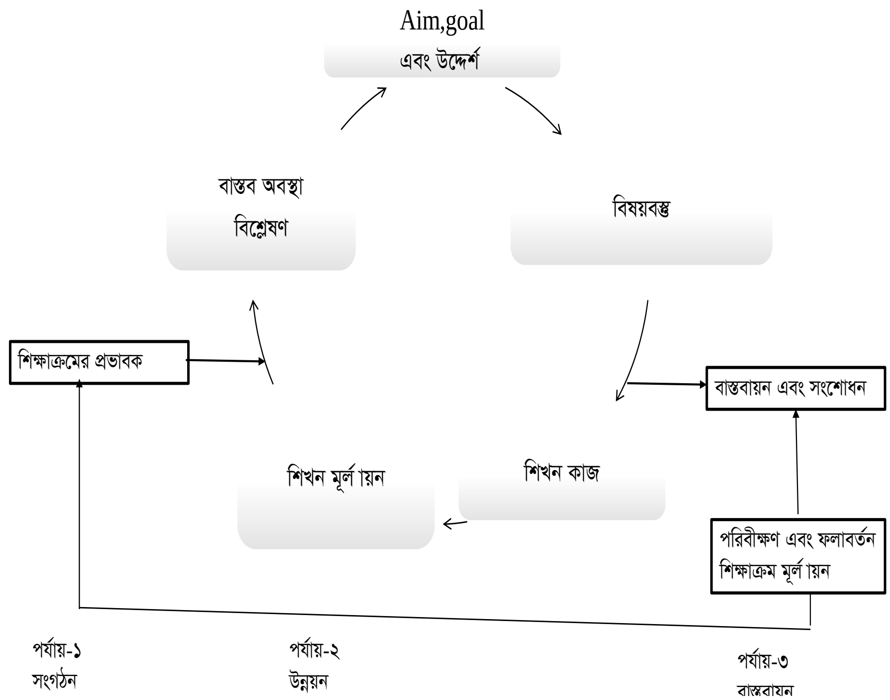

চিত্র ৫: মুরের প্রিন্ট শিক্ষাক্রম মডেল

ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

ইউনেস্কোর কর্তৃক উদ্ভাবিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত না হলেও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। নিচে ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের ধাপগুলো উপস্থাপন করা হল-

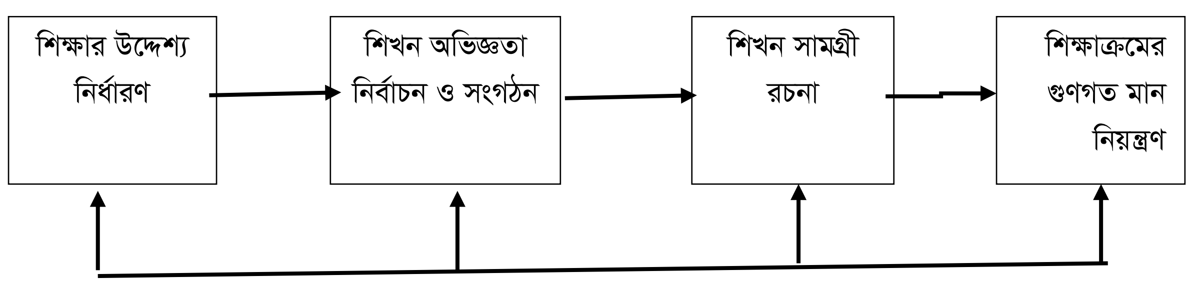

চিত্র ৬ : ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

বস্তুত ইউনেস্কো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের চারটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

- শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও সংগঠন
- শিখন সামগ্রী রচনা
- শিক্ষাক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ।

ওয়াকার স্বাভাবিক মডেল

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ওয়াকার (D.F.Walker) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মডেল প্রস্তাব করেন। বাস্তত ক্ষেত্রে একটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য এ মডেলের ধাপগুলো বেশ কার্যকর বলে গণ্য হয়। নিচের চিত্রে মডেলটি উপস্থাপন করা হল-

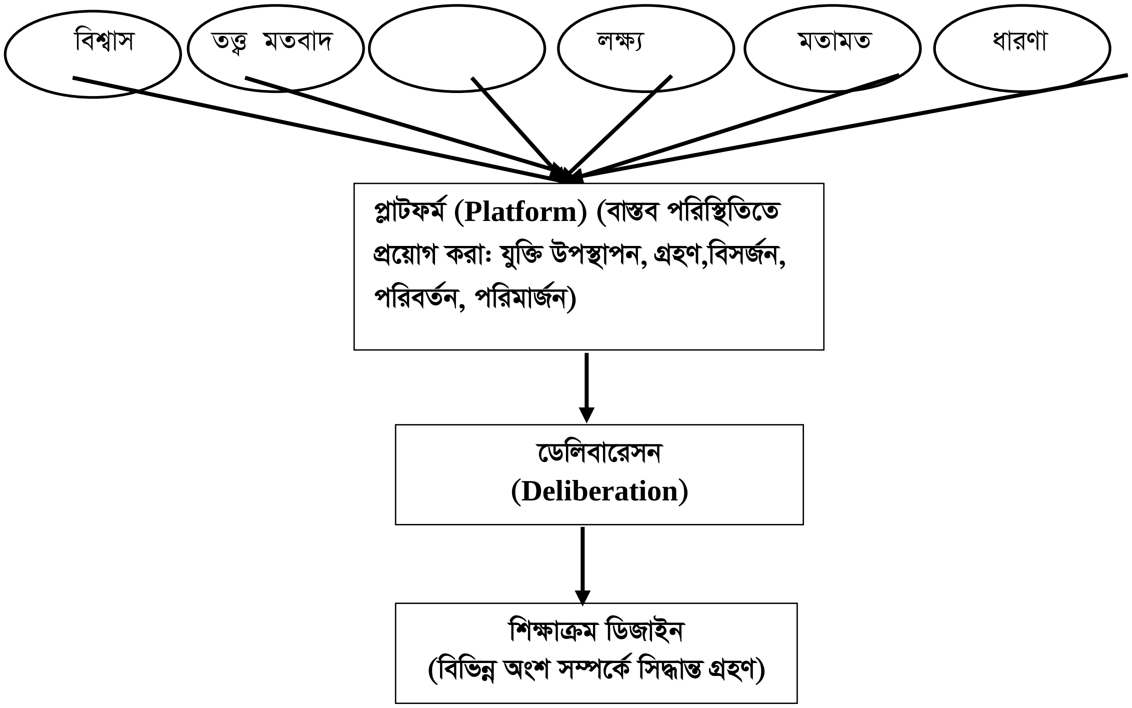

চিত্র ৭: ওয়াকার স্বাভাবিক মডেল

ওয়াকারের মডেলটি গতিশীল এবং interactive। এ তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পুরোপুরি ধারাবাহিক ও রৈখিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় না। বরং এ কাজটি শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যে কোন পর্যায় থেকে এবং যে কোন direction-এ সম্পন্ন হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষাক্রম প্রণেতা শিক্ষাক্রম চূড়ান্তের যে কোন অংশ নিয়ে যত বার প্রয়োজন কাজ করতে পারেন। ওয়াকারের মতে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজটি প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পরিচালিত করা সম্ভবও নয়। তাঁর মতে তিনটি প্রধান পর্যায়/ধাপে মূলত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজটি সম্পন্ন হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১। **প্লাটফর্ম পর্যায়:** এ পর্যায়ে শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ শিক্ষাক্রমটি কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিজের ধারণা, মতাদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মতামত, লক্ষ্য ইত্যাদি প্রদান করেন।

২। **ডেলিবারেসন পর্যায়:** এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হয়। সকলে নিজের মতামত/ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সংশোধন করে এবং কীভাবে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করবে সে সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছায়। এ আলোচনায় কোন নির্দিষ্ট ফর্মূলা অনুসরণ করা হয় না। তবে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সর্বোত্তম উপায়টি খুঁজে বের করা হয়।

৩। **ডিজাইন পর্যায়:** এ পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা শিক্ষাক্রমে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪.৪ : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ : লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা ও কাঠামো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়নের জন্য যে বিষয়গুলোচালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে সেগুলো হল-

- ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছিল ইতিমধ্যে ১৭টি বছর পার হয়েছে।
- ২০১০ খ্রিস্টাব্দে দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতি দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেগুলো শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভক্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

- ২০১২ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক স্তরে বতর্মানে এর প্রসারিত হয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পরিব্যপ্তী লাভ করেছ।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কাঠামোগত বিষয়ের ধারণাও পরিব্যাপ্তি ঘটেছে। যেমন- ক) নতুন বিষয় 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়', খ) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা,গ) পৌরনীতি ও নাগরিকতা, ঘ) ভূগোল ও পরিবেশ এগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত চিন্তাভাবনার নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে হবে।

ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ২০১২ সালে নির্ধারিত লক্ষ্য

ক. লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক,সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জন সম্পদ সৃষ্টি।

খ. উদ্দেশ্য

১) শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২) শিক্ষার্থীর মাধ্যে মানবিক গুণাবলি যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ,সততা,অধ্যবসায়,সহিষ্ণুতা,শৃঙ্খলা,আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রন্থিত করা।

৩) মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

৪) শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকচর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগ্রতি ও উন্নয়নে আবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৫) শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

৬) সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পরিচয় দিতে পারে।

৭) বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

৮) আধুনিক কর্মক্ষেত্রে, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

৯) শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপাশ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

১০) শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসেবে তৈরি করা।

১১) শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১২) দেশে এবং বর্হিবিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১৩) খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

১৪) শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহয়তা করা।

১৫) শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

১৬)শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি-খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

১৭) জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

১৮) সহযোগীতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বৈশিষ্ট্য

- 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' এর লক্ষ্য হচ্ছে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী, সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদে পরিণত করা।
- ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করে সবগুলো বিষয়ের শিক্ষাক্রম ডিজাইন করা হয়েছে।
- সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন কোর বিষয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল ডিজাইনে শিখনের তিনটি ক্ষেত্রের (জ্ঞানবৃত্তীয়, মনোপেশীজ এবং আবেগীয়) মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তন,দৈহিক, মানসিক এবং অধ্যাত্মিক বিকাশ ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
- শিক্ষা বছরের কর্মদিবসের সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের শিখনফল ও বিষয়বস্তু ডিজাইন করা হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর ভার এবং ক্লাশ সংখ্যা প্রাসঙ্গিকভাবে সুসামঞ্জস্য হয়েছে।
- শিক্ষার্থীকেন্দিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। গতানুগতিক মুখস্থ করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কার্যক্রমভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতির পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সহয়তা করবে।
- মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষায় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-এ চারটি দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল ধারার শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- নবম-দশম শ্রেণিতে ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের পেশা ও ক্যারিয়ার নির্বাচনে সাহায্য করবে।
- তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে এর ব্যবহারিক কার্যক্রমের সম্বনয় করা হয়েছে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে সে সকল বিষয়ের যেখানে ব্যবহারিক কাজের নির্দেশনা আছে সেখানে তাত্ত্বিক অংশের সাথে ব্যবহারিক কাজ শেষ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তত্ত্ব ও ব্যবহারিকের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাবে।
- ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই সবগুলো ধর্ম শিক্ষার বিষয়গুলোর নাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা রাখা হয়েছে।
- ব্যবসায় শিক্ষা শাখাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং বীমা বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- যুগের চাহিদা অনুসারে কিছু বিষয়বস্তু যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য , তথ্য অধিকার, অটিজম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাময়িক পরীক্ষার সংখ্যা ৩টি হতে কমিয়ে ২টি করা হয়েছে। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠকার্যক্রম পরিচালনায় ১২টি কর্মদিবস বেশি পাচ্ছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ক্লাশ পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট এবং কলেজ পর্যায়ে ক্লাশ পিরিয়ডের ব্যাপ্তি৬০ মিনিট করা হয়েছে।

বিষয় কাঠামো

ক. ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন

	সকল ধারার আবশ্যিক বিষয় (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারা)	পরীক্ষার নম্বর	সময় বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
১.	বাংলা	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
২.	ইংরেজি	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
৩.	গণিত	১০০	৪	৭০	১৪০
৪.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৫৩	১০৬
৫.	বিজ্ঞান	১০০	৪	৭০	১৪০
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**৬৫০**	**২৩**	**৪০২**	**৮০৪**
	সাধারণ শিক্ষা ধারার আবশ্যিক বিষয়				
৭.	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা:ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০	৩	৫৩	১০৬
	শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য				
৮.	কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা	৫০	২	৩৫	৭০
৯.	চারু ও কারুকলা	৫০	২	৩৫	৭০
১০.		৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**২৫০**	**৯**	**১৫৮**	**৩১৬**
	সাধারণ ধারার ঐচ্ছিক বিষয়(একটি নেওয়া যাবে)				
১১.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/আরবি/সংস্কৃত/পালি/সংগীত/নৃত্য/নাট্যকলা	১০০	২	৩৫	৭০
	সর্বমোট	**১০০০**	**৩৪**	**৫৯৫**	**১১৯০**

দ্রষ্টব্য.

- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০মিনিট ও অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট।
- শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন ৬পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪পিরিয়ড।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশ (assembly) এর মেয়াদ ১৫মিনিট এবং ৩য় পিরিয়ড পর মধ্যাহ্ন বিরতি ৪৫মিনিট
- দুই শিফটে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সব ক্ষেত্রে ৫মিনিট করে সময় কম হবে এবং মধ্যাহ্ন বিরতি ১৫ মিনিট।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর বিষয় কাঠামো

খ. নবম-দশম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর, সময় বণ্টন

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময় বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
আবশ্যিক	১.বাংলা	২০০	৫	৮০	১৬০
	২.ইংরেজি	২০০	৫	৮০	১৬০
	৩.গণিত	১০০	৪	৬৪	১২৮
	৪.ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা:(ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১০০	২	৩২	৬৪
	৫.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩২	৬৪
	৬.ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	১৬	৩২
	৭.শারীরিক শিক্ষা,স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১০০	২	৩২	৬৪
	সর্বমোট=	**৮০০**	**২১**	**৩৩৬**	**৬৭২**
শাখাভিত্তিক বিষয়					
বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮.পদার্থ বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯.রসায়ন	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১.বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৪৮	৯৬
বিজ্ঞানশাখার ঐচ্ছিকবিয়ষ (একটি নেওয়া যাবে)	১২.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ভূগোল ও পরিবেশ/চারু ও কারুকলা/ সংগীত/বেসিক ট্রেড/শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট=	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
ব্যবসায় শাখার আবশ্যিক বিষয়	১৩.ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৪.হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৫.ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৬.বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি	১৭.ভূগোলওপরিবেশ/বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান /ক্ষুদ্রনৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/চারু ও কারুকলা/সংগীত/ বেসক ট্রেড	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট=	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	১৮.বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৯.ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	২০.অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	২১.বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
মানবিক শাখার ঐচ্ছিক বিষয়(একটি নেয়া যাবে)	২২.অর্থনীতি/পৌরনীতিও নাগরিকতা/চারুও কারুকলা/কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ক্ষুদ্রনৃ-গোষ্ঠীর ভাষাও সংস্কৃতি/আরবি/সংস্কৃত/পালি/ সংগীত/বেসিক ট্রেড/শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট=	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**

গ. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় কাঠামো: সকল শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়

১.বাংলা ২.ইংরেজি ৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

শাখা	শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়	শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)
	৪. পদার্থবিজ্ঞান ৫. রসায়ন ৬. জীববিজ্ঞান	৭. (ক) জীববিজ্ঞান (খ) উচ্চতর গণিত (গ) কৃষিশিক্ষা (ঘ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (ঙ) মনোবিজ্ঞান (চ) পরিসংখ্যান (ছ) মৃত্তিকা বিজ্ঞান (ঞ) প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্রাকটিস (ঝ) ক্রীড়া
মানবিক	যে কোন ৩টি বিষয় ৪. ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. পৌরনীতি ও সুশাসন ৬. অর্থনীতি ৭. সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম ৮. ভূগোল ৯. যুক্তিবিদ্যা	১০. (ক) ইতিহাস (খ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (গ) পৌরনীতি ও সুশাসন (ঘ) অর্থনীতি (ঙ) সমাজবিজ্ঞান (চ) সমাজকর্ম (ছ) ভূগোল (জ) যুক্তিবিদ্যা (ঝ) কৃষিশিক্ষা (ঞ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (ট) মনোবিজ্ঞান (ঠ) পরিসংখ্যান (ড) চারু ও কারুকলা (ঢ) নাট্যকলা (ণ) সমরবিদ্যা (ত) লঘু সংগীত (থ) উচ্চতর গণিত (দ) আরবী/সংস্কৃত/পালি (ধ) ইসলাম শিক্ষা (ন) ক্রীড়া
ব্যবসায় শিক্ষা	৪. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫. হিসাববিজ্ঞান ৬. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা/উৎপাদান ব্যবস্থাপনা ও বিপনন	৭. (ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা (খ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন (গ) অর্থনীতি (ঘ) পরিসংখ্যান (ঙ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (চ) কৃষিশিক্ষা (ছ) ভূগোল (জ) সাচিবিদ বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা (২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত)
ইসলামের ইতিহাস	৪. ইসলাম শিক্ষা ৫. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৬. আরবি	৭.(ক) সমাজবিজ্ঞান (খ) সমাজকর্ম (গ) কৃষিশিক্ষা (ঘ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (ঙ) মনোবিজ্ঞান (চ) যুক্তিবিদ্যা (ছ) ভূগোল (জ) অর্থনীতি
গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	৪. শিশুর বিকাশ ৫. খাদ্য ও পুষ্টি ৬. গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন	৭. (ক) শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ (খ) মনোবিজ্ঞান (গ) অর্থনীতি (ঘ) সমাজবিজ্ঞান (ঙ) সমাজকর্ম (চ) ভূগোল
সংগীত	৪.লঘু সংগীত ৫.উচ্চাঙ্গ সংগীত ৬. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও সুশাসন ইতিহাস	৭. (ক) অর্থনীতি (খ) পৌরনীতি ও সুশাসন (গ) মনোবিজ্ঞান (ঘ) যুক্তিবিদ্যা (ঙ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (চ) সমাজবিজ্ঞান (ছ) সমাজকর্ম

৪.৫ : শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম

শিক্ষাক্রম যতই উত্তম হউক না কেন, বাস্তবায়নে ত্রুটির জন্য অনেক সময় তা আংশিক বা সম্পূণরূপে ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। এছাড়া শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপেক্ষা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন একটি জটিল কাজ। কারণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে হাজার হাজার স্কুল, ছাত্র, শিক্ষক, সুপারভাইজার, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক সম্পৃক্ত থাকে। তাই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সকলকে সম্পৃক্ত করে বিশদ ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুসারে বিস্তরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় যোগানের অনিয়ম হলে বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গতি বিঘ্নিত হয়। সেজন্য বাস্তবায়ন শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণ, ভৌত সুযোগ সুবিধা, জনবল, আর্থিক সংশ্লেষ নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী, বিস্তরণ পরিকল্পনা, চাকুরিকালীন ও চাকুরিপূর্ব, বিস্তরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম, গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পুনরাবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা করে দিতে হয়।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য

পরিমার্জিত বা নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম বিস্তরণের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে সেগুলোকে সবার আগে চিহ্নিত করতে হয়। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

ক) শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ জানা ও বোঝা। যেমন- একটি কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থী শুদ্ধ উচ্চারণে তা আবৃত্তি করতে পারবেন। গণিতে 'ভগ্নাংশ' অনুশীলনের পর একটি বস্তু ও তার অংশ বিশেষের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

খ) নতুন শিখন সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার কৌশল জানা, শ্রেণি পাঠদানে সেগুলো ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন, বাস্তবায়নের নীতি ও কৌশল জানা, শ্রেণি সংগঠন ও নতুন বিষয়বস্তু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করতে পারবেন।

গ) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন শিখন অগ্রগতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ঘ) নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কর্মকালীন ও কর্মপূর্ব), শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, নতুন সংযোজন, কর্ম সম্পাদনের নবতর কৌশল, নতুন পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার বিধি ইত্যাদি বলতে পারবেন।

ঙ) প্রশিক্ষণের পরে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সে অনুসারে পরবর্তীকালে নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের আওতায় সকল লক্ষ্যদলের (Target group) জন্য এক ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন ঠিক নয়এ কারণ বিভিন্ন লক্ষ্যদলের দায়িত্ব-কর্তব্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কৌশল, সাধারণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, লক্ষ্যদল ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলকে জানতে হয়। এদিক বিচার করলে শিক্ষাক্রম বিস্তরণে নিয়োজিত সকলের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসেবে নিম্নোক্তগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ সামগ্রী

- প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা
- শিক্ষক নির্দেশিকা
- শিক্ষাক্রমের কাঠোমোর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেরবিশদ পরিকল্পনা
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- মূল্যায়ন কৌশল
- অনুসারক কার্যক্রম
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক
- শিক্ষা উপকরণ
- প্রশিক্ষণ ভিডিও/সহায়ক উপকরণ ও যোগান।

লক্ষ্যদলের ধারণা

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লক্ষ্যদল সম্পৃক্ত থাকেন, দলের কে কী দায়িত্ব পালন করেন, কার সংশ্লিষ্টতা কতটুকু ও কীভাবে এ দায়িত্ব তার উপর বত্যায় এবং প্রশিক্ষণ কৌশল, ব্যাপ্তীকাল প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ লক্ষ্যদলে যাঁরা সম্পৃক্ত থাকেন তাঁরা হলেন-

১) উর্ধ্বতন শিক্ষানীতি নির্ধারক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, দাতা সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, অর্থ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, সমন্বয়কারীবৃন্দকে বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা । এ প্রশিক্ষণ হয় পরিচিতিমূলক এবং তা কেন্দ্রিয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী সংস্থার কর্মকতাগণ এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবেন। বিস্তরণ নীতি ও কৌশল, কর্মকর্তাদের করণীয় ইত্যাদি নিবন্ধ উপস্থাপনে ও আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২) জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে বিস্তরণ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা, ব্যাখ্যা, ও ব্যবহারিক কার্যাবলির ব্যবস্থা থাকে। ব্যবহারিক কার্যাবলির মধ্যে প্রদর্শনী পাঠ, অনুশীলনী পাঠদান ইত্যাদি অন্তভূর্ক্ত থাকে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকগণ এ ধরনে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন।

৩) মূখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য সামনা সামনি পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদি (আলাপ-আলোচনা, ব্যাখ্যা ও হাতে-কলমে কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় সুষ্ঠুভাবে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি একটি বিশদ প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা নিচে ছকে উপস্থাপন করা হল-

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ছক

প্রশিক্ষণ পর্যায় ও নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ কাল	মন্তব্য
প্রথমপর্যায় উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাগণের পরিচিত প্রশিক্ষণ	শিক্ষানীতিনির্ধারক, প্রশাসন, ব্যবস্থাপক,পরিকল্পনাবিদ, সমন্বয়কারী ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)	উপযুক্ত স্থান	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বিস্তরণ কর্মকর্তা	১ দিন	
দ্বিতীয় পর্যায় জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে)	উপযুক্ত বিভিন্ন স্থান	শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ	১-২ দিন	৫০ জনের বেশি দলে অংশগ্রহণ করবে না।
তৃতীয় পর্যায় মূখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ	টি.টসি/পিটিআই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুষদ সদস্য ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণ দান)	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেনারগণ	প্রশিক্ষণ সামগ্রী পরিসর ও প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে	৫০ জনের বেশি দলে অংশগ্রহণ করবে না।
চতুর্থ পর্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সমপর্যায়ের শিক্ষা	দেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ(প্রতি দরে ৫০ জনের বেশি হবে না)	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানে	মূখ্য, মাঠ, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক	সমগ্র দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ	
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ	৫০ জনের অধিক নয়	প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রে	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেনারগণ		ঐ

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নঃ চাকুরিকালীন ও চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণ

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাঃ শিক্ষাক্রম হল যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা হৃৎপিন্ড। সে কারণে যে কোন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কিংবা শিক্ষাক্রম নবায়নের কার্যক্রম সম্বন্ধে শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশদভাবে অবহিত করতে হয় তন্মধ্যে রয়েছেন-শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষক। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে যেসব কাজ করতে হয় সে বিষয়ে কার দায়িত্ব কতটুকু এবং কেমন করে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে তার সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত চারটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উন্নয়নকৃত/পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সকল ধাপ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তত করে নিয়ে সকলকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন হয়।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব এনসিটিবি ও মাউশির। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের একাডেমিক বিষয়ের সার্বিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব এনসিটিবি, আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রশিক্ষণ সামগ্রী যোগান যথাসময়ে নিশ্চিত করবে সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। অথার্ৎ মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ওপরে বর্ণিত চারটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করে। বলা যায় যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণের একাডেমিক দায়িত্ব এনসিটিবির এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মাউশির। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে বিস্তরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম শ্রেণিকক্ষে সার্থকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি বহুমূখী বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সমগ্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি চারটি পর্যায়ে সকল শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। কর্মপরিকল্পনাটি নিচের ছকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল–

চাকুরিকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	কোন কোন পর্যায়ের বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণার্থী নেওয়া হবে এবং মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণের তারিখ	মন্তব্য
প্রথম পর্যায়	মাস্টার ট্রেইনার্স ওরিয়েন্টশন	শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশষজ্ঞ, পাঠ্যপুস্তক লেখক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।	ঢাকায়	২ দিন	সমাপ্ত
দ্বিতীয় পর্যায়	কোর ট্রেইনার্স	দেশের ৬৪টি জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭টি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য ৪(২+২) জন।	দেশের বিভাগীয় ৮টি শহর অথবা অপর কোন সুবিধাজনক জেলা শহর	২ দিন	চলবে
তৃতীয় পর্যায়	ফিল্ড লেভেল ট্রেইনার্স ট্রেনিং	দেশের ৪৯৩ টি থানা মাধমিক স্তরের ২জন করে ১৭টি বিষয়ের জন্য সর্বমোট ১৬৭৬২ জন।	দেশের ৬৪ টি জেলা শহর।	২ দিন	চলবে
চতুর্থ পর্যায়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ	দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল বিষয় শিক্ষক	দেশের নানা পর্যায়ের ৪৯৩ টি কেন্দ্র	৩ দিন	চলবে

উপরে বর্ণিত কর্মপরিল্পনাকে ভিত্তি করে এনসিটিবি এবং টিকিউআই সিপিডি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।

চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণ : শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যের মাঝ পথে যখন শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন সামগ্রী প্রণয়ন সমাপ্ত হয় তখনই শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ করতে হয়। আগামীতে শিক্ষক হবেন বা চাকুরীকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পরই পেশায় যোগদান করছেন তাদেরকে প্রেষণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রশিক্ষণের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কার্যক্রম যুগপৎ শুরু করতে হয় যেন প্রাথমিক/মাধ্যমিক স্তরে পরিমার্জন ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী প্রর্বতনে চাকুরিরত ও নতুন শিক্ষকবৃন্দ পুরোপুরিভাবে অবহিত হতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মাঝ সময়ে বি.এড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন/নবায়নের কাজ শুরু করতে হয়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্তপ্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষাক্রম সম্পর্কে হুইলারের ধারণা কী ছিল?

৩. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/পরিমার্জনের কাজটি কীসের ভিত্তিতে হওয়া উচিত ?

৪. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গঠনবাদের গুরুত্ব কী?

৫. রাফ টাইলারের শিক্ষাক্রম মডেলের ভিত্তি কী?

৬. কার শিক্ষাক্রম মডেলের প্রধান প্রধান উপাদান কী কী?

৭. বৃত্তাকার মডেলের কোনটি আধুনিক এবং কেন?

৮. মাধ্যমিক স্তরের বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য কী?

৯. বাংলা ভাষা শেখার দক্ষতা কয়টি ও কি কি?

১০. প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আপনার দায়িত্ব কী?

১১. কোণ প্রশিক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ হলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে কেন?

১২. চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে কে কে যুক্ত থাকেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের ধারণাগত বিকাশ ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে একাডেমিক নীতিমালাগুলো পর্যালোচনা করুন।

৩. বর্তমানে বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন এবং এর সাথে সঙ্গতি রক্ষায় শিক্ষাক্রমে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন।

৪. রাফটাইলার ও হিলডা তাবা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলের তুলনা করুন।

৫. ইউনেস্কো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন জনপ্রিয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. ওয়াকার মডেলের স্তরগুলো বিবৃত করুন।

৭. জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

৮. নবম ও দশম শ্রেণির বিষয় কাঠামো নম্বর ও সময় বন্টনসহ উল্লেখ করুন।

৯. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে বিবেচ্য দিক সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

১০. চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণে রূপরেখা বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৫ : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

কোন দেশের উন্নয়ন,অগ্রগতি,সমৃদ্ধি নির্ভর করে মানসম্মত শিক্ষার ওপর। শিক্ষা হলো পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার। শিক্ষা পরিচালিত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাঠামো দ্বারা। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণ, পরিচালন, পরিমার্জন ইত্যাদির সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার কতগুলো সংযুক্ত ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এই ইউনিটে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান দপ্তরসমূহ, সেগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য,কার্যাবলি ইত্যাদি নিয়ে ৮টি সেশনে পাঠদানের জন্য তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণমূলকভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হলো-

- ৫.১ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো
- ৫.২ বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা : মৌলিক তথ্যসমূহ
- ৫.৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoE) ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE)
- ৫.৪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (EED) ও পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (DIA)
- ৫.৫ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (BISE)
- ৫.৬ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থপনা একাডেমি (NAEM), টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (TTC) ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (HSTTI)
- ৫.৭ বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS), জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ (NTRCA) ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC)
- ৫.৮ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC) ও শিক্ষাপ্রকল্পসমূহ

৫.১ বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামো (Educational Structure of Bangladesh)

একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন রূপায়ণে কাজ করে শিক্ষা। শিক্ষার বিস্তার ঘটে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সরকারের নীতিসমূহ ও সংস্থা দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষাখাত সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানের জন্য সুনাগরিক তৈরিতে এবং সমাজের প্রগতি আনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। দেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার একটি কাঠামো বিদ্যমান। শিক্ষার সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে কতকগুলা স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

১. প্রাথমিক স্তর
২. মাধ্যমিক স্তর
৩. উচ্চ শিক্ষা স্তর।

১. প্রাথমিক শিক্ষা স্তর: প্রাথমিক শিক্ষা স্তর আবার ২টি উপস্তরে বিভক্ত। যেমন—

ক) প্রাক-প্রাথমিক স্তর   খ) প্রাথমিক স্তর

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আলাদা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় রয়েছে।

২. মাধ্যমিক স্তর: মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনটি উপ-শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

ক) সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থা
খ) মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থ
গ) কারিগরি শিক্ষা উপব্যবস্থা

ক) সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থা: মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থা তিনটি উপস্তরে বিভক্ত। যেমন—

১. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি)
২. মাধ্যমিক স্তর (৯ম-১০ম শ্রেণি)
৩. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)

৩. উচ্চ শিক্ষা: উচ্চ শিক্ষা পরিচালিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক। বর্তমানে (২০১৭) বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি (সাধারণ ও বিশেষায়িত) মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষাস্তরের পুর্ণগঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত পুর্ণগঠিত শিক্ষাস্তর হবে নিম্নরুপ-

ক) প্রাথমিক স্তর: ১ম-৮ম শ্রেণি

খ) মাধ্যমিক স্তর: ৯ম-দ্বাদশ শ্রেণি

গ) উচ্চ শিক্ষা স্তর: এইচএসসি পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মধ্যে দিয়ে এই স্তরের পাঠ শুরু হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সরকারি সংস্থা হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া রয়েছে অন্যান্য দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। একটি ছকের সাহায্যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো।

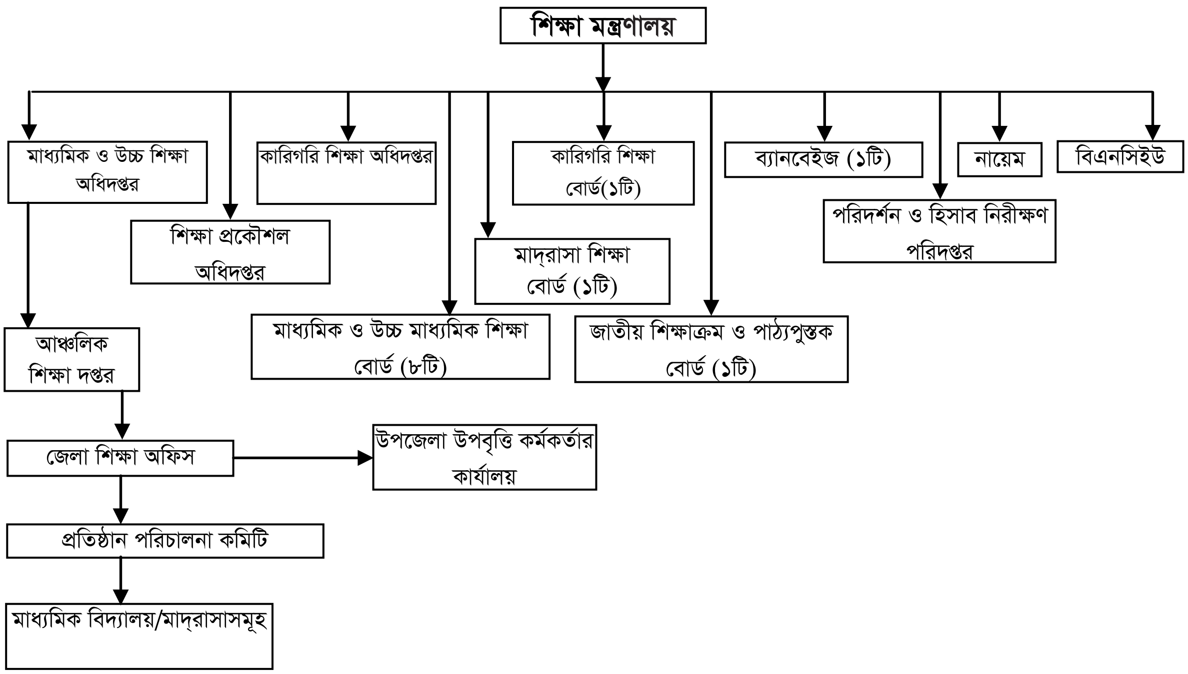

চিত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাঠামো

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ মাঠপর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর, ব্যানবেইজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যাবলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত। সরকারি নীতিনির্ধারকগণ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে থাকেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নীতির মূল কথা হলো—

১. শিক্ষা সবার জন্য।

২. কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

৩. দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা ।

৪. শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।

৫. শিক্ষাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা।

৬. নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।

১০. শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাবলি দূর করা।

১১. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য কার্যকর করা।

১২. শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন করে একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা।

১৩. মাধ্যমিক শিক্ষা যেহেতু প্রান্তিক শিক্ষা তাই এর মান বাড়ানো।

৫.২ বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা : মৌলিক তথ্যসমূহ

বাংলাদেশে শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক তথ্যের উৎস ব্যানবেইস (BANBEIS:Bangladesh Burea of Educational Information and Statistics)। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত বিভাগ (Attached Department)। ব্যানবেইজ শিক্ষাসংক্রান্ত মৌলিক উপাত্ত সরেজমিনে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে তথ্য প্রস্তুত করে। বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন, শিক্ষক সংখ্যা, নারী ও পুরুষ শিক্ষক, স্তরভিত্তিক মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা, নারী-পুরুষ অনুপাত, বছরভিত্তিক ও স্তরভিত্তিক পাসের সংখ্যা ও হার ইত্যাদি বহুবিদ বিষয়ে মৌলিক তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

ব্যানবেইজ সর্বশেষ ২০১৬ সালে 'Educational Survey 2016' পরিচালনা করে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক জরিপে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সব ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়।২০১৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষামূলক জরিপে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১, ৬৭,৪৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায়, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে যার সংখ্যা ছিল ১, ৬২,৫১২টি।

মাধ্যমিক শিক্ষার মৌলিক তথ্য (Basic Information of Secondary Education)

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২০,৪৪৯টি যার মধ্যে ৬০২টি সরকারি বিদ্যালয় যেখানে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল ১২,০১২টি। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠান প্রতি গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৪৯৮ জন, মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০.১৮ মিলিয়ন (১ কোটি ১৮ লক্ষ) যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫.৪৭ মিলিয়ন (৫৩.৭৭%) এবং নারী শিক্ষার্থীর সূচক ১.১৬%।

এ সময় শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২.৪৩ লক্ষ যাদের মধ্যে ৬২,৪৯৬ জন মহিলা শিক্ষক। ২০০৫ সালে মহিলা শিক্ষক ২০.২৮% থাকলেও ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫.৬৬%। এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (Teacher-student ratio,TSR)দাঁড়ায় ১:৪৩ এবং গড়ে প্রতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন। শিক্ষকদের মধ্যে ৭০.৬৬% ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা জুনিয়ার স্কুলে ৩২.৩০%, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭০.৬৬% এবং স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে ৬৭.১৭%।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষামূলক জরিপে দেখা গেছে, মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান ১২%, মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ৮৩% এবং বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ৫%। এ সময় নিরূপিত মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সরকারি ৬০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাদে) সমূহের (১৯,৮৪৭) মধ্যে ৯৮.২৯% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং মাত্র ১.৭১% সরকারি প্রতিষ্ঠান। জরিপে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ৭৭% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামে অবস্থিত যেখানে ৬৮% শিক্ষক কর্মরত এবং ৭১% শিক্ষার্থী গ্রামের এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে।

বিভাগভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তরণ অত্যন্ত অসম। সিলেট বিভাগে মাত্র ৫% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও ঢাকা বিভাগে রয়েছে ২৬%। একই সাথে ভর্তির হার সিলেটে ৬.৫১%, অন্যদিকে ঢাকা বিভাগে ৩১.২৮%।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষামূলক জরিপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌতসুবিধা সংবলিত আরো অনেক মৌলিক তথ্য বের হয়ে এসেছে। এ সময় দেখা গেছে গড়ে ৮৭.৯৮% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে নিম্নমাধ্যমিকে ৫৭.৩৬%, মাধ্যমিকে ৯১.৬০% এবং স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে ৯৯.০৪%।

এ সময় আরও দেখা গেছে গড়ে ৭৬.০১% বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ও ৮৪.৯৪% বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সুবিধা আছে। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ও কম্পিউটার যথাক্রমে ১৪.৭৬% ও ৩৭.৯৫%, মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে ৮৩.৪৪% ও ৯০.৬৮% এবং স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে ৯৪.৯৪% ও ৯৮.৯৫% সুবিধা রয়েছে। এ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য মতে, প্রায় ৯৩% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সরকার থেকে মাসিক যে আর্থিক সুবিধা পায় তাকে এমপিও (MPO-Monthly Pay Order) বলা হয়। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জরিপ মতে, ২৩.১১% নিম্নমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান, ৯০.৪৪% মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান এবং ৮২.৮০% স্কুল ও কলেজ এমপিও সহায়তা লাভ করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এ সময়ের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেখা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গড়ে ৬৭% প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ হার নিম্ন মাধ্যমিকে ২৬%, মাধ্যমিকে ৭২% এবং স্কুল ও কলেজপর্যায়ে ৯১%। মাত্র ৬৭% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষক রয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা থাকলেও সেখানে কোনো কম্পিউটার শিক্ষক নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষার কিছু মৌলিক তথ্য নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

Result of **Secondary School Certificate (S.S.C) Public Examination by Gender, 1990-2015**

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		পাশের সংখ্যা		পাশের হার	
	মোট	মেয়ে পরীক্ষার্থী	মোট	মেয়ে পরীক্ষার্থী	মোট	মেয়ে পরীক্ষার্থী
১৯৯০	৪৩৫৯১৮	১৪৬৫১২	১৩৮৩১৭	৪৪১২২	৩১.৭৩	৩০.১১
১৯৯১	৪৭৫২৬১	১৫৬০১২	৩০৮৬৭৬	১০১৯৮৬	৬৪.৯৫	৬৫.৩৭
১৯৯২	৫২২১৭৪	১৮৪০০২	৩২১৬৭৫	১০৪৬০০	৬১.৬	৫৬.৮৫
১৯৯৩	৬৬১৯০৮	২৩৭০৪৩	৪০৪৪০২	১৩৪৯৪৮	৬১.০৯	৫৮.৬২
১৯৯৪	৬৮৫৮৩১	২৫৮৬১২	৪৯০০৯৯	১৭৯৯২০	৭১.৪৬	৬৯.৫৭
১৯৯৫	৭৬৫১৩৫	৩০১১৪৬	৫৬০১১৪	২১৫৫৪৮	৭৩.২	৭১.৫৮
১৯৯৬	৪৬৪২৬৭	১৯৬৭৮১	১৯৭৮১১	৬৯২৩৬	৪২.৬১	৩৫.১৮
১৯৯৭	৭১৬৮৬৫	৩০৩৮২৪	৩৬৮৮০৩	১৪৯৭৮২	৫১.৪৫	৪৯.৩
১৯৯৮	৭২২৩০০	৩০৭৮৬০	৩৪৬৪৩৫	১৩৯০১৭	৪৭.৯৬	৪৫.১৬
১৯৯৯	৮৩৭২২০	৩৬২৮৭৫	৪৫৭২৫২	১৯৪৪৮৫	৫৪.৬২	৫৩.৬
২০০০	৯১৮০৪৫	৪০২৮৭৩	৩৮১৭৬২	১৬১৭৪৫	৪১.৫৮	৪০.১৫
২০০১	৭৮৬২২০	৩৩৪২৫৫	২৭৬৯০৩	১১২৮৬৮	৩৫.২২	৩৩.৭৭
২০০২	১০০৫৯৩৭	৪৪১০২৪	৪০৮৯৬৯	১৬৬৩৩৯	৪০.৬৬	৩৭.৭২
২০০৩	৯২১০২৪	৪০৯৬২৩	৩৩০৭৬২	১৩৭৬৩৬	৩৫.৯১	৩৩.৬
২০০৪	৭৫৬৩৮৭	৩৪১৫৯৪	৩৬৩২৭০	১৫৭০৫৮	৪৮.০৩	৪৫.৯৮
২০০৫	৭৫১৪২১	৩৪৭৮১৫	৩৯৪৯৯৩	১৭৩৪৬৮	৫২.৫৭	৪৯.৮৭
২০০৬	৭৮৪৮১৫	৩৬৭৯৭০	৪৬৬৭৩২	২১০৯০৯	৫৯.৪৭	৫৭.৩২
২০০৭	৭৯২১৬৫	৩৭৮৯৮১	৪৫৪৪৫৫	২০৭৪৭১	৫৭.৩৭	৫৪.৭৪
২০০৮	৭৪৩৬০৯	৩৬১৫৪৫	৫২৬৫৭৬	২৪৯১০৪	৭০.৮১	৬৮.৯
২০০৯	৭৯৭৮৯১	৩৯৩৫৯৯	৫৩৭৮৭৮	২৫৬১০৪	৬৭.৪১	৬৫.০৭
২০১০	৯১২৫৭৭	৪৫৩৭৭৯	৭১৩৫৬০	৩৪৬৪৯৪	৭৮.১৯	৭৬.৩৬
২০১১	৯৮৬৬৫০	৪৯৫৬১০	৮১০৬৬৬	৪০০০৬৫	৮২.১৬	৮০.৭২
২০১২	১০৪৮১৪৪	৫২৯৬১০	৯০৪৭৫৬	৪৫১৬১০	৮৬.৩২	৮৫.২৭
২০১৩	৯৯২৩১৩	৫০২৪১১	৮৮৫৮৯১	৪৪৫৬০৭	৮৯. ২৮	৮৮.৬৯
২০১৪	১০৮৭৮৭০	৫৫১৯৭২	১০০৮১৭৪	৫০৮৪৯৭	৯২.৬৭	৯২.১২
২০১৫	১১০৮৬৮৩	৫৬০৩২১	৯৬১৪০৫	৪৮৩৪৭০	৮৬.৭২	৮৬.২৮

(source: Educational Survey, 2016, BANBEIS)

মাধ্যমিক শিক্ষা : মাদরাসা উপ-ধারার তথ্য (Secondary Education : Information about Madrasha Sub-sector)

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদরাসা শিক্ষা একটি উপধারা।এটিও একটি বৃহৎ উপধারা। এবতেদায়িসহ এই ধারার মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩.৮৩ মিলিয়ন। সাধারণ শিক্ষা থেকে মাদরাসার ধর্মীয় ধারার শিক্ষা স্পষ্টত ভিন্ন। এই ধারাটি অব্যাহতভাবে

বর্ধিত হচ্ছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষামূলক জরিপের তথ্য মতে, এই ধারার মোট প্রতিষ্ঠান ৯,৩১৪টি যা ২০০০ সালে ছিল ৭,২৭৯টি। মাদরাসা উপ-ধারার শিক্ষাস্তর হলো-এবতেদায়ি (প্রাথমিক), দাখিল (মাধ্যমিক), আলিম (উচ্চমাধ্যমিক), ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর)।

২০১৬ সালের প্রাপ্ত তথ্য মতে, মাদরাসা উপধারার ৯,৩১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কামিল মাদরাসা ২২৪টি এবং মাত্র ৩৮৮টি সরকারি এবং অবশিষ্টগুলো বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। মোট ৯,১৩৪টি মাদরাসার মধ্যে দাখিল মাদরাসা ৭০%, আলিম ১৬%, ফাজিল ১১% এবং কামিল মাদরাসা মাত্র ২%। মাদরাসা শিক্ষায় দাখিল মাদরাসা ৬,৫৫৮টি (৭০%) যেখানে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৩,২৩,৭০৬ জন যার মধ্যে ৫৯%-এর বেশি নারী শিক্ষার্থী। মাদরাসাভিত্তিক গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০২ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ৬৬,৩৭৬ জন, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড় শিক্ষক ১২ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১: ২২।

বিভাগভিত্তিক মাদ্রাসার হারে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে মাদরাসা শতকরা ২১.২৫%, চট্টগ্রামে ১৭.৭৭%, রাজশাহীতে ১৬.৩৮%, রংপুরে ১৫.০৬%, খুলনায় ১২.৬৮%, বরিশালে ১২.৫৬% এবং সিলেট বিভাগে ৪.২৯%। সকল মাদরাসার মধ্যে গড়ে ৮৬% মাদরাসা গ্রামে এবং দাখিল মাদরাসার মধ্যে ৮৯.৯৫% মাদরাসা গ্রামে অবস্থিত।

২০১৬ সালের শিক্ষামূলক জরিপ থেকে আরও জানা যায়, মাদরাসা উপধারার শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ২৩% শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কিন্তু মহিলা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই হার ৩৩%। সকল শিক্ষকদের মধ্যে ৭৯.৯৪% শিক্ষক এমপিওভুক্ত, তবে মহিলা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ওই হার ৭২%। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ১,১৩,৩৬৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ২২,২৯৪ জন (১৯.৬৬%) শিক্ষক NTRCA-র (National Teacher Registration and Certification Authority) সনদপ্রাপ্ত।

(তথ্যসূত্র: Executive Summary, Educational Survey, 2016, BANBEIS)

৫.৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Education, MoE) ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Education, MoE)

বাংলাদেশের শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোর সবোর্চ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে শিক্ষা মন্ত্রাণালয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণ শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব। এছাড়া অন্য সিদ্ধান্তসমূহ যা আইন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত রূপরেখায় বাস্তবায়িত হবে তাও শিক্ষা মন্ত্রাণলয় কর্তৃক গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একটি পরিকল্পনা কোষ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো। এদের সহায়তায় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর, সংযুক্ত বা স্বতন্ত্র অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রাণালয় হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রশাসনিক দপ্তর। যার প্রধান কর্তাব্যক্তি হলেন শিক্ষামন্ত্রী। যাকে প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করেন ২জন সচিব, একাধিক অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সেকশন অফিসারবৃন্দ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত এবং প্রণীত নীতিমালা ও আদেশসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে এর অধীনস্থ দপ্তর,অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান,স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, জেলা, উপজেলা অফিস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো (Administrative and Organizational Structure of MoE)

শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজনৈতিক কারণে সরকার পরিবর্তিত হওয়ায় মন্ত্রীর অবস্থান অস্থায়ী বা সাময়িক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে যার প্রধান হলেন সচিব। বর্তমানে (২০১৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে ২টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

খ. কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ

প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন সচিব এবং সচিবকে সহায়তার জন্য রয়েছেন একাধিক অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামোগত অবস্থানের কারণে এর ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসন। শিক্ষার উন্নয়নের সার্বিক সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা এবং নীতিমালা গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রাণালয় এবং এগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে প্রেরিত হয়।

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরুপ

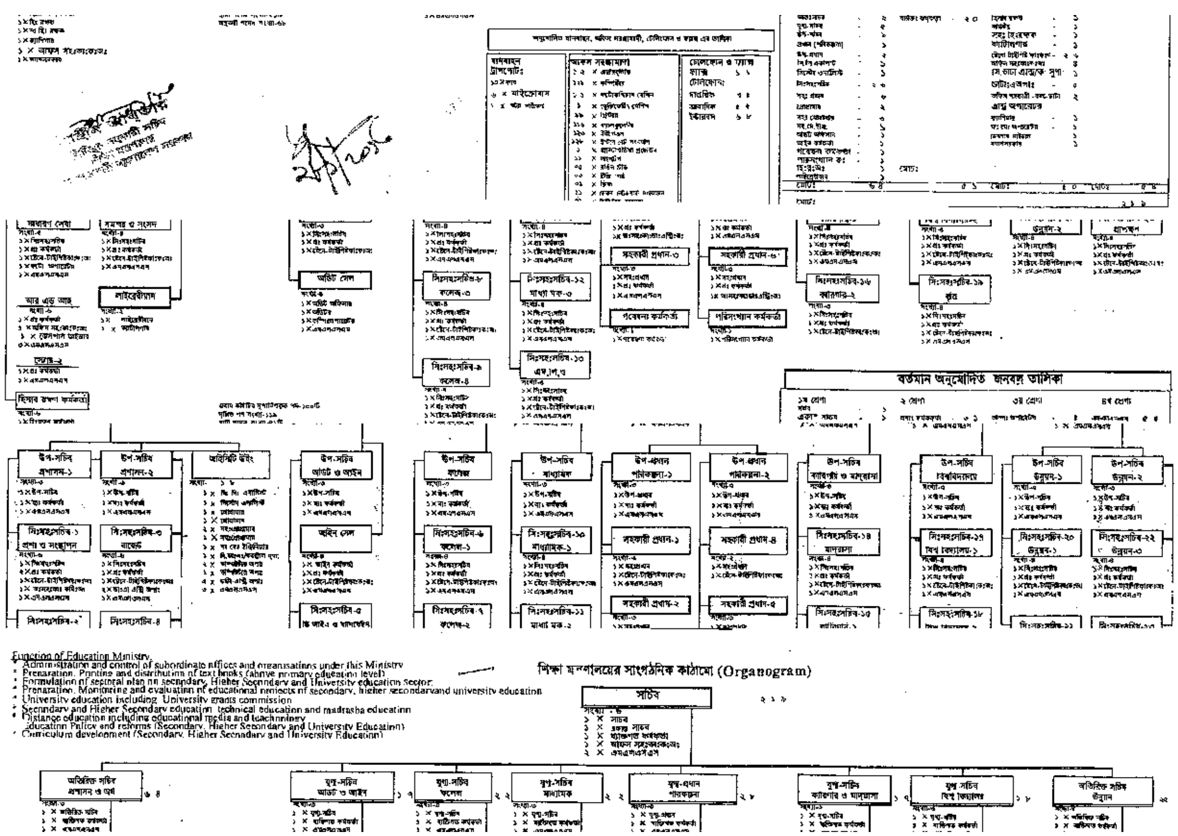

চিত্র ১: প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো*(উৎস :শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট)*

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্ব (Power and Duties of MoE)

শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক প্রশাসন ও পরিকল্পনার মৌল ক্ষমতা ও দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রাণালয় নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে-

১. জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরির ন্যূনতম শর্তাবলি নির্ধারণ;
২. শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধি প্রণয়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শকরণ;
৩. ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তি বা অবসর প্রদান;
৪. চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণ;
৫. বেতন, ভাতা প্রভৃতির স্কেল নির্ধারণ;
৬. শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
৭. শিক্ষার উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কমিশন নিয়োগ;

৮. সুনির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে সীমিত ব্যয়সাপেক্ষে শিক্ষারক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ প্রদান;
৯. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা নির্ধারণ এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন;
১০. অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
১১. জাতীয় শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন এবং বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান;
১২. জাতীয় উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান;
১৩. জাতীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Secondary and Higher Education)

শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম সংগঠন ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। তবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে অঞ্চল এবং জেলা পর্যায়ের এর প্রশাসন বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রধান ভূমিকা হল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মাউশির। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাই এই সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের বিদ্যালয় শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিরূপণ ও বন্টন, পারস্পরিক যোগাযোগ ও দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৮৫৪ সালের উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচের সুপারিশের ভিত্তিতে জনশিক্ষা পরিচালক বা ডিপিআই(Director of Public Instructor) অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অধিদপ্তরের গোড়াপত্তন। কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একে পুনর্গঠিত করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিদপ্তরের কার্যবিধি

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, সার্বিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। বর্তমানে এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ, সরকারি অনুদান বণ্টনসহ বিভিন্ন কাজ ও অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে এসে যায়। এ দপ্তরের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৩১৭টি সরকারি স্কুলসহ ১৭,৬৫৬টি স্কুল এবং ৩টি সরকারি মাদ্রাসা এবং প্রায় ৩৩৭টি সরকারি কলেজসহ ১,৯৭৫টি কলেজ রয়েছে। এর অধীনে ১৪টি সরকারি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই, ১টি এমটিটিআই পরিচালিত হয়ে আসছে।

অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

মাউশির নির্বাহী প্রধান হলেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের অধীনে এই অধিদপ্তরের পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে একজন করে পরিচালক কর্তব্যরত আছেন। যেমন-

১. কলেজ ও প্রশাসন
২. মাধ্যমিক শিক্ষা
৩. প্রশিক্ষণ
৪. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ও
৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

এছাড়া শারীরিক শিক্ষা শাখা নামে মাউশির আরেকটি শাখা রয়েছে যার প্রধান হলেন একজন উপ-পরিচালক। এর কাজের পরিধিও দিনে দিনে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে উপজেলায়ও শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করে টিপিওকে রেভিনিউভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এর অধীনে অনেকগুলো শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

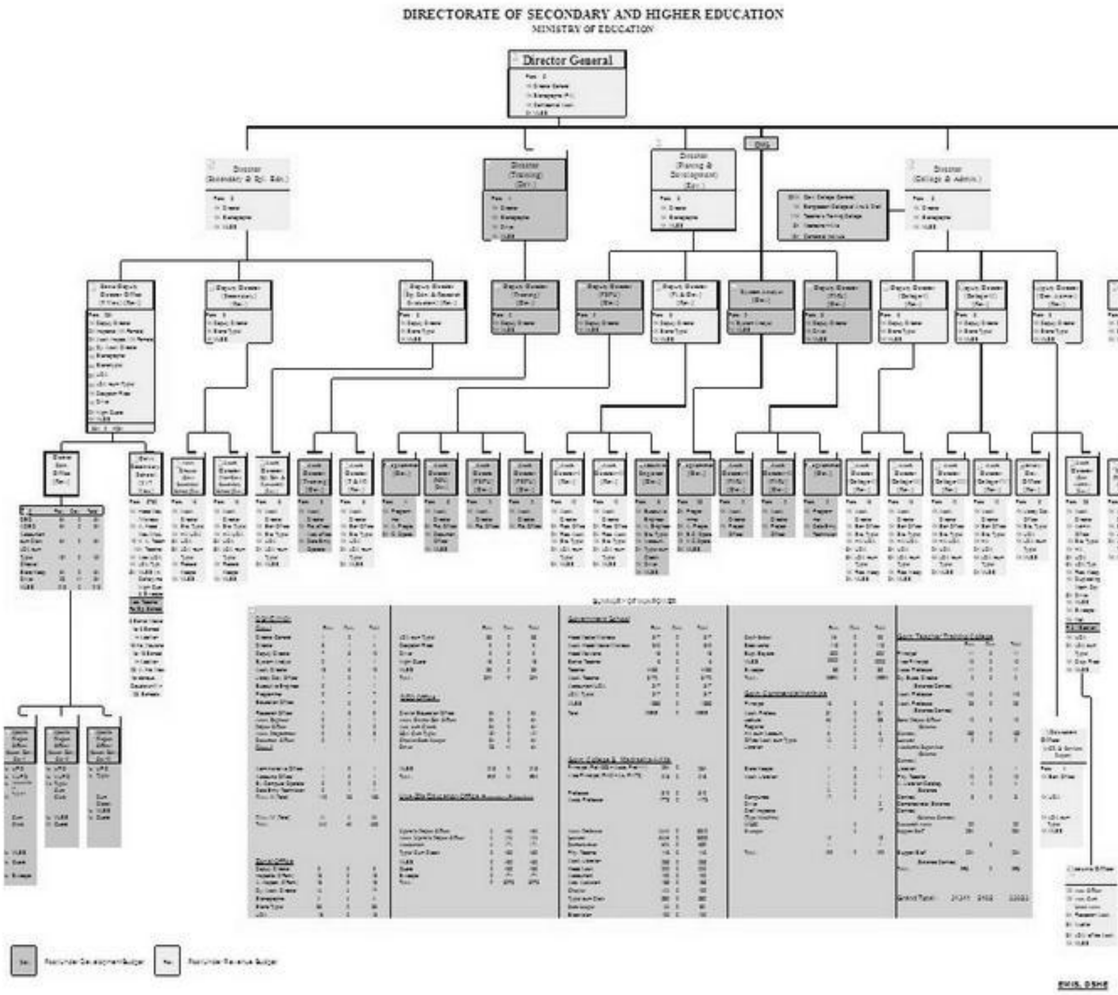

চিত্র ২: প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো *(উৎস: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েবসাইট)*

অধিদপ্তরের কার্যাবলি

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি নিচে উল্লেখ করা হল-

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
২. দেশের সাধারণ শিক্ষা বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারি নীতি প্রণয়নে সরকারকে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান;
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা;
৪. উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা;
৫. সাধারণ শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা করা;
৬. রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট তৈরি এবং হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণ;
৭. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অবসর, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশাসন এবং সংস্থাপনিক দায়িত্ব পালন করা;
৯. অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রেরণ করা;
১০. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
১২. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন কোর্স বা বিষয় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ;
১৩. অধীনস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা;
১৪. শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের নির্দেশে যে কোন সরকারি সিদ্ধান্ত এবং উন্নয়মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
১৫. সরকারি বিদ্যালয় বা কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জেলা শিক্ষা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান;
১৬. সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের অডিট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা।

মাউশিগুর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. অধিদপ্তরের ও অধীনস্থ দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন;
২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে টেকনিক্যাল বিষয়ে নীতি নির্ধারণে উপদেশ প্রদান;
৩. নির্ধারিত বাজেটের আওতায় অধিদপ্তরের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন অ্যাক্ট, অর্ডিন্যান্স, নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী এবং বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন;
৪. দপ্তরের যথাযথ পরিচালনা ও শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকা;
৫. অধীনস্থ ও গেজেটভুক্ত সব কর্মকর্তার তালিকা প্রস্তুত;
৬. মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কমকর্তা ও কর্মচারীদের নির্বাহী এবং কার্যকরী নির্দেশনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন;
৭. অধিদপ্তরের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ;
৮. অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা জারিকরণ;
৯. দপ্তরের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ;
১০. দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা এবং যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন;
১১.সব প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি অনুমোদন;
১২.কর্মধীন অফিসে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অসম্পাদিত কাজসমূহ সম্পন্নকরণের ব্যবস্থাকরণ;
১৩. প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষা (সরকারি স্কুল) জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের বদলীয়করণ;
১৪.বাংলাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া;
১৫.সরকারি বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা।

পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখাশুনা করা;
২. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৩. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ-এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য অনুমোদন;
৫. অধীনস্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন;
৬. সহকারি পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনের লেখা;
৭. অধীনস্থ অফিসারদের কর্মবণ্টন;
৮. অধিদপ্তরের অধীন অন্যান্য কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লেখা;
৯. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব পালন করা;
১০. শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত থাকা।

৫.৪ শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর (EED) এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (DIA)

শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর (Education Engineering Department, EED)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত সংবিধিবদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (Educational Engineering Directorate-EED). ১৯৬০ খ্রি. আজকের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয় ‘প্রকৌশল সেল’ নামে, যেখানে উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন একজন প্রধান প্রকৌশলী, একজন নির্বাহী প্রকৌশলীসহ কয়েকজন প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা। ১৯৮৬ খ্রি.এই প্রকৌশল সেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যাসিলিটি ডিপার্টমেন্ট (Facilities Department) নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে ২০০১ খ্রি.এর নতুন নামকরণ করা হয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (Education Engineering Department)। শিক্ষা উন্নয়ন ক্ষেত্রে EED একটি বৃহৎ ও সুপরিচিত প্রকৌশল সংস্থা।

এই সংস্থার প্রধান হচ্ছেন একজন প্রধান প্রকৌশলী এবং অফিস ঢাকার ১০, আব্দুল গণি রোডে অবস্থিত শিক্ষা ভবনের দ্বিতীয় ব্লকে। বাংলাদেশের শিক্ষা পরিসরের উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষ প্রতিষ্ঠান, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও মাদরাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর আসবাবপত্র সরবরাহ ও অন্যান্য কাজ করে। শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর শিক্ষার উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মাননিয়ন্ত্রণে কার্যকর দায়িত্বে পালন করে। এ দপ্তরে রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কর্মতৎপর প্রকৌশলী এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম ও চৌকশ অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ। শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তরের কর্মপরিসর ক্রমেই সম্প্রসারিত হচেছ।

EED-এর সাংগঠনিক কাঠামো (হেড অফিস) হলো-

প্রধান প্রকৌশলী -১ জন
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-১ জন
সুপারেন্টেন্ট প্রকৌশলী - ২ জন
উপ-পরিচালক - ১ জন
এক্সিকিউটিভ প্রকৌশলী - একাধিক
সহকারী প্রকৌশলী - একাধিক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী - একাধিক
কর্মকর্তা ও কর্মচারী - একাধিক
এছাড়াও দেশব্যাপী রয়েছে -
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর - ৩৮টি
সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর - ৬৪টি
উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর - ৪৮১টি

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বার্ষিক প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বাজেট নিয়ে দেশব্যাপী কাজ করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, ডিজাইন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতিবেদন তৈরি করে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রাম, সেমিশহর ও শহরাঞ্চলে ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন, হোস্টেল, পরীক্ষাভবন, গবেষণাগার, গ্রন্থাগারভবন, সরকারি-বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার ভবনও নির্মাণ করে।এছাড়াও শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ডের ভবন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজও করে থাকে ।

উন্নয়ন কার্যাবলি

এ অধিদপ্তরের প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়িত শিক্ষা উন্নয়ন কার্যাবলি (২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত) নিচে উল্লেখ করা হলো-

- সরকারি বিদ্যালয় বিহীন ৩১০টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তরণ শীর্ষক প্রকল্পে ২৯১টি শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ সম্পন্নকরণ।
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মডেল মাদ্রাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ ও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের ৩৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্য সম্পন্নকরণ।
- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬টি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।

- শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পর মাধ্যমে একাডেমি-কাম পরীক্ষ কেন্দ্র, ছাত্রাবাস/ছাত্রী নিবাস, বিজ্ঞান ভবন ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্তকরণ।
- তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহে একাডেমিক গার্লস গাইড এসোসিয়েশনের চার/পাঁচ/আটতলা ভিত বিশিষ্ট দ্বিতল গাইড হাউস নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ।
- মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে নির্মাণ সম্পন্ন করেছে।
- ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে বহুতল বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নিমার্ণ সম্পন্ন করেছে।
- বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন শার্ষক প্রকল্পের ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ ।
- বেসরকারি মাদরাসাসমূহের একাডেমিক ভবন নির্মান শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ১০০০টি প্রতিষ্ঠানের চারতলা ভিত বিশিষ্টএকতলা ভবনের নির্মাণ কাজ পযার্য়ক্রমে সম্পন্নকরণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রী নিবাস, প্রশাসনিক ভবন, উপাচার্যের বাসভবন, ডরমেটরি ও কর্মচারি কোয়ার্টার, কেদ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রে, পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Inspection and Audit-DIA)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন সংযুক্ত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর অন্যতম। বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাণগত মান সুনিশ্চিত কারার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি রাজধানী শহর ঢাকায় অবস্থিত।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত বিভাগ (Attached Department) হিসেবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তাদের আর্থিক ব্যয় বিধিসম্মত কিনা তা নিরীক্ষা (Audit) করা এর প্রধান কাজ। এই দপ্তরটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের কাছে Ministry Audit নামে পরিচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এটি সংযুক্ত বিভাগ বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে।

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত/বাস্তব অবস্থা যাচাই, সরকারি অনুদান ও ব্যয় বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিরীক্ষণ, শিক্ষকবৃন্দের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নিয়োগ, পদোন্নতি, আর্থিক আয়-ব্যয়,অর্থ ব্যবস্থাপনা, অনুদানের সুষ্ঠ ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রম পরিদর্শন, নিরীক্ষণ এবং কার্যকারিতা যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার যাবতীয় মান উন্নয়নের কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট এবং ট্যাক্স আদায়ের জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়। ভ্যাট এবং উৎস কর সরকারি খাতে জমা দানের জন্য উৎসাহিত এবং পরামর্শ দেয়া হয়।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হচ্ছে পরিচালক (Director)। তিনি শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। বর্তমান বেসরকারি (মাধ্যমিক পর্যায়ের) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় একটি প্রতিষ্ঠানে একবার নিরীক্ষার পর পুনরায় নিরীক্ষণ করতে ১০-১২ বছর সময় লাগে।

DIA-র কার্যাবলি

পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনে (২০০৯-২০১৩) প্রকাশিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের বিগত পাঁচ বৎসরের কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র উল্লেখ করা হল-

- সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে পরিদর্শন, নিরীক্ষা এবং প্রদত্ত প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। এতে ভূয়া ও জাল শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নিবন্ধন সনদ দ্বারা নিয়োগকৃত শিক্ষক কর্মচারী চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ২০০৯-২০১৩ সময়ে ৬৮৯১টি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা পরিদর্শন ও নিরীক্ষণকরণ হয়েছে।

- ৩৫৫টি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে তদন্ত করা হয়েছে।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অবৈধভাব গৃহীত সরকারি বেতন-ভাতাদি সরকারি কোষাগারে ফেরতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী কর্তৃক অবৈধ লেনদেন প্রবণতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক অনিয়ম কমেছে।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান এবং এর মাধ্যমে আর্থিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে-
  ক. শিক্ষকরা পাঠদানসহ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়েছেন।
  খ. শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের নজরদারি বৃদ্ধি পেয়েছে ।
  গ. এ সময়ে বিভিন্নস্তরের পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে ও অপচয় হ্রাস পেয়েছে।
- ইতিপূর্বে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় করা হতো না। বর্তমান সরকারের আমলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ টাকা সরকারি খাতে জমা দেওয়ার সুপারিশ রাখা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের নজরদারির কারণে বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঠামো বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রায় শুন্যে নেমে এসেছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং ও ভর্তি বাণিজ্য এবং পরীক্ষা ফিসহ অতিরিক্ত অর্থ আদায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে উল্লেযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং সরকারের *রূপকল্প* **২০২১** বাস্তাবায়নের জন্য মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিদর্শন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইসিটি সেল গঠনের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।
- সরকারের রূপকল্প **২০২১** এর শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করা হয়েছে।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেম জাগ্রতকরণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায়, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার, সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায়ী হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণে পরামর্শ দেওয়া হয়।
- প্রতি মাসে কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালীন কর্মশালায় অংশীজনের সাথে নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, সুশাসন, শিক্ষানীতি ইত্যাদি বিষয়ে মত বিনিময় করে থাকেন।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা যথাযথভাবে পূরণে কঠোর তদারকির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব এবং নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোকদিবসসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধসহ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা নিয়মিত পরিদর্শন, নিরীক্ষা ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রম জোরদার করতে পরিকল্পিত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৫ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (BISE)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (National Curriculum and Textbook Board -NCTB)

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান। শিক্ষার পরিকল্পনা সুপরিকল্পিত এবং সুষ্ঠু না হলে যে কোনো শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। সে কারণে যে কোনো শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করার পূর্বে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, কি পাঠদান করতে হবে, কাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি বিষয়বস্তু এবং কোন কলাকৌশল ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষা দেওয়া হবে, শিক্ষাথীদের অগ্রগতি কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনা করে নিতে হয়। শিক্ষা সম্পর্কিত এরকম একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনাই হলো শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যে সংস্থা পালন করে সেটি হলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, সংক্ষেপে NCTB। এটি মূলত একটি স্বায়ত্তশাসিত পেশাগত প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কাজ হলো প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত সকল বিষয়ের শিক্ষক্রম প্রণয়ন করা। সেই সাথে প্রণীত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, অনুমোদন ও বিতরণের দায়িত্বও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পালন করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২অক্টোবর তৎকালীন বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড(BSTB) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (NCDC) একীভূত হয়ে জাতীয় শিক্ষক্রেম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠিত হয়।

NCTB-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন,নবায়ন ও উন্নয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান NCTB -এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো-

১. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবমুখী ও জীবনধর্মী জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা;
২. প্রাথমিক হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ করা;
৩. দেশ ও জাতি গঠনে পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করা;
৪. তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করা;
৫. আত্মকর্মসংস্থান দক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষা সম্প্রসারণ করা;
৬. শিক্ষার্থীর সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা;
৭. শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন করা;
৮. শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক পদ্ধতিগত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা;
৯. মূল্যবোধ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে আদর্শ নাগরিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো;
১০.প্রজ্ঞাময় দূরদৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আদর্শ জাতি গঠনে সহায়তা করা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন চেয়ারম্যান। তিনি শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের রয়েছে তিনটি প্রধান শাখা রয়েছে। যথা-

১.শিক্ষাক্রম, ২. পাঠ্যপুস্তক ও ৩. অর্থ।

প্রতিটি শাখার প্রধান হলেন একজন সদস্য। এছাড়া বোর্ডের সার্বিক কর্মকান্ড দেখাশোনার জন্য রয়েছে প্রশাসনিক শাখা, যার প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন সচিব।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূল দায়িত্ব শিক্ষাক্রম শাখার। সাতটি উপশাখায় মাধ্যমে শিক্ষাক্রম শাখার এ দায়িত্ব পালিত হয়। উপশাখাগুলো হলো-

১) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
২) মাধ্যমিক শিক্ষা
৩) মাদ্রাসা শিক্ষা
৪) প্রাথমিক শিক্ষা
৫) কারিগরি শাখা
৬) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং
৭) গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার ব্যতীত প্রতিটি উপ-শাখায় কয়েকজন ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করেন।

NCTB-এর সাংগঠনিক কাঠামো

নিচে **NCTB-এর** সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপিত হলো-

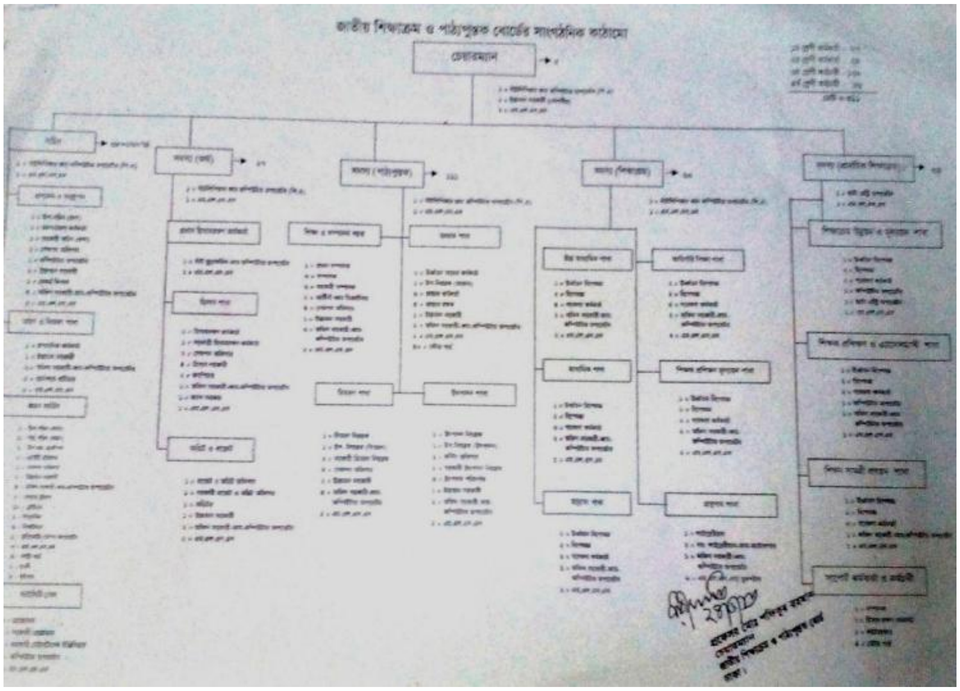

চিত্র ৩: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো, (উৎস-এনসিটিবি ওয়েবসাইট)

শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় এনসিটিবি-র উল্লেখযোগ্য অবদান (Contibution of NCTB in Curriculum Management)

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সমকালীন বিশ্বের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক চেতনা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যাবোধ ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে এর পরিমার্জন ও নবায়ন অপরিহার্য। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে সমকালীনতা প্রদানের লক্ষ্যে এনসিটিবি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন,নবায়ন ও উন্নয়নের কাজ করে চলছে।

এনসিটিবি-র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো-

১) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনসিটিবি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর আওতায় **১৯৯২** থেকে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়।

২) এনসিটিবি শিক্ষাক্রম শাখায় ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক থেকে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

৩) এনসিটিবি গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে অনুসরণের জন্য বাক্য কাঠামো নীতি নির্ধারণ করেছে।

৪) প্রাথমিকস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নবায়ন ও আধুনিকীকরণে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উদ্দেশ্যমুখী ও শিক্ষার্থীর আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

৫) শিক্ষার্থীদের স্বকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ এবং দেশের কৃষির উন্নয়নে সহায়ক জ্ঞানার্জনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে কৃষি শিক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬) শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং ক্রমধারা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের প্রতিফলিত করা হয়েছে।

৭) ইংরেজি ভাষা শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (English Language Teaching Imporvement Project, ELTIP) গ্রহণের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীদেরCommunicative English Languageশিখন-শেখানোর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে জোরদার করা হয়েছে।

৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগ,এইডস ইত্যাদি সমস্যাগুলো শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এগুলো প্রতিরোধের মনোভাব সৃষ্টির উদ্যোগ গহণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (Board of Intermediate & Secondary Education-BISE)

বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ আমলে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা এবং অবিভক্ত বাংলা ও আসামের হাই মাদ্রাসার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে ''ইস্ট বেঙ্গল পাকিস্তান সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড '' করা হয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আলাদা করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে বোর্ডের নাম পরিবর্তিত হয়ে ১৯৬২ সালে ''মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা'' নামকরণ করা হয় এবং দেশে একাধিক সমমানের শিক্ষা বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ১৯৬২ সালে রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর, ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম এবং ১৯৯৯ সালে বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর এবং সর্বশেষে ময়মনসিংহে নতুন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশে মোট ৯টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডও আছে।

শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও সংগঠনিক কাঠামো

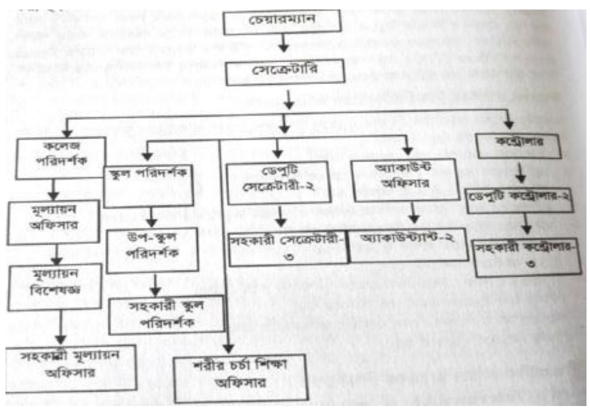

চিত্র ৪: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কাঠামো

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো নিচে উপস্থাপনা করা হলো-

বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোর ছকে লক্ষ্য করা যায় যে, বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। তার অধীনে রয়েছেন কলেজ পরিদর্শক, সেক্রেটারি ও কন্ট্রোলারবৃন্দ। এদের প্রত্যেকের অধীনেই রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোয় নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকেন।

শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যক্রম

শিক্ষা বোর্ডসমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং নিজেই এর নির্বাহী সংস্থা। ১৯৬১ সালের অর্ডিন্যন্স এর ধারা অনুযায়ী বোর্ডসমূহের মূল দায়িত্ব হলো নিজ নিজ এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও উন্নয়ন করা। এ উদ্দেশ্যে বোর্ড নিচের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে-

১. নতুন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও স্বীকৃতি নবায়ন করা।
২. ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও বিদ্যালয়/ কলেজ পরিবর্তনের জন্য নীতিমালা নির্ধারণ।
৩. বিদ্যালয় ও কলেজ পরিদর্শনের নিয়ম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পরিদর্শন করা, প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা ক্রমিক দুর্বলতা শনাক্তকরণ ও প্রতিকারের প্রস্তাব করা।
৫. নবম ও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নাম বোর্ডে নিবন্ধীকরণ।

৬. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
৭. জেএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ফল প্রকাশ করা এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নম্বরপত্র, সনদপত্র, সাময়িক সনদপত্র ইত্যাদি প্রদান কর।
৮. শিক্ষক এবং স্কুল, কলেজের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির মধ্যে কোনো প্রকার বিবাদ দেখা দিলে তার মধ্যস্থতা করা অথবা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা।
৯. বিদেশ ফেরত বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের এবং বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশে উচ্চতর শ্রেণিতে পড়ালেখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
১০. পাবলিক পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান।
১১. খেলাধুলা, স্কাউটিং ইত্যাদি সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
১২. বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রাণালয়কে মতামত বা পরামর্শ প্রদান করা।
১৩. অন্যান্য প্রশাসনিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

শিক্ষা বোর্ডসমূহের শাখাওয়ারি কার্যক্রম

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বোর্ডসমূহের কার্যক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যাপক কর্মকান্ড সম্পাদনের দায়িত্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখার ওপর অর্পিত হয়েছে। নিচে বোর্ডের শাখাওয়ারি দায়িত্ব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হলো-

প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা: দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও সংস্থাপন সম্বন্ধনীয় বিষয় তত্ত্বাবধান, যানবাহন, নিয়ন্ত্রণ, বৃত্তিপ্রদান, মুদ্রণ, সাধারণ ইস্যু, সভা আহ্বান ইত্যাদি দায়িত্ব এ শাখা পালন করে থাকে।

বিদ্যালয় শাখা: নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রদান, স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও স্বীকৃতি নবায়ন, ছাত্রছাত্রীদের নাম নিবন্ধীকরণ, বিদ্যালয় পরিদর্শন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন এবং ছাত্রছাত্রীদের নাম ও বয়স সংশোধনের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।

কলেজ শাখা: নতুন উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রদান; স্বীকৃতি প্রদান; স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও স্বীকৃতি নবায়ন; ছাত্রছাত্রীদের নাম নিবন্ধীকরণ; কলেজ পরিদর্শন; নির্বাচনি কমিটি বা গভর্নিংবডি অনুমোদন ও বাতিলকরণ।

পরীক্ষা শাখা: এসএসসি পরীক্ষা পরিচালনা; ফল প্রকাশ; নম্বরপত্র ও সনদপত্রবিতরণ; সাময়িক সনদ, দ্বিনকল, ত্রিনকল সনদ ও নম্বরপত্র ইস্যু; প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনসহ উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ।

পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন শাখা: বিদেশি ও দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান; সমতুল্যতা নির্ধারণসহ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বিতরণ; রিপোর্ট প্রণয়ন, পাঠাগারের তত্ত্বাবধান।

হিসাব শাখা: অর্থ সংগ্রহ ও বিল পরিশোধ; অডিটের ব্যবস্থা করা; হিসাবপত্র সংরক্ষণ; বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত ও শিক্ষা মন্ত্রাণালয় থেকে অনুমোদন লাভের ব্যবস্থা করা।

কম্পিউটার শাখা: এসএসসি ও এইচএসসি নম্বর প্রক্রিয়াকরণ, স্ক্যান, সম্পাদনা ও টেবুলেশনসহ পরীক্ষার ফল তৈরিকরণ, এসআইএফ/আরআইএফ ফরম সংগ্রহকরণ ও নবম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্ড মুদ্রণ; উভয় পরীক্ষার প্রবেশপত্র, টেবুলেশন শিট ও নম্বরপত্র মুদ্রণ।

কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল: এটি কেবল ঢাকা বোর্ডে রয়েছে। এই সেলের দায়িত্ব হলো কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের নাম নিবন্ধীকরণ; ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা পরিচালনা; প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন, প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ; ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নম্বর পত্র ও সনদপত্র ইস্যু করা।

শিক্ষা বোর্ডের অন্যান্য কর্মকান্ড

বোর্ডসমূহ নিয়মিত কর্মকান্ডের বাইরে প্রতি বছর বেশ কিছু একাডেমিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। পরীক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতির মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা ইত্যাদি এ সব কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৫.৬ নায়েম (NAEM), টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (TTC), উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (HSTTI)

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র এবং এটি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের কাজ করে যাচ্ছে। নায়েমের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ করা। শিক্ষাক্ষেত্রের পরিকল্পনা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নায়েম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার (EEC) প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে এটিকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ রূপান্তরিত করা হয়। এর সংক্ষিপ্ত বছরভিত্তিক ধারাবাহিক পরিবর্তন নিচের ছকে দেখানো হলো-

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৫৯	১৯৭৫	১৯৮২	১৯৯২
এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার (EEC)নামে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিখন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নায়েম তার যাত্রা শুরু করে।	EECএর কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করে এটিকে বাংলাদেশ এডুকেশন এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট (BEERI)নামে রূপান্তরিত করা হয় এবং কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রশাসকসহ শিক্ষাক্ষেত্রের সকল কর্মকর্তাদের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে NIEMRও (BEERI)একীভূত করে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ (NIEAER)নামে অভিহিত করা হয়।	NIEAER- কে আবারও পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) হিসাবে নামকরণ করা হয়। এ পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিকল্পনা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটিকে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

স্বপ্ন: ২০২১ সালের মধ্যে নায়েম-কে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

লক্ষ্য: গুণগত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করা।

নায়েমের উদ্দেশ্যসমূহ

সাধারণ উদ্দেশ্য: নায়েমের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষক উন্নয়ন ও মানসম্মত ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাথমিকোত্তর স্তরে গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে পেশাগত ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষা উপস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নয়ন কর।

নায়েমের কার্যাবলি

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে নায়েম নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে-

১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্রমবর্ধমান ও বহুমুখী চাহিদার নিরিখে নায়েমের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নতিকরণ, সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন।

২. শিক্ষা ব্যবস্থাপকদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা গবেষণার ওপর প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, আয়োজন ও সমন্বয় সাধন করা।
৩. শিক্ষা উন্নয়নসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার ও বিষয়াদির ওপর সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা
৪. শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের ওপর গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা
৫. শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন ও গবেষণাসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের জন্য তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।
৬. শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা
৭. সমজাতীয় কর্মকান্ডে নিয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করা।

নায়েমের সুযোগ-সুবিধা

শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নায়েমে রয়েছে প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। মনোমুগ্ধকর সবুজ প্রকৃতি, সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা

সংবলিত ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় ৮ একর জমির ওপর নির্মিত নায়েম কমপ্লেক্সে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করে থাকে।

১. **শ্রেণিকক্ষ, সভাকক্ষ ও ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব:** নায়েমে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ও সুসজ্জিত দুটি অডিটোরিয়াম, অনেকগুলো শ্রেণিকক্ষ যা মাল্টিমিডিয়া ও স্মার্ট বোর্ড দ্বারা সংযুক্ত এবং দুটি কনফারেন্স রুম রয়েছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে আধুনিক ও সুসজ্জিত দুটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব।
২. **গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র:** নায়েমে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার যেখানে পাওয়া যায় বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল ও দেশি-বিদেশি অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ। এটি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে থাকে। এই গ্রন্থাগারের একটি অংশ তথ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. **আইসিটি সেল:** নায়েমের একটি সুসজ্জিত আইসিটি সেল রয়েছে। আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রতিদিনের দাপ্তরিক কাজে এবং চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়।এই প্রতিষ্ঠানের আরো একটি লক্ষ্য হচ্ছে কম্পিউটার ব্যবহারের ওপর টেকসই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীর পেশাগত উন্নয়ন সাধন করা। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে নায়েমের আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেলের আওতায় ৩টি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবে ২৫টি কম্পিউটার আছে। কম্পিউটার ল্যাবগুলোতে মাধ্যমিক ও কলেজপর্যায়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া অন্যান্য কোর্সেরও অধিবেশন পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য ও সব ডাটাবেজ সঠিকভাবে এই সেলে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। নায়েমের রয়েছে একটি ওয়েবসাইট, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ওয়াই-ফাই এবং ৩০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ।
৪. **আবাসন ব্যবস্থা:** যেহেতু অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিই আবাসিক, সেহেতু নায়েম নারী ও পুরুষ উভয় প্রকার প্রশিক্ষণার্থীর জন্য হোস্টেল সুবিধা প্রদান করে থাকে। এখানে রয়েছে ৪১৫ সিট বিশিষ্ট ৫টি হোস্টেল ভবন। এছাড়াও এখানে মহাপরিচালকের বাসভবন, অনুষদবৃন্দের পরিবারসহ বসবাসের জন্য দুটি এবং কর্মচারীদের পরিবারসহ বসবাসের জন্য আরো দুটিসহ মোট ৪টি আবাসিক ভবন রয়েছে। এই কমপ্লেক্সের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ।
৫. **ক্যাফেটেরিয়া:** নায়েমের দুটি ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে। এর মধ্যে একটি বুনিয়াদি ও অন্যান্য কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এবং অন্যটি নায়েমের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জন্য। এই ক্যাফেটেরিয়া দুটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নিয়মিত নাস্তা এবং দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে থাকে।
৬. **স্বাস্থ্যসেবা:** নায়েমে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। ডাক্তারের জন্য একটি চেম্বার ও একটি ডিসপেনসারি নিয়ে এই কেন্দ্র গঠিত। একজন মেডিকেল অফিসার এবং একজন মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট দ্বারা এই কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণার্থী ও নায়েমের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ এখান থেকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ পেয়ে থাকেন।
৭. **জিমনেসিয়াম:** নায়েমে একটি অত্যাধুনিক জিমনেসিয়াম রয়েছে। বুনিয়াদি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত শারীরিক শিক্ষার পাশাপাশি অন্য কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা জিমনেসিয়াম ব্যবহার করে।

নায়েমের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি

১. **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ:** পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ নায়েমের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যসমূহের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নকশা প্রণয়ন করে। এ বিভাগ একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য পরিকল্পিত সার্বিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসংবলিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন করে। একাডেমি আইসিটি সেল এ বিভাগে সংযুক্ত।

২. **প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিভাগ:** নায়েমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নায়েম বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম এর নকশা প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিভাগের মূল দায়িত্ব। এ বিভাগের অধীনস্থ সদস্যগণ সেমিনার, ওয়ার্কশপ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি, কোর্সরিপোর্ট তৈরি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণসংক্রান্ত নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করতে প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা করে থাকেন।নায়েম এসএসসিএম, এসিইএম, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি কোর্স, আইসিটি কোর্স, শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোর্স, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স, গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কোর্স ইত্যাদি কোর্সের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রকাশ করে থাকে।

   এছাড়াও এই বিভাগ বিভিন্ন কোর্সের বক্তা মূল্যায়নের কাজ করে থাকে। নায়েম ২৩ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে- এসএসসিইএম, এসিইএম, বুনিয়াদি কোর্স, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি কোর্স, শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, আইসিটি কোর্স, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স ইত্যাদি।

৩. **প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ:** প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ নায়েম- এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও এ বিভাগ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন, এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সহায়তা প্রদান করে। হিসাব-নিকাশ রাখা ও বাজেট তৈরি করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। এই বিভাগ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষাসমূহ সম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ নায়েমের অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত কাজ এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যাবলি তদারকি করে থাকে। প্রশিক্ষণসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করাও এ বিভাগের একটি নিয়মিত কাজ।

৪. **গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগ:** গবেষণা পরিচালন, ফলোআপ ও কেসস্টাডি করতে গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগ নিবেদিত। প্রতি বছর এ বিভাগ নায়েম অনুষদবৃন্দ ও অন্যান্য সংস্থার গবেষকদের নিকট থেকে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করে থাকে। নায়েম কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক বিভিন্ন কার্যাবলির সারসংক্ষেপসহ নায়েম নিউজ লেটার, ত্রৈমাসিক প্রকাশনা, নায়েম জার্নাল, নায়েমের অর্ধবার্ষিকী প্রকাশনা এবং বার্ষিক রিপোর্টপ্রকাশনার জন্য এই বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ বিভাগ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর পুস্তক প্রকাশের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (Teacher's Training College, TTC)

টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ (Professional Training) প্রদান করে থাকে। ফরাসি চিন্তাবিদ **ডি লা সাল্লে** (De La Salle, 1651-1719) শিক্ষক প্রশিক্ষণের সূচনা করেন (বাংলাপিডিয়া)। পরবর্তীতে জোহান হেনরিক পেস্তালোৎজী (১৭৮৬-১৮২৭) ইউরোপ জুড়ে এর প্রসার ঘটান। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়াম শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুপিরিয়র নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে, এবং ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে নেদারল্যান্ডে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।

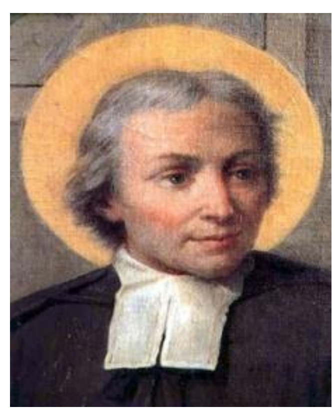

চিত্র ৫: জন ব্যাপটিস্ট ডি লা সাল্লে (১৬৫১-১৭১৯)

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের এডমস্ রিপোর্টের ৩য় খন্ডে নরমাল স্কুলপ্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উডের

ডেসপ্যাচে উপমহাদেশে প্রথম শিক্ষা প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একটি নরমাল স্কুল (Normal School) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লায় ও ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে আরো ২টি নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে হান্টার কমিশন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুপারিশ করেন যার মেয়াদ হবে ১ বছর। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ডেভিড হেয়ার David Hare)কলেজ ও ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আরমানিটেলায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা-র প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মি. ইভান ই.বিস। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আরমানিটোলা থেকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা নিউ মার্কেট থানাধীন মিরপুর রোডের বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩ ধরনের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রয়েছে। যথা-

১. সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

২. বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

৩. মাদ্রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট

১. সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজঃ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের তথ্যমতে বাংলাদেশে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ১৪টি। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ের অধীন নিম্নোক্ত কোর্সসমূহ অফার করা হয়।

কোর্সের নাম	**মেয়াদ**	**ভর্তি যোগ্যতা**
ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বি.এড)	১ বছর ২ সেমিস্টার	ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি
মাস্টার অব এডুকেশন (এম. এড)	১ বছর	ন্যূনতম স্নাতক ও বি.এড
ব্যাচেলর অব এডুকেশন (অনার্স)	৪ বছর ৮ সেমিস্টার	এইচএসসি

উল্লিখিত নিয়মিত কোর্স ছাড়াও সরকারি টিচার্সট্রেনিং কলেজসমূহে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যথা-

TQI-II SEPপ্রকল্প

- ২১ দিনব্যাপি বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক সিপিডি প্রশিক্ষণ।
- ১৪ দিনব্যাপি বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজ শিক্ষকদের ICT in Digital Content Development প্রশিক্ষণ।
- ৩ দিনব্যাপি কম্পিউটার হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ট্রাবল শুটিং প্রশিক্ষণ।
- ৫ দিনব্যাপি বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজ শিক্ষকদের Refreshers Cousse in ICT প্রশিক্ষণ।
- ৩৫ দিনব্যাপি ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠানদের প্রশিক্ষণ।

SEQAEPপ্রকল্প

- দিনব্যাপী ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ACT (Additional Classroom Teacher) †দর প্রশিক্ষণ।

DSHE

- ১০দিনব্যাপী LSBE (Life Skills Based Education) প্রশিক্ষণ।
- দিনব্যাপী সরকারি কলেজ শিক্ষকদের ICT in Digital Content Development প্রশিক্ষণ।
- ১০ দিনব্যাপি অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- জেনারেশন ব্রেকথ্রু বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ১৫০০ কলেজ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশিক্ষণ

NCTB/ SESIP

- ৬ দিনব্যাপি এলএসবিই প্রশিক্ষণ
- সৃজনশীল প্রশ্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ৬ কারিকুলাম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

সরকারি টিচার্স ট্রেনিংকলেজসমূহ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বি.এড ও এম.এড কোর্সের টিউটোরিয়াল সেন্টার হিসেবেও কাজ করে।

বাংলাদেশে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা মোট ১৪টি। নিচে এগুলোর নাম ও অবস্থান তুলে ধরা হলো-

ক্রমিক নং	কলেজের নাম	স্থাপন কাল	অবস্থান	ই- মেইল ও ফোন
১.	সরকারি টিচার্স কলেজ ,ঢাকা।	১৯০৯	নিউমার্কেট, ঢাকা	dhakattc@gmail.com ০২- ৮৬১৩৪৬৭,০২- ৯৬৭২১১০
২.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ।	১৯৪৮	রাজবাড়ি, ময়মনসিংহ	ttccmym@g mail.com 041-66737
৩.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা), ময়মনসিংহ	১৯৫২	রাজবাড়ি ময়মনসিংহ	ttw-my@yahoo.com 091-61346
৪.	সরকারি টিচার্সট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম	১৯৫৬	চকবাজার চট্টগ্রাম	gttcctg@yahoo.com ০৩১-৬১৩২১৭
৫.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা।	১৯৬২	কোটবাড়ি, কুমিল্লা	comilla-ttc@yahoo ০৮১-৭৬০৬৩
৬.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফেনী।	১৯৭৬	পলেটেকনিক মোড়,ফেনী	ttcollegefeni@yahoo.com ০৩৩-৬২৬৪২
৭.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যশোর।	১৯৬৩	খোপ, যশোর	ttcjessore@ gmail.com ০৪২১-৬৬৪৬১
৮.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা।	১৯৭০	ফুলবাড়ি গেট, খুলনা	ttckhul@yahoo.com ০৪১-৭৭৪৫৫১
৯.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী।	১৯৫৬	পাশারীপাড়া, রাজশাহী	ttcrajshahi@yahoo.com ০৭২১-৭২২১৮৮
১০.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর।	১৯৭৬	লালকুঠি মোড়, রংপুর	rangpur tc98@gamil.com ০৫২১-৬২০৪১
১১.	শহীদ আব্দুর সেরনিয়াবাদ সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বরিশাল।	১৯৯৯	কাশিপুর বরিশাল	Priscipattcbarisal @yahoo. com, ০৪৩১-২১৭৩২৫৪
১২.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফরিদপুর।	২০০৩	লালের মোড়, ফরিদপুর	ttcfarid@hotmail.com ০৬৩১-৬৬৩০৩
১৩.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সিলেট।	২০০৩	টিবিগেট সিলেট	ttcsyltco@gmail.com ০৮২১- ৭২১৩৪৪
১৪.	সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পাবনা।	২০০৩	কাশিনাথপুর, পাবনা	ttcpabna@yahoo.com ৭৩১ - ৬৫৩২৯

৩. বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

সময়ের দাবীতে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে এসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বি.এড কোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত খান বাহাদুর অহসানউল্লাহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬ সালের বি.এড পরীক্ষার তালিকা অনুযায়ী বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ৭৫/৭৬টি।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Higher Secondary Teachers Training Institute, HSTTI)

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য এ স্তরের শিক্ষকদের যথার্থ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (Higher Secondary Education Development Project)-এর মাধ্যমে এডিবি (Asian Development Bank),ইউএনডিপি (United Nation Development Program)ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশের পাঁচটি শহরে ৫টি HSTTI প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৫ সাল এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে যা বর্তমানেও চলছে। HSTTI প্রতিষ্ঠিত করার পর প্রকল্পের মাধ্যমে সেখানে সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক এবং পরিচালকসহ অন্যন্য পদ সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নির্বাহী আদেশে HSTTI এর যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এর প্রশিক্ষণ শাখার অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের জন্য নায়েমে বুনিযাদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কার্যকরী কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা শহরের মনোরম পরিবেশে পাঁচটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠার পর হতে সারা বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক এবং প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলছে। এর ফলে দেশের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষায় শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন হয়েছে,এবং শ্রেণি পঠন ও পাঠনে তার প্রতিফলন পড়েছে।

HSTTI এর Vision: To contribute the teacher’s individual development of knowledge, attitude and skills and to face the 21st century challenges for the development of the country.

HSTTI এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goals & Objectives)

- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।
- অধ্যক্ষদের (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ।

HSTTI-এর সংখ্যা ও অবস্থান

বাংলাদেশে মোট ৫টি HSTTI রয়েছে। এগুলোর নাম ও অবস্থান নিম্নে দেয়া হলো-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
১.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	টিটি কলেজ ক্যাম্পাস, ময়মনসিংহ।
২.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	টিটি কলেজ ক্যাম্পাস, রাজশাহী।
৩.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	টিটি কলেজ ক্যাম্পাস, খুলনা।
৪.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	টিটি কলেজ ক্যাম্পাস, বরিশাল।
৫.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	টিটি কলেজ ক্যাম্পাস, কুমিল্লা।

HSTTI-এর অর্গানোগ্রাম

HSTTI এর নির্বাহী প্রধান একজন পরিচালক (Director), যিনি শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। HSTTI-এর অর্গানোগ্রাম দেখানো হলো-

পরিচালক-১ জন

অতিরিক্ত পরিচালক- ১ জন

উপ-পরিচালক - ২ জন

সহকারী পরিচালক - ৪ জন

সহকারী প্রোগ্রামার - ১ জন

নন গেজেটেড কর্মচারী - ৩০ জন

HSTTI-এর কার্যাবলি

HSTTI-এর মিশন হলো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিখন-শেখানোরপ্রক্রিয়ার মাধ্যমের উন্নয়ন, প্রতিফলন অনুশীলন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার গতি আনতে সহায়তা করা। এছাড়াও মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা, আইসিটি লিটারেসির বুনিয়াদী প্রশিক্ষণও এর আওতাভুক্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়নে HSTTI তার অবদান রেখে চলেছে।

HSTTI-এর কোর্সসমূহ

প্রধান কোর্সসমূহ

১. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স;
২. কলেজ অধ্যক্ষদের জন্য প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কোর্স;
৩. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স;
৪. প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
৫. সুপারদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
৬. অধ্যক্ষগণের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
৭. উপাধ্যক্ষগণের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
৮. সহকারী প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
৯. সহকারী সুপারদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
১০. DSEO দের অর্থ ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স;
১১. DSEO দের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. মাধ্যমিক স্তরের জন্য ICT প্রশিক্ষণ কোর্স;
২. সরকারি কলেজ শিক্ষকদের জন্য অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স;
৩. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক CPD প্রশিক্ষণ;
৪. সহকারী শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ;
৫. সহকারী শিক্ষক (গণিত) প্রশিক্ষণ;
৬. সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) প্রশিক্ষণ;
৭. সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) প্রশিক্ষণ;
৮. প্রভাষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ;
৯. সহকারী অধ্যাপকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ;
১০. সহযোগী অধ্যাপকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ;
১১. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কোর্স;
১২. ভবিষ্যৎ প্রধানদের জন্য ৩৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স।

HSTTI এর ভৌত ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি

প্রতিটিHSTTI তে রয়েছে-

- তিনতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন- ১টি
- চারতলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন-১টি
- দোতলা বিশিষ্ট রেস্টহাউজ- ১টি
- দোতলা বিশিষ্ট পরিচালকের বাসভবন- ১টি
- হোস্টেল সুপারের একতলা ভবন- ১টি

প্রশিক্ষণ সুবিধাদি

- আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধাসম্বলিত প্রশিক্ষণ কক্ষ
- সুসজ্জিত সম্মেলন কক্ষ
- আইসিটিসমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব
- অডিও ভিজ্যুয়াল ল্যাবরেটরি
- বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

প্রশিক্ষণ পরিচালনার পদ্ধতি

- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক ও প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন;
- শিক্ষাবিজ্ঞান ও বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে;
- তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে চেকলিস্ট ব্যবহার করা;
- সিমুলেশনের জন্য নিজ নিজ বিষয় থেকে নির্ধারিত বিষয়বস্তু প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে আগাম বন্টন করা হয়, যাতে তাঁরা প্র্যাকটিস ক্লাসের জন্য তৈরি হতে পারে।

৫.৭ ব্যানবেইজ(BANBEIS), জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA), সরকারি কর্মকমিশন (PSC)

ব্যানবেইজ(BANBEIS)

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা সম্প্রসারণ, উন্নয়ন এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সাথে সাথে শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় শিক্ষামূলক তথ্যাদি সংগ্রহ, গ্রন্থনা, প্রকাশনা এবং সরক্ষণের জন্যই স্বাধীনতার পরবর্তীতে ১৯৭৬- ১৯৭৭ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics-BANBEIS)। এটি বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নের এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনবল কাঠামো হতে অর্থ সম্পদের যাবতীয় তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ, গ্রন্থনা এবং প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ) ঢাকার নীলক্ষেত, পলাশী মোড়ে অবস্থিত। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমেই বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক, জনবল, শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও শিক্ষাকার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করা হয়। এটি শুধু মাত্র সারাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহই করে না বরং তা প্রকাশ এবং সংরক্ষণ করে যা সংশ্লিষ্টদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োগ হয়।

ব্যানবেইজ-এর পটভূমি (Background of BANBEIS)

ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গদেশে ১৯৩১ খ্রি. Bengal Education Board সর্বপ্রথম শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন অফিসারগণের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং শিক্ষানীতির তথ্যাদি সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করত। তারপর দেশ বিভাগের ১৯৪৭ সালে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এদেশের জনশিক্ষা পরিদপ্তর। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনাময় কর্মসূচি গৃহীত হয়। ফলে শিক্ষামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যানের সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং সরকারকে প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি আলাদা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

স্বাধীনতার মহানস্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশনায় গঠিত ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশনের ১৯৭৪ সালে প্রণীত সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশে পৃথক একটি শিক্ষা তথ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো (ব্যানবেইজ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে একজন পরিচালকের অধীনে ২জন বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে কম্পিউটার বিভাগযুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়।

সৃষ্টি লগ্ন হতেই এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের শিক্ষাতথ্য, সংগ্রহ, শিক্ষাতথ্য বিনির্মান, শিক্ষাতথ্য সরবরাহ এবং শিক্ষা তথ্যের প্রবাহ সংকলন, শিক্ষাতথ্য চার্ট, রিপোর্ট এবং এক নজরে বাংলাদেশের শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশসহ সরকারকে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রদান করে আসছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ভিশন: বিশ্বমানের শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বিনির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।

মিশন: মানসম্পন্ন শিক্ষা পরিসংখ্যান বিনির্মাণ, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, আইসিটি প্রশিক্ষণ, জাতীয় উন্নয়নে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।

ব্যানবেইজএর উদ্দেশ্য (Objective of BANBEIS)

বাংলাদেশে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো এদেশের শিক্ষার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে সরকারকে সার্বিকভাবে সহায়তা করে। কাজেই সৃষ্টিলগ্ন হতেই ব্যানবেইজএদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষাস্তরের যাবতীয় তথ্যগত পরিসংখ্যান জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করে জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নিচে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা হলো-

- ব্যানবেইজ শিক্ষা জরিপের মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে গ্রন্থনা ও প্রচার করে।
- শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াদির তথ্য সংগ্রহ জাতীয় ডকুমেনটেশন সেন্টারে প্রেরণ করে।
- বিভিন্ন জাতীয়,আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকাশনার বিনিময় করা।
- প্রয়োজনের তাগিদে ব্যানবেইজ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরিতে সরকারকে সহায়তা করে।
- শিক্ষামূলক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের তথ্যাদি সরবরাহ করে।
- অবসর গ্রহণকারী শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।
- শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য জরিপের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকগণের কার্য সচেতনতা বাড়িয়ে তোলে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মতো ব্যানবেইজ সংরক্ষিত ডাটাবেজ হাল নাগাদ করে।
- যাবতীয় তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা এবং শিক্ষামূলক গবেষণা কার্যে সহায়তা করা।
- প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্যাদির সংযোগ রক্ষা করে সরকারকে সরবরাহ করে।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objective)

সাধারণ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (মানবসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ)

- মানসম্পন্ন শিক্ষা পরিসংখ্যান বিনির্মাণ-এর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থপনা শক্তিশালীকরণ।
- উপজেলা আইটিসটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCE) স্থাপনের মাধ্যমে সারাদেশে ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি।
- ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন অটোমেশন এর মাধ্যমে ই-রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

ব্যানবেইজ-এর প্রশাসনিক কাঠামো(Structure of BANBEIS)

ব্যানবেইজনামক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় রয়েছেন একজন পরিচালক। তাকে সহযোগিতা করেন বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যানবিদ, সিস্টেম এনালিস্ট, ডকুমেন্টেনবিদ, গ্রন্থাগারিক এবং আরো অন্যান্য অধঃস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। নিচে ছক আকারে ব্যানবেইজ এর প্রশাসনিক কাঠামো উল্লেখ করা হলো-

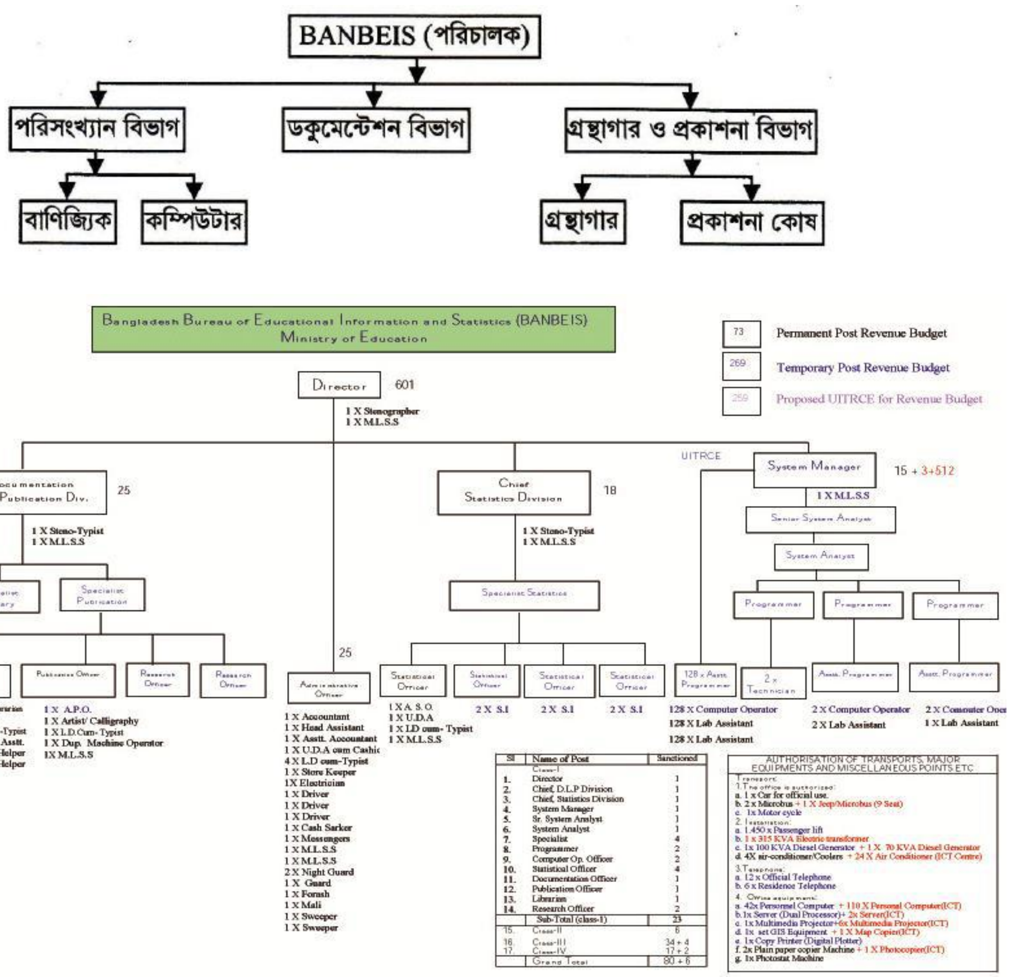

চিত্র-৬ :ব্যানবেইজ এর প্রশাসনিক কাঠামো(উৎস: ব্যানবেইজ ওয়েবসাইট)

ব্যানবেইজ -এর ভূমিকা (Role of BANBEIS)

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে ব্যানবেইজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে এবং দেশের যাবতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করছে। জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নে ব্যানবেইজ -এর ভূমিকা নিচে উল্লেখ করা হলো-

- ব্যানবেইজ শিক্ষা জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পরিসখ্যান সংগ্রহ,গ্রন্থনা এবং প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে।
- এটি বাংলাদেশে UNESCO-এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের মাসিক পে-অর্ডার (Monthly Pay Order-MPO) কম্পিউটারের মাধমে সংরক্ষণ করে এবং সরকারকে প্রয়োজনমত সরবরাহ করে।
- বেসরকারি কলেজ,মাদ্রাসা ও বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষকগণের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদানে সহায়তা করে।

- ব্যানবেইজ সময়ান্তে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ কার্য সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রদান করে।
- সরকারকে সময় মতো শিক্ষার উন্নয়নে নির্ভুল তথ্যাদি প্রদান করে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে Management of Information system-MIS এর এপেক্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।
- সময়মতো শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য পুস্তিকা, বুলেটিন, স্মরণিকা, সাময়িকী এবং গবেষণাপত্র প্রকাশ করে শিক্ষার দূর্বল দিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাপারে সরকারকে বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়।
- ব্যানবেইজ এর মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদির ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়।
- সরকারকে শিক্ষা সংক্রান্ত জরুরি তথ্যাদি সরবরাহ করে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্বল দিক সনাক্ত করে উন্নয়নের পরামর্শ দেয়।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সুযোগ তৈরি করে।
- শিক্ষকদের প্রোফাইল প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও গবেষণা কাজে সহায়তা করা।

কার্যাবলি (Function of BANBEIS)

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত On line জরিপ পরিচালনা, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং সব সুবিধাভোগী (Stakeholder) সংস্থাসমূহে বিতরণ।
২. ব্যানবেইজে স্থাপিত শিক্ষা সেক্টরের জাতীয় ডেটা ওয়্যারহাউসে Institution Profile, Teacher Profile তৈরি এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকরণ।
৩. শিক্ষা সেক্টরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কার্যক্রম পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে আসার জন্য আধুনিক Education GIS পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সরবরাহ।
৪. ব্যানবেইজ-এর বিশেষায়িত লাইব্রেরিকে অটোমেশন করে ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিচালনা এবং শিক্ষার জাতীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রকে ই-বুক পদ্ধতির আওতায় সবার প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫. ব্যানবেইজে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাব-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার এবং আইসিটি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রতিটি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা।

ব্যানবেইজ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (Functions of BANBEIS)

শিক্ষার উন্নয়নে ব্যানবেইজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পন্ন করছে। যেমন-

- জরিপ কার্যক্রম: ২০০৯ সন থেকে ব্যানবেইজ নিয়মিত ভাবে প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত মোট ৬টি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বার্ষিক জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কেপিআই (Key Performance Indicators) তৈরির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহের সঠিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০১০ খ্রি. দেশের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জরিপের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিকোত্তর স্তরের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন এবং ডাটাবেজ তৈরি করা হয়। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তার টিকিউআই-২ প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের একটি ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্যানবেইজ দ্বি-বার্ষিক জাতীয় শিক্ষক শুমারি ২০১৩ পরিচালনা করেছে। এর মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের ৩,১২,৪৭৯ জন শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।
- জিআইএস কার্যক্রম: শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত সহজতর করার লক্ষ্যে ব্যানবেইজদেশের সকল প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডুকেশন জিআইএস বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ খ্রি. হতে ব্যানবেইজ জিপিএস ডিভাইসের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক তথ্য নির্ণয় করে ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করেছে। এডুকেশন জিআইএসের মাধ্যমে ব্যানবেইজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা নির্ধারণ, একাডেমিক স্বীকৃতি ও অনুমতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহাযতা করছে।

- গবেষণা কার্যক্রম: শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যানবেইস বিগত ৫ বছরে প্রায় ২০টি গবেষণা করেছে। ব্যানবেইজকর্তৃক পরিচালিক উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যাক্রম হলো-

  Using Qualitative Research to Enhance Understanding of Madrasah Sub sector,

  Study on the Education Status of Children in Selected Slum Areas-2010,

  Study on Teaching-Learning Environment in Secondary Schools: students' Perspectives 2010
- লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন অটোমেশন: ব্যানবেইজ লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে রক্ষিত সকল পুস্তক ও ডকুমেন্ট অটোমেশন করা হয়েছে যার মাধ্যমে বর্তমানে অনলাইনে লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের ক্যাটালগ বিশ্বের যে কোন প্রাপ্ত থেকে অনুসন্ধান করা যায়।
- ই-বুক সেন্টার: ব্যানবেইজ ডকুমেন্টশন সেন্টারকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ই-বুক সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখন অনলইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন সেন্টারে রক্ষিত ডকুমেন্টেগুলো ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। নিজস্ব প্রকাশনাসহ পাঁচ শতাধিক পুস্তকের ই-বুক প্রস্তুত করে ব্যানবেইজ ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।
- ডিজিটাল লাইব্রেরি: Koha-Greenstone Integrated Library Management System এর মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইজসার্ভারের সাথে লিংক করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের গ্রন্থাগার অটোমেশন সম্পন্ন করতে ব্যানবেইজসার্বিক সহযোগিতা করেছে।
- প্রকাশনা কার্যক্রম: প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। ব্যানবেইজ শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিবেদনসমূহ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- তথ্য সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ: National Education Survey and Training (NEST) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রবাহ দ্রুততর করার জন্য সরাদেশের ১৪,৫০০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আইসিটি প্রশিক্ষণ: কোরিয়া সরকারের ১.৬ মিলিয়ন ডলার অনুদানে ব্যানবেইজ'বাংলাদেশ কোরিয়া আইসিটি ট্রেনিং ফর এডুকেশন (বিকেআইটিসিই)' প্রকল্পের আওতায় ৫টি অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে একসাথে ১০০জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এ আইসিটি সেন্টারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ৮টি মডিউলে আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ পর্যন্ত ৯,২১০ জনকে উক্ত ল্যাবসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার: আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের জন্য কোরিয়া সরকারের সরল ঋণ সহায়তায় উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন, প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ খ্রি. ব্যানবেইজে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন এবং ই-লার্নিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
- আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার: কোরিয়া সরকারের EDCF এর আওতায় কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক থেকে ৪০ বছর মেয়াদে (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ) ০.০১% হার সুদে ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সরল ঋণ সহায়তায় ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দোতলা ভবনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ২৪ টি কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়াসহ একটি পিসি ল্যাব, ৫টি কম্পিউটার বিশিষ্ট একটি সাইবার সেন্টার এবং ১টি সার্ভারসহ লোকাল ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (National Teacher Registration and Certifcation Authority)

ইতিপূর্বে মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক ও বেসরকারি কলেজ বা মাদ্রাসার প্রভাষক পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা আর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় বাদ পড়ে যেত অনেক মেধাবী প্রার্থী। এ কারণে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ খ্রি.শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-

১. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বা কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল

২. মাধ্যমিক ও উচ্চ মধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত-

ক) বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল;

খ) বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ এবং

গ) বেসরকারি কলেজ

৩. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত-

ক) বেসরকারি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ;

খ) বেসরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট;

গ) ভোকেশনাল কোর্স পরিচালনাকারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং

ঘ)বিজনেস ম্যানেজমেস্ট কোর্স পরিচালনাকারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৪. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া হতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত-

ক) বেসরকারি দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা এবং

খ) বেসরকারি সংযুক্ত এবতেদায়ি দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা।

৫. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কলেজ।

কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়

- কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়
- কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

কর্তৃপক্ষের পরিচালনা

- কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি নির্বাহী বোর্ডের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সব ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে নির্বাহী বোর্ডও সেই সব ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- নির্বাহী বোর্ড- এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ড গঠন

নিচের সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাহী বোর্ড গঠিত হবে। যথা-

ক. চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে);

খ. সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ ,পদাধিকার বলে);

গ. সদস্য (মূল্যায়ন/পরীক্ষা প্রত্যয়ন ,পদাধিকার বলে);

ঘ. সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব/ শিক্ষামান, পদাধিকার বলে);

ঙ. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষ অধিদপ্তর, (পদাধিকার বলে);

চ. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা, (পদাধিকার বলে);

ছ. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, (পদাধিকার বলে);

জ. শিক্ষা মন্ত্রণালায় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রাণালয়ের উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা

ঝ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট- এর একজন অধ্যাপক;

ঞ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক।

নির্বাহী বোর্ডের সভা

- এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি নির্বাহী বোর্ড তার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।
- নির্বাহী বোর্ডের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ের অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে নির্বাহী বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- চেয়ারম্যান নির্বাহী বোর্ডের সব সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী বোর্ডেরসদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী বোর্ডের কোন সদস্য জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

- নির্বাহী বোর্ডের অন্যান্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে তার সভায় কোরাম হবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।
- উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- শুধু কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকায় নির্বাহী বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবেনা এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থানপন করা যাবে না।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি (Function of Authority)

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো-

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ।
- শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ।
- জাতীয়ভাবে শিক্ষক মান নির্ধারণ ও যোগ্যতা নিরূপণের কার্যক্রম গ্রহণ।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন।
- শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য পরীক্ষা ও সনদ ইত্যাদি খাতে
- ফি নির্ধারণ ও আদায়
- শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ দান।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই।
- এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়ন।
- উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা।
- বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন।
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

কর্তৃপক্ষের তহবিল

১. কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার জন্য তার একটি নিজস্ব তহবিল থাকবে এবং নিচের উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হবে। যেমন-
   - সরকার কতৃক প্রদত্ত অনুদান।
   - সরকারের অনুমোদনসহ কোনো বিদেশি সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
   - কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
   - কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
   - কর্তৃপক্ষের অর্থ বিনিয়োগ হতে অনুদান।
   - কর্তৃপক্ষের আদায়কৃত নিবন্ধন ফি, প্রত্যয়ন ফি ও অন্যান্য ফি- এর আয়।
   - সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

২. কর্তৃপক্ষের তহবিল বা তার অংশবিশেষ সররকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।
৩. উক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিল ব্যাংকে জমা রাখা হবে।
৪. বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিলের রক্ষণ ও তার অর্থ ব্যয় করা যাবে।

সরকারি কর্মকমিশন (Public Service Commission, PSC)

একজন শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা থাকে পড়ালেখা শেষ করে কাঙ্ক্ষিত চাকরির মাধ্যমে দেশসেবা করার। বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে নানা সংস্থা লোক নিয়োগ করে থাকে। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজস্ব খাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডারভুক্ত বিভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় কর্মকর্তা পদে লোক নিয়োগের সুপারিশকারী সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হলো সরকারি কর্মকমিশন (Public Service Commission)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের নবম ভাগে ২য় পরিচ্ছেদে ১৩৭-১৪১ অনুচ্ছেদে কমিশন

প্রতিষ্ঠা, সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ, কমিশনের দায়িত্ব ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কর্মকমিশন বিসিএস (Bangladesh Civil Service) পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত পদে ও সাধারণ বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে থাকে।

কর্ম-কমিশন প্রতিষ্ঠা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদে এক বা একাধিক সরকারি কর্ম-কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে একসময় দুটি কর্ম-কমিশন থাকলেও বর্তমানে একটি কর্মকমিশন রয়েছে। সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ মতে- 'আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যদের লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।'

সদস্য নিয়োগ

সরকারি কমকমিশন একজন চেয়ারম্যান ও একাধিক সদস্য নিয়ে গঠিত। সংবিধানের ১৩৮ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) ধারায় সদস্য নিয়োগের যোগ্যতা ও কর্মের শর্তাবলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

(১) প্রত্যেক কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিবর্গ হইবেন, যাহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিকাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মেকোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনসাপেক্ষে কোন সরকারি কর্ম-কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

পদের মেয়াদ

সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মেয়াদ যোগদানের তারিখ থেকে ৫ বছর। সংবিধান ১৩৯ অনুচ্ছেদের মতে-

(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাহার পয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া-ইহার মধ্যে যাহারা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদেবহাল থাকিবেন।

(২) সুপ্রীমকোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হইবেন না।

(৩) কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর কোনো সরকারি কর্ম-কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদের

(১) দফা-সাপেক্ষে

(ক) কর্মাবসানের পর কোনো সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগ লাভের যোগ্য থাকিবেন; এবং

(খ) কর্মাবসানের পর কোনো সদস্য (সভাপতি ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য থাকিবেন।

কর্ম-কমিশনের দায়িত্ব

১৪০। (১) কোন সরকারি কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্বসংক্রান্ত কোনো বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন এবং কমিশনের সহিত পরামশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোনো প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসামঞ্জস্য নহে) বিধানাবলি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পার্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতি দান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

বার্ষিক রিপোর্ট

১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে-

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহিত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ গৃহিত না হইবার কারণ, এবং (খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবন্ধ করিবেন।

(৩) যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

৫.৮ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC), শিক্ষা প্রকল্পসমূহ

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধিন সংযুক্ত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল অন্যতম। TQI-SEP মে ২০০৭ খ্রি. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করে যার শিরোনাম ছিল

æSetting up of an Integrated Apex Body on Teacher Education:National Teachers' Registration, Accreditation and Training Authority through the Expansion of NTRCA." শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারক নং-১০/৪(প্রশিক্ষণ)-৬/২০০৮/১২১ তারিখ:১৭.০২.২০১০ মোতাবেক জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC) গঠনের অনুমোদন দেয় হয় এবং ২৬ জানুয়ারি ২০১২ এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয়। জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল শিক্ষক শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে শীর্ষ সংস্থা (Apex Body)।

এনটিইসি-র গঠন কাঠামো

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিলগঠন কাঠামো অনুযায়ী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হবেন এর চেয়্যারম্যান এবং মহাপরিচালক, মউশি হবেন সদস্য সচিব। The National Teacher Education Council (NTEC) is the apex body for maintaining coordination and linkages and assuring quality of teacher education/training of the country. The council is composed as follows:

1 Chairman-Honorable Minister of Education
2 Vice- Chairman- Secretary, Ministry of Education,

Other Members

3 Chairman, University Grants Commission
4 Vice-Chancellor, National University
5 Vice-Chancellor, Bangladesh Open University
6 Director, Institute of Education and Research, DU
7 Joint- Secretary, Secondary Education,Ministry of Education
8 Chairman, NTRCA
9 Director General, Directorate of Technical Education
10 Director General, NAEM
11 Chairman, Board of Secondary and Higher Secondary Education
12 Chairman, Madrasa Education Board
13 Director (Training),Directorate of Secondary and Higher Education
14 Principal, Teachers' Training College, Dhaka
15 Principal, Bangladesh MadrasaTeachers' Training Institute
16 Representative, Non-Government Teachers' Training College
17 All the Project Directors relating to Teacher Training

Member- Secretary

18 Director General, Directorate of Secondary and Higher Education

Nominated members will work for three years from the date of nomination.

এনটিইসি-র কার্যাবলি

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (এনটিইসি)-র কার্যাবলি হবে নিম্নরুপ-

- Development and establishment of effective quality control framework for teacher education/training of the country;
- Development and establishment of national standards equally applicable to both government and non-government teachereducation/training activities/teacher training course conducting institutes;
- Development of effective quality control mechanism for teacher education/training program and to regularly and continually observe, monitor and evaluate that the teacher education/training activities/course conducting institutes are running as per national standards set for them;
- To ensure compliances of rules and regulations/ensure follow up of activities developed under its quality control framework;
- To ensure development of professional competence of academic, technical and management staff of the teacher education/training institutes;
- To establish co-ordination, networking and linkages among all teacher education/training activities/course conductors to assure quality throughout;
- In order to materialize its objectives council can take up anyother activity/program which it deems necessary.

শিক্ষা প্রকল্পসমূহ (Educational Projects)

উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ। প্রকল্প হলো কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সে লক্ষ্য অর্জনের কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মসূচি।

A project is a temporary endeavor to create a unique product, service or result.

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য শিক্ষার মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আবার গ্রামে শহরের তুলনায় বেশি মানুষ বাস করে। তাই সব শ্রেণির মানুষকে একই কাতারে আনার জন্য মূল উপাদান হলো শিক্ষা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার বহু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। শিক্ষা প্রকল্পের প্রধান হচ্ছে একজন প্রকল্প পরিচালক (Projects Director বা PD)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের একটি তালিকা দেয়া হলো। ২০১০-১১ অর্থবছরের শিক্ষাক্ষেত্রে ১১টি প্রকল্প ছিল। বর্তমানে (২০১৭) এর সংখ্যা আরও বেশি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ

- সেকায়েপ
- ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প
- শিক্ষা মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প
- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প
- উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প
- ইস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২(এফএলটিসি-২) প্রকল্প
- স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

- টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট (টিকিউআইসেপ)
- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)
- অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্প
- মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, ২য় পর্যায় প্রকল্প
- জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের তথ্য

উল্লিখিত শিক্ষা প্রকল্পসমূহের মধ্যে থেকে ২টি প্রকল্পের বর্ণনা দেয়া হলো-

টিকিউআই-II প্রকল্প পরিচিতি

মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত শিক্ষা। সরকার শিক্ষার চাহিদা মেটাতে এবং প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ সৃষ্টিতে ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (CIDA) এবং সরকারের আর্থিক সহায়তায় টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (টিকিউআই-সেপ) শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল ২০০৫ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪৩১৫.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের সাহায্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ার পদ্ধতি এবং কৌশলগত পরিবর্তন আনা হয়। শিক্ষার কাঙ্খিত মান অর্জনে প্রকল্পটি বেশ সাফল্য প্রদর্শন করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক (৯ম-১০ম গ্রেড) পর্যায়ের ২,০১,০০০ জন শ্রেণি শিক্ষক, ১৬,০৩৫ জন প্রধান শিক্ষক, ১২০০ জন শিক্ষা প্রশাসক যেমন- জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা রিসোর্স অফিসার এবং সহকারি পরিদর্শকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৪,৬০০ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি, ৫৪৩ জন শিক্ষককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৫৪,০০০ জন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির এসএমসি সদস্যকে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সৃজনশীল উদ্ভাবনী তহবিল (IDF) কার্যক্রমের আর্থিক সহায়তাসহ নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিকিউআই সেপ প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সংস্কারের অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে National Teacher Registration and Certification Authority (NTRCA) প্রতিষ্ঠা এবং অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে শিক্ষকতার পেশায় আগ্রহীদের নিবন্ধন প্রদান করা। প্রকল্পের আরও একটি দৃশ্যমান সাফল্য- জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC) প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ্য শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়ন, সরবরাহ ও পরিবীক্ষণ। প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণও এ সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে; TQI-SEPএর ধারাবাহিকতায় TQI-II-SEP প্রকল্প যা ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন, ০২ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর এবং সর্বশেষ ০২ নভেম্বর তারিখে ঋণচুক্তি কার্যকর শুরু করেছে। এ প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। বাংলাদেশের সকল মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ-দ্বাদশ গ্রেড) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ TQI-II প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দের ১৮% বাংলাদেশ সরকার (GoB) এবং ৮২% এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এর অর্থায়নে পরিচালিত ফান্ড।

TQI-II প্রকল্পটি TQI-SEP এর ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত অবস্থা ও চাহিদার নিরিখে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কিছু নতুন উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC) বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, শিক্ষকের যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ, Recognition of Prior Learning (RPL) এর কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইসিটি প্রকল্পের সহযোগিতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহযোগী ভূমিকা পালন করা।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, শিক্ষকদের চাকুরীকালীন ও চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একীভূত শিক্ষায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত মান উন্নয়ন এবং নিয়োগসহ, পর্যবেক্ষণ পরীবিক্ষণ (Supervision Monitoring) কার্যক্রম সুষ্ঠু ও জোরদারকরণ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগ ও পদক্ষেপসমূহ জোরদারকরণ;
- প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকগণের যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক সকল শিক্ষকের নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও আইটি কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা;
- মাঠ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার সুপারিশ/মন্তব্যের ভিত্তিতে শিক্ষকগণের পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণ যেন তারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে;

প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ

প্রকল্পের চারটি প্রধান অংশ আছে-

১. শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা জোরদারকরণ

২. শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ডেলিভারী পদ্ধতি সম্প্রসারিতকরা

৩. একীভূত শিক্ষায় সহায়তা প্রদান

৪. দক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

১. শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠান এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা জোরদারকরণ: এই উপাদানের আওতায় ৪টি উপ-উপাদান (Sub-component) রয়েছে-

ক) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পলিসি কাঠামো জোরদারকরণে TQI-SEP প্রকল্প কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ লক্ষ্যে নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে NTRCA প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। TQI-II কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে National Teacher Education Council (NTEC) গঠন করা হবে। NTEC এর সভাপতি হবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং সদস্য-সচিব মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কম্পিটেন্সি নির্ধারণ, কম্পিটেন্সিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম/ম্যানুয়াল প্রণয়ন, শিক্ষকের Recognition Criteria নির্ধারণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্টনারশিপ কার্যক্রম ইত্যাদি NTEC এর গাইডেন্সে বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া TQI-II প্রকল্প কর্তৃক সরকারি/বেসরকারি শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের Career Path রিভিউ ও ডেভেলপ করা হবে।

খ) শিক্ষকের গুণগতমান উন্নয়ন ও মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ক্যাপাসিটি জোরদারকরণ Secondary Teacher Informaion System (STIS) এর সাহায্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণসহ ফিডব্যাক প্রদানের লক্ষ্যে মাউশি অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

গ) শিক্ষকের শ্রেণিকার্যক্রম মনিটরিং বৃদ্ধিকরণ মনিটরিং কার্যক্রম সংঘটনের লক্ষ্যে ৩টি স্তরে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হবে-

১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখার ক্যাপাসিটি জোরদারকরণ: মাউশি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখা শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে NTEC, NTRCA এবং অন্যান্য প্রকল্পসমূহের সাথে প্রশিক্ষণ শাখার যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শাখার ভূমিকা ও কার্যপরিধি পুনর্বিবেচনা, শক্তিশালীকরণের জন্য TQI-II কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

২) জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কার্যালয়ের ক্যাপাসিটি জোরদারকরণ: জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বেসরকারি শিক্ষকদের MPO তথ্য অন্তভুর্ক্তকরণ ও আপডেট করে থাকে। দ্রুততার সাথে সঠিকভাবে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ আপডেট করার জন্য TQI-II প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৩) প্রধান শিক্ষক/মাদ্রাসা সুপার/অধ্যক্ষগণের নেতৃত্বের ক্ষমতা জোরদারকরণ: বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ-১২শ গ্রেড) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের শিক্ষক, কর্মচারী/কর্মকর্তা, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠভাবে ও সঠিকভাবে পরিচালনা, মেনটরিং এবং মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে তাঁদের নেতৃত্বের গুণাবলি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে TQI-II কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছু Criteria এরভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে TQI-II এর Cluster Centre School (CCS) হিসেবে তৈরি করা হবে এবং এ রকম কিছু প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য রয়েছে বিদেশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ঘ) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের অংশীদারিত্ব স্থাপনে সহায়তা প্রদান: প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী বেশ কিছু Partnership Arrangement এর Provision রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

১) চাকুরী-পূর্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য যোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীদারিত্ব স্থাপন

২) ই-লার্নিং সামগ্রী তৈরির জন্য যোগ্য IT কোম্পানি এবং Education Expertএর সাথে পার্টনারশিপ

৩) জ্ঞানও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Twinning arrangement/যৌথ ব্যবস্থা/আয়োজন Innovation & Development Fund (IDF) এর সাহায্যে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে বাস্তবায়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্টনারশিপ

২. শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ডেলিভারী পদ্ধতি সম্প্রসারিত করা

ক) চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণ: আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শিক্ষার মানদণ্ডে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকের গুণগত মানোন্নয়নে বি.এড সহ অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণসমূহ কম্পিটেন্সি বেজড করা হবে।

খ) **সিপিডি পলিসি ও কার্যক্রম:** মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ-১২শ গ্রেড) শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ও আইসিটি-ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন বিষয়ক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে CPD প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। বিষয়ভিত্তিক CPD প্রশিক্ষণ দেয়া হবে মোট ৬০,০০০ শিক্ষককে এবং CPD for ICT প্রশিক্ষণ মোট ৬০,০০০ শিক্ষককে।

গ) **চাকুরীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ:** যে সকল শিক্ষকের বি.এড প্রশিক্ষণ নাই বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ/যোগ্যতা নাই তাদেরকে ৩মাস ব্যাপি STC প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিক্ষকদের জন্য Recognition of Prior Learningএর ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ) **আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থা:** মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ-১২শ গ্রেড পর্যন্ত) সকল শিক্ষার্থীর জন্য আইসিটি ভিত্তিক আকর্ষণীয় শিখন পরিবেশ হবে। এতে করে শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী, আগ্রহী ও উৎসাহী হবে এবং প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর ড্রপ আউট হার কমে যাবে এবং পাশের হারও বৃদ্ধি পাবে।

ঙ) **প্রশিক্ষণ দাতা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা জোরদারকরণ:** বিভিন্ন প্রশিক্ষণ Provider যেমন-TTC, HSTTI, BMTTI, NAEM ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্ট ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

৩.একীভূত শিক্ষায় সহায়তা প্রদান

সারাদেশে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রকল্প বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-

- উপজেলা/জেলায় Gender Parity আনয়ন
- প্রতি প্রশিক্ষণে ৩০% মহিলা শিক্ষক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
- প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর অগ্রাধিকার প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ
- প্রতিবন্ধী, Ethnic Minority, Slow-Learner ইত্যাদি সকলের জন্য শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
- জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টি
- প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএমসি/জিবি-এর সদস্য হিসেবে মহিলা শিক্ষক/অভিভাবক বৃদ্ধি

- অনগ্রসর অঞ্চলের মহিলা শিক্ষকের জন্য প্রতি বছর ৩০০ (তিনশত) বৃত্তি প্রদান
- একীভূত শিক্ষা, জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা, ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রচার।

৪. দক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

ডিপিপি-র আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১টি PSC (Project Steering Committee)ও ১টি PIC (Project Implementation Committee) আছে- এ সকল কমিটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে। প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য রয়েছে ১টি সুনির্দিষ্ট DMF (Design & Monitoring Framework)। মাউশি অধিদপ্তর তথা টিকিউআই-২ প্রকল্পের অর্থায়নে BANBEIS এর সাহায্যে Teachers Biannual Census, Secondary Teacher Information Collection এবং Reportপ্রণয়ন ইত্যাদি কাজ চলছে।

টিকিউআই-২ এর উল্লেখ্যযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ (মাধ্যমিক স্তরঃ ৬ষ্ঠ-১২শ গ্রেড)

- ১৪/০৫ দিনব্যাপি CPD for ICT-Digital Content Development প্রশিক্ষণ (৬০,০০০)
- বিষয়ভিত্তিক (১১টি বিষয়- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে) ০৩/০৬ দিনব্যাপি ToT (২৩০০) এবং ২১ দিনব্যাপী CPD প্রশিক্ষণ (৬০,০০০)
- প্রধান শিক্ষক/সুপার/অধ্যক্ষ এর ২১/৩৫/০৬ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ (২২,০০০)
- ০৩ দিনব্যাপি SMC প্রশিক্ষণ (২৫,০০০) সদস্য
- ০৬ দিনব্যপী DEO/ADEO/USEO ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ (৯০০)
- ১০ দিনব্যাপি DSHE Personnel ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ (৬০০)
- ০৩ মাসব্যাপি STCপ্রশিক্ষণ (১০,০০০)

প্রকল্পের বিশেষ কার্যক্রম

- ৫১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল প্রতিষ্ঠা
- ২৭টি Learning Centreপ্রতিষ্ঠা (৫১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুলের মধ্যে)
- সরকারি তিনটি টিটিসিতে ৩টি Centre of Excellence প্রতিষ্ঠা (ইংরেজি, গণিত,বিজ্ঞান)
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানেকম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ফটোকপি মেশিন, ফার্ণিচার ইত্যাদি প্রদান
- জেলা শিক্ষা অফিসার, মাউশি অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট ৭০টি গাড়ি প্রদান
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বিষয়ে Recognition of Prior Learning (RPL)নির্ধারণ
- একীভূত ও জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা
- Research & StudiesIDFএর মাধ্যমে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদান

প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার

• শিক্ষা মন্ত্রণালয় • মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর • জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) • জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড • জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	• সরকারি/বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ • উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট • বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট • আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় • শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রকল্প

প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ

- শ্রেণি শিক্ষক (৬ষ্ঠ-১২শ গ্রেড)
- প্রধান শিক্ষক/মাদ্রাসা সুপার/অধ্যক্ষ
- টির্চার এডুকেটর (টিটিসি, এইচএসটিটিআই, বিএমটিটিআই,নায়েম)
- আঞ্চলিক উপ-পরিচালক
- জেলা/সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার
- উপজেলা/সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার
- মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএমসি/জিবি সভাপতি/সদস্য
- শিক্ষার্থী (৬ষ্ঠ-১২শ গ্রেড)

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ভেন্যুসমূহ

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
- সরকারি/বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ
- উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রকল্পের ৩টি ORC
- প্রকল্পের ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল (৫১টি)

সমঝোতা স্মারক চুক্তি

- ব্যানবেইস এর সাথে সমঝোতা স্মারক সই
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সাথে সমঝোতা স্মারক সই
- অ২ওপ্রোগ্রামের সাথে সমঝোতা স্মারক সই
- ইংলিশ ইন এ্যাকশনের সাথে সমঝোতা স্মারক সই
- ব্রিটিশ কাউন্সিল এর সাথে সমঝোতা স্মারক সই

বাংলাদেশে শতকরা ৯৮ ভাগ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে উন্নয়ন বিষয়ক অনেক কাজেই স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি/জিবি-এর) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যাবলি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অর্জন করা এসএমসি/জিবি-এর সদস্যদের জন্য খুবই প্রয়োজন।

সেসিপ (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম, এসইএসআইপি)

মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত চলমান প্রকল্পসমূহে মধ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রোগ্রামটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এবং এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE). বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো সংস্কার এবং গুণগতমান উন্নয়নে এ প্রোগ্রাম সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাখাতকে শক্তিশালীকরণ, মাধ্যমিক শিক্ষার মনোন্নয়ন এবং অধিকহারেমাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ও সমতা বিধানকল্পে নানা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এবং বিদ্যালয় কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনার

সংস্কার সাধনে এ প্রোগ্রাম ভূমিকা রাখছে। ২০০৬-২০১৩ বাস্তবায়নেরও এসইএসডিপি (SESDP) সহায়তা দিয়েছে। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে এ প্রকল্পের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণসহায়তায় প্রথম একটি বৃহৎ প্রকল্প নেওয়া হয় যা সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SEDP) নামে পরিচিত। এ প্রকল্পের মূল কাজ ছিল শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, পাঠ্যপুস্তক উন্নত করা এবং নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে শিক্ষকদের পরিচিত করানো, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়ন প্রভৃতি। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে মাউশির নেতৃত্বে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (SESIP) নামে কার্যক্রম শুরু করে এবং যার মেয়াদ ছিল ডিসেম্বর ২০০৭ সাল পর্যন্ত। ২০০৭ খ্রি. জানুয়ারি মাসে ২য় পর্যায়ে এসইএসআইপি এর নাম পরিবর্তন করে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP) শুরু করা হয় এবং যার মেয়াদ ছিল জুন ২০১৪ পর্যন্ত। পুরনায় এ প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করা হয়। জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ১০ বছর মেয়াদে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP) নামে নতুনভাবে প্রোগ্রাম আঙ্গিকে কার্যক্রম শুরু করে। ইতোমধ্য এ প্রোগ্রামের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ের শিখন-শিক্ষা উপকরণের তালিকা প্রস্তুতকরণ, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মাস্টার ট্রেইনার তৈরির ম্যানুয়াল প্রণয়ন, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম বিস্তরণে বিষয়ভিত্তিক মাস্টার ট্রেইনার ও জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষকদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এনসিটিবির নেতৃত্বে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়হায় এসইএসআইপি (SESIP) নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করে চলছে-

১. দক্ষ জনবল গড়ে তোলা:এসইএসআইপি (SESIP) এর আওতায় এনসিটিবিতে ২০জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞকে পদায়ন এবং তাঁদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা দান এবং এনসিটিবির কর্মকর্তাগণকে দেশি বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. **শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে এনসিটিবির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দান:** এসইএসআইপি (SESIP) এর টেকনিক্যাল এসিসটেন্স কনসালটেন্সি টিমের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শকবৃন্দ এনসিটিবির শিক্ষাক্রম উইং- এর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বাস্তব পরিস্থিতিতে পেশাগত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দান।

৩. **সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা:** প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা যাচাই, ত্রুটি শনাক্তকরণ এবং উপকারভোগীদের চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদি লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৪. **বিভিন্ন পর্যায়ে সভা ও কর্মশালার আয়োজন:** ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম রূপরেখা/কাঠামো ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রস্তাবনা তৈরি, পর্যালোচনা এবং চূড়ান্তকরণে সভা/কর্মশালা আয়োজনে সহায়তা।

৫. শিক্ষা**ক্রম বিস্তরণে সহায়তা দান:** ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমব্যবহারে মাঠপর্যায়ের শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষিতকরণে সহায়তা দান।

৬. শিক্ষাক্রম ডকুমেন্ট মুদ্রণ ও বিতরণ: ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম মুদ্রণ ও বিতরণ।এছাড়া শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গৃহীত কার্যাদি সম্পাদনে ব্যবহৃত নানাবিধ উপকরণ, শিক্ষা সহায়ক কর্মী সরবরাহ করে এসইএসআইপি শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করছে, যার ফলে শ্রমবাজার উপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে সক্ষম|

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো কোন ধরনের ?
২। বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মৌলিক তথ্যসমূহ কোন সংস্থা থেকে পাই ?
৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান কে ?
৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কি কি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫টি কাজ লিখুন।
৬। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কে ?
৭। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ৫টি কাজ লিখুন ?
৮। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে ?
৯। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৫টি কাজ লিখুন?
১০। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে মিনিস্টি অডিট বলা হয় কেন?
১১। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে ৫টি কাজ লিখুন ?
১২। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত ?
১৩। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর সদস্য শিক্ষাক্রম দায়িত্ব কি ?
১৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ৫টি কাজ লিখুন?
১৫। NAEM-এর পূর্ণরূপ কি ?
১৬। NAEM-এর ৫টি কাজ লিখুন?
১৭। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কি কি কোর্স অফার করে ?
১৮। শিক্ষক প্রশিক্ষণে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-এর গুরুত্ব কি ?
১৯। শিক্ষক প্রশিক্ষণে বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-এর ভূমিকা কি ?
২০। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ?
২১। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত ৫টি প্রশিক্ষনের নাম লিখুন ?
২২। BANBEIS- এর পূর্ণরূপ কি ?
২৩। বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৫টি কাজ লিখুন?
২৪। NTRCA -এর পূর্ণরূপ কি ?জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের ৫টি কাজ লিখুন?
২৫। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সংবিধানের কোন কোন ধারা মতে গঠিত?
২৬। কেস জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে ?
২৭। শিক্ষা প্রকল্প কি? কয়েকটি শিক্ষা প্রকল্পের নাম লিখুন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো ব্যাখ্যা করুন।
২। বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার গতি-প্রকৃতি মৌলিক তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।
৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করুন।
৪। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।
৫। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
৬। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতায় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন ।
৭। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড -এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
৮। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
৯। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি-এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
১০। শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
১১। শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
১২। বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য সরবরাহে শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
১৩। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।
১৪। সংবিধানের কোন কোন ধারা মতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হয়েছে তা বর্ণনা করুন।
১৫। জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল-এর গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৬ : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মেরুদন্ড হলো বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা, যাকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বা এসএমসি বলা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বা এসএমসি কতগুলো সুনির্দিষ্ট আইন,বিধি ও নিয়মের দ্বারা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে থাকে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সাথে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণও জড়িত থাকেন এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।এই ইউনিটে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াবলিকে মোট ৪টি পাঠে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো-

৬.১.১ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিধি-বিধান
৬.১.২ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব
৬.১.৩ অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি
৬.১.৪ একাডেমিক পরিকল্পনা

৬.১ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিধি-বিধান

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিম্নতর স্তরে রয়েছে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা। শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি যা মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রযোজ্য, তা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জে.বি. সিয়ার্স (১৯৫০) ও আর.টি. গ্রেস (১৯৫৭) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন—

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি ও পরিণতি পর্যালোচনা করা।
২. প্রতিষ্ঠানের কাঠামো বিন্যাসের লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা তৈরি করা।
৩. পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মী নিয়োগ ও পদবিন্যাস করা।
৪. কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট বণ্টন ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করা।
৫. কাজের সংখ্যাগত ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে সুসমন্বয় বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি বা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা।
৭. নির্ধারিত উদ্দেশ্যের আলোকে সঠিক ফলাফল মূল্যায়ন করা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. পরোক্ষ কর্তৃপক্ষ (Indirect Authority)
২. প্রত্যক্ষ কর্তৃপক্ষ (Direct Authority)

পরোক্ষ কর্তৃপক্ষ হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, জেলা শিক্ষা অফিস, ব্যানবেইস ও উপ-আঞ্চলিক পরিচালক। এসকল কর্তৃপক্ষ নীতি নির্ধারণসহ বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC)। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় এদের ভূমিকা ও কার্যাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা নীতি

শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণ করেন। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministary of Education)। আবার অনেক সিদ্ধান্ত আসে সরকারের উচ্চ স্তর থেকে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন অনেক নীতি রয়েছে যা প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে থাকে। গৃহীত এসব নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে একক কর্তৃত্ব রাখে—

১. নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত।
২. আন্তঃমন্ত্রণালয়ের পারস্পরিক যোগাযোগ সমুন্নত রাখা ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধান।
৩. শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৪. শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালনার বিধি-বিধান

কোনো সংগঠন, সংস্থা, দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন অনিবার্যভাবেই প্রচলিত থাকে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রটিও এর ব্যতিক্রম নয়। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা সরকারি দপ্তর পরিচালনার জন্য যেমন সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত আইনকানুন ও বিধি-বিধান রয়েছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা ততটা সমৃদ্ধ না হলেও প্রচলিত রয়েছে, বেশ কিছু বিধি-প্রবিধি, সার্কুলার ইত্যাদি। এ পাঠে কয়েকটি মৌলিক বিধি-বিধান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছেযা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্তই অপরিহার্য।

- **স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের চাকরিবিধি-১৯৭৯**

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ কর্তৃক সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে **১৯৭৯** খ্রি. এটি জারি করা হয়। একই বছরে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বেসরকারি মাদরাসাসমূহের জন্য প্রযোজ্য অনুরূপ একটি বিধি জারি করাহয়। পরবর্তীতে **১৯৮০** খ্রি. এ বিধি মোতাবেক সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয়। বেসরকারি সকল শিক্ষকদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, চাকরির শর্তাবলী, পদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার বিধান, ছুটির সুবিধাদি, অবসর গ্রহণের বয়সসীমা, চাকরির মেয়াদ বর্ধিতকরণ ইত্যাদি প্রায় সকল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বিধিতে উল্লেখ রয়েছে। সময়ের বিবর্তনে এ বিধির কোনো কোনো ধারা অকার্যকর হয়ে গেছে সরকারের এতদসংক্রান্তে পরবর্তী আদেশ জারির প্রেক্ষিতে। উক্ত বিধির অন্যতম ধারা শিক্ষকের শ্রেণিবিভাগ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অংশটিতে প্রথমে সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্টাফিং প্যাটার্ন, **১** জানুয়ারি **১৯৮২** এবং পরবর্তীতে জারিকৃত জনবল কাঠামো ও বেতনভাতার সরকারি অংশের নীতিমালা **১৯৯৫**-এ ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক পরিবর্তন ভিন্ন অন্যান্য ধারাসমূহ এখনো মোটামুটি বহাল ও প্রচলিত রয়েছে। **১৬** পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এ মূল বিধিটি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানদের পঠন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য।

- **স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন- ১৯৭৭, ২০০৯**

এটিও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডসমূহ কর্তৃক **১৯৭৭** সালে প্রণীত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একটি মৌলিক বিধি। প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ, এডহক কমিটির অভিভাবক সদস্য মনোনয়ন, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনয়নের প্রস্তাব গ্রহণ, কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠানের সময়সীমা প্রভৃতি উল্লিখিত ছোটখাটো পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এক এক বোর্ড তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে একেক রকমের পরিবর্তন সাধন করেছে। সভাপতি মনোনয়নের নির্দেশে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এসব পরিবর্তন সংক্রান্ত আদেশাবলি এবং মূল কমিটি/গভর্নিং বডি গঠনকল্পে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারি করা হয় **১৯৭৯** সালে একটি বিধি যা মাদরাসা প্রধানদের মনোযোগের সাথে অধ্যয়নপূর্বক সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন প্রয়োজন।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় ৬ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রি./ ২৩ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ ২০০৯ (২০০৯ সনের ১নং অধ্যাদেশ) জারি করে যার দ্বারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিধিবিধান সুসংহত হয়।

- **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতার সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সংক্রান্ত নীতিমালা-১৯৯৫ ও ২০১৩**

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন কোন শ্রেণির ও যোগ্যতার শিক্ষক কর্মচারী থাকবে (যারা সরকারি বেতন ভাতার অংশ প্রাপ্য হবেন) তার পরিপূর্ণ নীতিমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হয় **২৪** অক্টোবর **১৯৯৫** তারিখে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা শিরোনামে। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে এতে আরও কিছু সংযোজন করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধিশাখা-১৩ স্মারক নং- শিম/শাঃ ১৩/ এমপিও নীতিমালা সংশোধন/ ২১২২/৮৭ তারিখঃ ১০ চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/ ২৪ মার্চ ২০১৩ খ্রি. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সর্ম্পকিত নির্দেশিকা-র পরিপত্র জারি করে।

- **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদরাসা—পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধান)**

সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা) পরিচালিত হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান করে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষকদের অনুকূলে বেতন ও ভাতাদির সরকারি অংশ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের সদ্ব্যয় নিশ্চিতকরণসহ শিক্ষার মান, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় ৬ জানুয়ারি ২০০৯/ ২৩ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ ২০০৯ (২০০৯ সনের ১নং অধ্যাদেশ) জারি করে যার দ্বারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিধিবিধান সুসংহত হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, অনুমতি, স্বীকৃতি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা প্রদান, ব্যয়িত বিপুলপরিমাণ সরকারি অর্থের সদ্ব্যয় এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিধি বিধান, নীতিমালা, পরিপত্র জারি করেছে। এছাড়াও সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন নতুন নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসহ অসংখ্য সংশোধনী, প্রজ্ঞাপন, ব্যাখ্যা, রেজুলেশন ইত্যাদি জারি করা হয়েছে।

বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালনার নীতিমালা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, নিচে সংক্ষিপ্তাকারে তা বর্ণনা করা হলো—

- **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদরাসা) স্বীকৃতি, বহাল ও নবায়ন সম্পর্কিত বিধিবিধান**

যে সমস্ত আবশ্যক শর্ত পূরণ করলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করা যায় সে সমস্ত শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়ন অযোগ্য হয়ে পড়ে। কোনো কোনো সময় স্বীকৃতি বহাল রাখার যোগ্যতা হারায়। কাজেই স্বীকৃতি লাভের পর স্বীকৃতি বহাল রাখতে হলে স্বীকৃতির অত্যাবশ্যক শর্তসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সর্বশেষ বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। নিচে স্বীকৃতি প্রদান, বহাল ও নবায়ন সম্পর্কিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/০৪/১৯৯৭ ইং তারিখ শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০ (৬০৬) নং স্মারকে জারিকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে স্বীকৃতি বহাল ও নবায়নের জন্য ন্যূনতম চাহিদা/শর্ত সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করা হলো। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং- শিম/শা: ১১/ বিবিধ-৩৯/ ৯৬/১৮১ তারিখ: ১১ জৈষ্ঠ্য ১৪০৪ বঙ্গাব্দ/ ২৫ মে ১৯৯৭ খ্রি. দ্বারা সংশোধিত।

- **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদরাসা)-এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সম্পর্কিত বিধিবিধান :** ০১/০১/১৯৮০ তারিখ থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য প্রথম বেতন বিধি ও বেতনক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ০১/০১/১৯৮২ তারিখে এবং সর্বশেষ ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের শাঃ-১১/বিবিধ-৫/৯৪(অংশ-৬)/৩৯৪-৩৯৭ পরিপত্রে বেতনবিধি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যা বর্তমানে চালু আছে। এ বিধি অনুযায়ী বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা) শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ আবশ্যক।

(১) **স্বীকৃতি :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং দাখিল মাদরাসাকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড) কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হতে হবে এবং হালনাগাদ পর্যন্ত স্বীকৃতি নবায়ন থাকতে হবে।

(২) **ছাত্রছাত্রী সংখ্যা :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রবিধান/নীতিমালা (শিম/শা-১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০ (৬০৬) তারিখ ২৩/৪/১৯৯৭) অনুযায়ী ন্যূনতমসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকতে হবে। (স্বীকৃতি বহাল ও নবায়ন শর্ত-১ দ্রষ্টব্য)।

(৩) **শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম :** বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রবিধান/নীতিমালা (শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০ (৬০৬) তারিখ ২৩/৪/১৯৯৭) এর বর্ণনা মোতাবেক শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম চালু থাকতে হবে। (স্বীকৃতি বহাল ও নবায়ন শর্ত নং-৬-৭ দ্রষ্টব্য)।

(৪) **হিসাবরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা :** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রণীত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি "নির্দেশিকা" (শিম/শাঃ ৪/১০/এম-৫০/৮৩/৫৬০ (১৫০০০) শিক্ষা, তারিখ ১০/৬/১৯৮৪) অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকতে হবে। (যার উল্লেখযোগ্য অংশ সংযুক্ত করা হলো পরিশিষ্ট খ, পৃষ্ঠা নং ১৩-১৬ দ্রষ্টব্য)।

(৫) **ব্যবস্থাপনা কমিটি :** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কিত প্রবিধিমালা অনুযায়ী (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের "ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন ৭৭, দাখিল মাদরাসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের "গভর্নিং বডি এবং ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন ৭৯", নিম্ন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিধান) অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকতে হবে এবং সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত সকল নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

(৬) **পরীক্ষার ফলাফল:** (ক) বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদরাসাকে নিম্নলিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পাবলিক পরীক্ষায় ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ফলাফল অর্জন করতে হবে।

ক্র. নং	**পরীক্ষার ধরন**	**পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল**		**বার্ষিক পরীক্ষার পাসের ন্যূনতম হার**
		উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা	পাসের ন্যূনতম শতকরা হার	পাশের ন্যূনতম হার
১	এসএসসি	১৫	৩০%	৮০%
২	দাখিল	৫	২০%	৭০%
৩	শ্রেণিসমূহের পরীক্ষা	—	—	৮০%

(খ) কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির পর ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পাবলিক পরীক্ষায় বোর্ডের বার্ষিক পাসের হারের ৫০% ফলাফল অর্জন এবং তৎপরবর্তীতে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) **জনবল কাঠামো:** বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদরাসমূহের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিয়োজিত হতে হবে-

ক্রমিক নং	**গ্রুপ**	**পদবী**	**প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পদ সংখ্যা**			**মন্তব্য**
			নিম্ন মাধ্যমিক	**মাধ্যমিক**	**দাখিল**	
১	প্রশাসনিক (আবশ্যিক)	প্রধান শিক্ষক/ সুপারিন্টেনডেন্ট	১	১	১	
২	প্রশাসনিক (আবশ্যিক)	সহকারী প্রধান শিক্ষক/ সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট	—	১	১	
৩		সহকারী শিক্ষক (গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান)	১	১	১	
৪	সহকারী মৌলভী		—	—	৩	
৫	সমাজবিজ্ঞান	সহকারী শিক্ষক	১	৩	২	
৬	বিজ্ঞান (অনুমতি থাকলে প্রযোজ্য)	সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)	—	১	১	
৭	বিশেষ	সহকারী শিক্ষক (কৃষি)	১	১	১	
৮	(আবশ্যিক)	সহকারী শিক্ষক (কৃষি)	১	১	—	* নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৬০ জন ছাত্রছাত্রী থাকলে প্রতি ধর্মের জন্য অতিরিক্ত ১ জন ধর্মীয় শিক্ষক প্রাপ্য।
৯	(আবশ্যিক)	সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা)	১	১	১	* নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত প্রতি শাখার জন্য ১ জন করে শিক্ষক বৃদ্ধি পাবে।
১০	কম্পিউটার (অনুমতি থাকলে প্রযোজ্য)	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)	—	১	১	
১১		এবতেদায়ী প্রধান	—	—	১	* প্রতি শ্রেণিতে ৮০ জন ছাত্র হলে ১টি শাখা এবং ১২০ জন হলে ২টি শাখা খোলা যাবে।
১২		জুনিয়র শিক্ষক	—	—	১	
১৩		জুনিয়র মৌলভী	—	—	১	
১৪		ক্বারী এবতেদায়ী	—	—	১	
১৫		ক্যাটালগার	—	১	—	

১৬	তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	নিম্নমান সহকারী	১	১	১	
১৭	চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	এমএলএসএস/ গার্ড/ মালী/ ঝাড়ুদার	১	২	২	
১৮	কেবল বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য	আয়া	১	১	১	

(৮) পদসমন্বিতকরণ

(ক) উপরিউক্ত জনবল কাঠামো অনুযায়ী কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট গ্রুপ ও পদবীর বিপরীতে পদায়ন করতে হবে।

(খ) প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা যদি জনবল কাঠামোর প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হয় তবে অতিরিক্ত পদসমূহ উদ্বৃত্ত পদ বলে পরিগণিত হবে। এ ধরনের উদ্বৃত্ত পদে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীর পদ শূন্য হলে নতুনভাবে ঐ পদে আর লোক নিয়োগ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জুনিয়র শিক্ষকের পদ নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী উদ্বৃত্ত পদ বলে চিহ্নিত হওয়ায় এ পদে কর্মরত কারও পদ শূন্য হলে ঐ পদে আর লোক নিয়োগ করা যাবে না।

(গ) তবে এ জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদায়নের পর পদ শূন্য থাকলে তাতে **১/১/১৯৮২** এর নিয়োগ বিধি ও ২৪/১০/১৯৯৫ ইং তারিখের জনবল কাঠামো অনুসরণপূর্বক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

(ঘ) যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপরিউক্ত জনবলের অতিরিক্ত শিক্ষক ও কর্মচারী কর্মরত রাখতে চায় তবে নির্ধারিত জনবলের অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির ১০০% সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে।

(৯) নিয়োগ বিধি : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের **১/১/১৯৮২** তারিখের নং ০১ (বিজ্ঞপ্তি) ম/০১/১৪০০ম জারিকৃত নিয়োগ বিধি ও পদ্ধতি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হবে (পরিশিষ্ট 'গ' সংযুক্ত পৃষ্ঠা নং-১৭)।

(১০) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো সম্পর্কিত ২৪/১০/১৯৯৫ ইং তারিখের জারিকৃত নীতিমালায় বর্ণিত নিয়োগ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত পরিশিষ্ট 'ক' মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে (সংযুক্তি পৃষ্ঠা নং-৭-১২)।

(১১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২/৪/২০০৩ তারিখের স্মারক নং-শা : ১১/৬(২)/২০০২/৩৪৭ (১৩) অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা জীবনে যে কোনো একটি পরীক্ষায় একটি তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগযোগ্য বিবেচিত হবেন এবং তারা এমপিও প্রাপ্য হবেন।

শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ

১। ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষক ও কর্মচারীগণ সরকারি বেতন ও ভাতাদি পাবেন। ৬০ বছরের পরে পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীগণ বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পাবেন না। তবে কেবল মাত্র ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়মানুযায়ী চুক্তিভিত্তিক/পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হলে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্য হবেন।

২। কোনো অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করলে তাঁর পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ (যদি থাকে) বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশরূপে পাবেন।

৩। কোনো পদে কর্মরত কোনো শিক্ষক/কর্মচারী তাঁদের প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার জন্য উচ্চতর স্কেল বা বর্ধিত বেতন পাওয়ার যোগ্য হলে যোগ্যতা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের তারিখ থেকে তাঁর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পাবেন।

৪। বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী শিক্ষক/কর্মচারী একই সাথে একাধিক চাকরিতে/অর্থকরী পেশায় নিয়োজিত থাকতে পারবেন না।

৫। শিক্ষক ও কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা তাঁদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে গণনা করা হবে।

৬। বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতিক্রমে কোনো শিক্ষক/কর্মচারী অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমপদে বা ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করলে তাকে বিভাগীয় প্রার্থীরূপে গণ্য করা হবে। এরূপ প্রার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হবেন সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হলে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র গ্রহণ ও অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে তিনি সমহারে/নির্ধারিত হারে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ থেকে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্য হবেন। তবে এক প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরি ত্যাগ করার পর অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদানকালীন সময়ের ব্যবধান ৬ (ছয়) মাসের অধিক হলে উক্ত মেয়াদ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে গণ্য হবে না এবং এ সময়ের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ গ্রহণ করা যাবে না।

শিক্ষকতার বিষয় নির্ধারণী

১। প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদরাসার প্রধান ও সহকারী প্রধানের সাপ্তাহিক ক্লাস/পিরিয়ড ২৯ এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানের ২০ এবং অন্যান্য শিক্ষকদের ক্লাস/পিরিয়ড ৩২ (বত্রিশ) এর কম হবে না।

২। শিক্ষকদেরকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রুপের ন্যূনতম একটি পাঠ্য বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা থাকতে হবে। তাছাড়া শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির জন্য নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম ৩ (তিনটি) বিষয়ে পাঠদানের দক্ষতা থাকতে হবে।

৩। প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ও অন্যান্য অনুসরণীয় সহশিক্ষাক্রমিক বিষয়ের ন্যূনতম একটি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য অংশ

১। বাজেট পরবর্তী অর্থবছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে বছর শুরুর পূর্বেই বাজেট প্রণয়ন করে পরিচালনা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। যদি কোনো সময় প্রকৃত আয় অনুমোদিত বাজেটের সম্ভাব্য আয় অপেক্ষা কম হয় তবে প্রত্যেক খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে এ ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

২। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দৈনন্দিন আয়ের টাকা যথা– ছাত্র বেতন, সরকারি অনুদান, চাঁদা ও অন্যান্য আয় সরাসরি নিকটস্থ ব্যাংকে জমা দিতে হবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে খরচ করতে হবে।

৩। দৈনন্দিন খরচের জন্য আয়ন-ব্যয়ন অফিসার (প্রতিষ্ঠান প্রধান) কত টাকা হাতে রাখতে পারবেন তা পরিচালনা কমিটি স্থির করবেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি নগদ টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে হাতে রাখতে পারবেন। তবে কোনো অবস্থাতেই তা ৩০০/- টাকার ঊর্ধ্বে হবে না।

৪। দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ক্যাশ বই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজিস্টারে যথাস্থানে অনুস্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং মাসান্তে ক্যাশ বইতে মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পন্ন (close) করতে হবে। এই হিসাবে মাসিক খাতওয়ারী উদ্বৃত্ত/ঘাটতি নির্ধারণ করা হবে। আয়ন-ব্যয়ন অফিসার তথা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতি মাসান্তে ক্যাশ বইতে তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন।

৫। মাস শেষে ব্যাংক এস্টেটমেন্ট এনে ক্যাশ বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে এবং কোনো প্রকার গরমিল হলে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে সংশোধন করতে হবে।

৬। ক্যাশ বই এবং অন্যান্য রেজিস্ট্রার শুদ্ধভাবে কালিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। ঘষামাজা বা ওভাররাইটিং গ্রহণযোগ্য নয়। অশুদ্ধ এন্ট্রি কাটবার সময় তার পাঠোপযোগিতা বজায় রেখে এক দাগে কাটতে হবে এবং শুদ্ধ এন্ট্রির ওপর লাল কালিতে লিখে অণুস্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

৭। সরকারি অনুদানের টাকা যে খাতের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে তা কেবল সে খাতেই ব্যয় করতে হবে।

৮। বিনা রসিদে কোনো টাকা গ্রহণ করা যাবে না। রসিদে কেবল লিখিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আদায়কারীই স্বাক্ষর করে টাকা আদায় করতে পারবেন। ছাপানো রসিদ বই ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি রসিদে রসিদ নং, বই নং, ছাপানোভাবে উল্লেখ থাকবে। বছরান্তে স্টক টেকিং কমিটি ব্যবহৃত রসিদ পত্র ও রসিদ বই জেরের সাথে মিলিয়ে দেখবেন।

৯। সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে ক্যাশ বইতে মেমো নং ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

১০। রসিদ বইয়ের হিসাব একটি পৃথক রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাতে কত তারিখে কতকগুলো রসিদ বই ছাপানো হলো, কোন তারিখে কত নম্বর রসিদ বই ব্যবহারের জন্য বের করা হলো তা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে। অব্যবহৃত রসিদ বই প্রতিষ্ঠান প্রধানের হেফাজতে থাকবে। বৎসরান্তে স্টক টেকিং কমিটি সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারের অব্যবহৃত রসিদ বইয়ের জেরের সাথে প্রকৃত জেরের মিল আছে কিনা পরীক্ষা করবেন।

১১। আয়ের প্রত্যেক খাতের জন্য আলাদা রেজিস্ট্রার ব্যবহার করতে হবে এবং তাতে ভাউচার/রসিদ নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। বছরান্তে খাতওয়ারি আয়ের টাকার হিসাব করতে হবে এবং ক্যাশ বইয়ের সাথে তা মিলাতে হবে। প্রতি রেজিস্ট্রারে প্রতিদিনের এন্ট্রি শেষে প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন।

১২। প্রত্যেকটি খরচের জন্য ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি ভাউচারের টাকা প্রদানকারী কর্মকর্তার টাকা প্রদানের আদেশ এবং টাকা পরিশোধের পর 'পরিশোধিত ও বাতিল করা হলো' মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন থাকতে হবে, যাতে উক্ত ভাউচার ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা না যায়।

১৩। কোনো একক খরচ ৫০০/- টাকা কিংবা ততোধিক হলে টেন্ডার/কোটেশন আহ্বান করে ব্যয় করতে হবে। পরিচালনা কমিটির একজন সদস্য, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে টেন্ডার কমিটি গঠিত হবে। উক্ত টেন্ডার কমিটি দরপত্র বাছাইয়ের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাকে মনোনীত করবেন। কোনো কারণে সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণযোগ্য না হলে টেন্ডার কমিটির সভায় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। কার্যাদেশ পরিচালনা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন করে নিবেন। বেশি অঙ্কের টাকা খরচের সময় খবরের কাগজে দরপত্র দিতে হবে।

বাস্তব কারণে টেন্ডারের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যয় নিষ্পন্ন সম্ভব না হলে প্রোজেক্ট কমিটির মাধ্যমেও ব্যয় নিষ্পন্ন করা যায়। পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ প্রোজেক্ট কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রোজেক্ট কমিটি বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়ে ব্যয়ের পূর্বে এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যয়ের পর ব্যয় সম্পর্কিত তদারকি করবেন। প্রোজেক্ট কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষরে ভাউচার পাশ হতে হবে।

১৪। ভ্রমণ ভাতা বিল পরিচালনা কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে গ্রহণ করতে হবে।

১৫। প্রতিষ্ঠান প্রধান ক্যাশ বই ও অন্যান্য রেজিস্ট্রার পূরণ ও সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি ও হিসাবরক্ষণে নিয়োজিত কর্মচারী অবশ্যই প্রতি তারিখের হিসাব-নিকাশ সমন্বয়পূর্বক সই করবেন। প্রতিটি ভাউচার এবং ক্যাশ বই-এর প্রতিটি হিসাবের অঙ্কে অনুস্বাক্ষর দেবেন।

১৬। ক্যাশ বই ও রেজিস্ট্রারসমূহ ভালো চামড়ার বাঁধাইযুক্ত হতে হবে। প্রথম পৃষ্ঠায় এর পৃষ্ঠা সংখ্যা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রত্যয়ন করবেন এবং কবে থেকে লেখা শুরু হলো তা উল্লেখ করবেন।

১৭। চামড়ার বাঁধাই করা লেজার কাগজে প্রস্তুতকৃত এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর অনুমোদিত ছকবিশিষ্ট রেজিস্ট্রারে সকল শিক্ষকের ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যক্তিগত হিসাব রাখতে হবে। শিক্ষকদের প্রত্যেকের নামে ভবিষ্যৎ তহবিলের জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে এবং সংগৃহীত টাকার সমপরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠান হতে প্রদান করে ভাউচার মারফত খরচ দেখাতে হবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর একবার ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদ হিসাব করে জমা দিতে হবে। ভবিষ্যৎ তহবিলের জন্য সরকারি অনুদান পেলে ক্যাশ বইতে তা জমা ও খরচ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীর ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান ভবিষ্য তহবিলের একাউন্ট পরিচালনা করলেও পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ছাড়া ভবিষ্যৎ তহবিল থেকে টাকা তোলা যাবে না।

১৮। সাবসিডিয়ারি তহবিল (যথা—ভবিষ্যৎ তহবিল, ক্রীড়া তহবিল, টিফিন তহবিল ইত্যাদি)-এর জন্য আলাদা রেজিস্ট্রার খোলা যেতে পারে। ভবিষ্যৎ তহবিল ছাড়া এসব তহবিলের জন্য কোনো ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রয়োজন নেই। সমুদয় নগদ অর্থ একটি মাত্র ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হবে।

১৯। আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য অনুমোদিত ছকে পৃথক পৃথক স্টক রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করতে হবে।

২০। লাইব্রেরির জন্যও অনুমোদিত ছক বিশিষ্ট স্টক রেজিস্ট্রার থাকতে হবে।

২১। **শিক্ষক-কর্মচারীদের হাজিরা খাতা:** সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন অবকাশ ছুটি চিহ্নিত করে বাকি দিনগুলোতে সকল শিক্ষক-কর্মচারী হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত ছুটি হাজিরা খাতায় উল্লেখ থাকবে।

২২। **ছুটির রেজিস্ট্রার:** প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য পৃথক পৃথক পৃষ্ঠায় নাম উল্লেখ করে প্রতি বছরের জন্য ছুটির রেজিস্ট্রার বানাতে হবে, যাতে প্রত্যেক শিক্ষকের মঞ্জুরিকৃত ছুটির হিসাব উল্লেখ থাকে।

২৩। **বেতন বিলি বই:** মাসান্তে প্রতিটি শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন বিলি বইতে রাজস্ব টিকিটের ওপর স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক বেতন পরিশোধ করতে হবে। সরকারি অনুদানের জন্য নিম্নরূপ কলামবিশিষ্ট পৃথক বেতন বিলি বই ব্যবহার করতে হবে। [মেমো নং ও তারিখ। বরাদ্দকৃত মাস। নাম। পদবী। শিক্ষাগত যোগ্যতা। কর্মদিবস। স্কেল। অনুদান গ্রহণের হার। মহার্ঘ ভাতা। বাড়ি ভাড়া ভাতা। চিকিৎসা ভাতা। একটি ইনক্রিমেন্টের সমপরিমাণ প্রদানকৃত অর্থ। গ্রস পাওনা। বকেয়া পাওনা। কর্তনযোগ্য হলে কর্তিত টাকার পরিমাণ। নিট পাওনা। রাজস্ব টিকিটে স্বাক্ষর। মন্তব্য।]

২৪। **ছাত্র ভর্তি বই:** চামড়ার ভালো বাঁধাইকৃত অনুমোদিত ছক অনুযায়ী ভর্তি বই সংরক্ষণ করতে হবে।

২৫। **ছাত্র বেতন বই:** এই রেজিস্ট্রারে তারিখ এবং শ্রেণি অনুযায়ী দৈনন্দিন ছাত্র বেতন, ভর্তি ফিস এবং অন্যান্য আদায়কৃত অর্থ রসিদ অনুযায়ী উল্লেখ থাকতে হবে।

২৬। **ছাত্র বৃত্তি প্রদান বই:** যথাশীঘ্র ছাত্র বৃত্তি প্রদানপূর্বক এই রেজিস্ট্রারে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের স্বাক্ষর সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

২৭। **ছাত্র হাজিরা খাতা:** শ্রেণি ও শাখাওয়ারি ছাত্র হাজিরা খাতা থাকবে, যাতে শ্রেণি শিক্ষক ছাত্রদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি চিহ্নিত করবেন। বদলি পত্র গ্রহণ করলে এই খাতা থেকে তার নাম বাদ দিতে হবে।

২৮। **বদলি পত্র রেজিস্ট্রার :** তারিখ এবং বদলি পত্রের নম্বর উল্লেখপূর্বক বদলি পত্র বই সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে এক নজরে কোন বছরে কতজন ছাত্রছাত্রী বদলি পত্র নিয়েছে তা নিরূপণ করা যায়। ভর্তি রেজিস্ট্রারেও বদলিকৃত ছাত্রের নামের বিপরীতে বদলি পত্রের নম্বর উল্লেখ করে মন্তব্য রাখতে হবে।

২৯। **নোটিস বই :** যাবতীয় নোটিস/আদেশ এ বইতে লেখা থাকবে।

৩০। **পরিদর্শন বই :** পরিদর্শন কর্মকর্তার পরিদর্শনের তারিখসহ মন্তব্য এই বইতে লেখা থাকবে।

৩১। **রেজুলিউশন বই :** পরিচালনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ক্রমিক নম্বর ও তারিখসহ এই বইতে লেখা থাকবে। প্রতি সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহের বিবরণী শেষে মোট গৃহীত প্রস্তাবের সংখ্যা কথায় লিখতে হবে। প্রস্তাবের মাঝে কাগজে কোনো ফাঁকা জায়গা রাখা যাবে না। এ বইতে ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া, সংযোজন অথবা পরিবর্তন করা যাবে না। প্রয়োজন হলে পরিবর্তিত নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। কোনো সভায় সভাপতি উপস্থিত হতে না পারলে পরবর্তী সভায় অনুপস্থিত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করাতে হবে এবং উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁর অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে।

৩২। **চেক বই রেজিস্ট্রার :** চেক বই রেজিস্ট্রারে চেক নং সহ উত্তোলিত টাকার পরিমাণ লিখতে হবে। কোনো ব্যক্তির নামে চেক ইস্যু করা হলে তার নাম লেখা থাকবে।

৩৩। **স্থায়ী সম্পদের রেজিস্ট্রার:** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী সম্পদ, যথা— জমি, ঘর ইত্যাদির জন্য একটি রেজিস্ট্রার রাখতে হবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে মালিকানা, মূল্য ও দলিলাদির বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

৩৪। **শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ রেজিস্ট্রার:** এই রেজিস্ট্রারে শিক্ষক-কর্মচারীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ, পরিত্যাগের তারিখ, স্কেল, প্রশিক্ষণ, নমুনা স্বাক্ষর ও ১ কপি ফটোসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ ও কার্যকাল সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য থাকবে।

৩৫। **শিক্ষক-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ফাইল:** প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য পৃথক ব্যক্তিগত ফাইল থাকতে হবে। তাতে পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি, প্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত, বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত, পরিচালনা কমিটির অনুমোদন, নিয়োগপত্র, যোগদানপত্র, ছুটির দরখাস্ত, কোনো অভিযোগ থাকলে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে।

৩৬। **অন্যান্য রেজিস্ট্রার:** প্রয়োজনবোধে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে আরও রেজিস্ট্রার রাখা যেতে পারে।

৩৭। **স্টক টেকিং:** প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র প্রতি বছরান্তে একটি কমিটির মাধ্যমে স্টক রেজিস্ট্রারের সাথে মিলিয়ে দেখবে এবং সংশ্লিষ্ট স্টক রেজিস্ট্রারে তাঁরা প্রত্যয়ন করবে। স্টক টেকিং রিপোর্ট পরিচালনা কমিটির সভায় পেশ করতে হবে।

যদি কোনো জিনিসের ঘাটতি দেখা যায় তবে ঘাটতির কারণ উদঘাটনপূর্বক তা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আয়ত্ত বহির্ভূত ঘাটতিকে পরিচালনা কমিটির দ্বারা রাইট-অফ করাতে হবে। স্টক রেজিস্ট্রার সংশোধনপূর্বক সমাপ্তি জের টানতে হবে।

৩৮। **দায়িত্ব হস্তান্তর:** প্রতিষ্ঠান প্রধান বদলের সময় বিমুক্ত কর্মকর্তা ও নবনিযুক্ত কর্মকর্তা নিম্নরূপ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর ও গ্রহণ করবেন।

(ক) ক্যাশ বই আপ-টু-ডেট করে তারিখ সংযোজনপূর্বক ক্যাশ বইয়ের ব্যালান্স ও নগদ ব্যালান্স উল্লেখপূর্বক উভয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(খ) অব্যবহৃত চেকের সংখ্যা যাচাই করে প্রতিটি ব্যাংক একাউন্টের ব্যালান্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে তালিকা তৈরি করে উভয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(গ) হস্তান্তরিত যাবতীয় রেকর্ড পত্রের তালিকা তৈরি করে উভয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(ঘ) সাজ-সরঞ্জামাদির স্কট রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করে বাস্তব প্রত্যক্ষাধীনে (চযুংরপধষ াবৎরভরপধঃরড়হ) উভয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(ঙ) দায়িত্ব হস্তান্তরের পর দায়িত্ব গ্রহণকারী ক্যাশ বই ও অন্যান্য হিসাব পরীক্ষা করে নিবেন। কোনো প্রকার গরমিল দৃষ্টিগোচর হলে তা পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করবেন।

(চ) দায়িত্ব গ্রহণের পর সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রহণকারীর ওপর ন্যস্ত হবে।

(ছ) দায়িত্ব গ্রহণের পর হস্তান্তরিত প্রত্যয়নপত্রে উভয়ে স্বাক্ষর করবেন এবং পরিচালনা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করবেন।

(জ) যদি কোনো বিদায়ী কর্মকর্তা (প্রতিষ্ঠান প্রধান) কোনো কারণে দায়িত্ব বুঝিয়ে না যান, তবে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পদের একটি ফিরিস্তি তৈরি করে তদন্ত কমিটি ও পরিচালনা কমিটির দ্বারা সত্যায়িত করে নেবেন এবং এতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করাবেন। যদি এই সময় বিদায়ী কর্মকর্তার কোনো অবৈধ কার্যকলাপ দৃষ্টিগোচর হয় তবে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি/দেওয়ানি মামলা রুজু করবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩৯। **অভ্যন্তরীণ অডিট:** ৩ মাস অন্তর শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির সাহায্যে হিসাব পরীক্ষা করাতে হবে। সকল শিক্ষককেই পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যাতে সকল শিক্ষকই হিসাব সম্পর্কে অবগত হয়।

৪০। **মূল্যবান কাগজপত্র চুরির ক্ষেত্রে গ্রহণীয় ব্যবস্থা:** অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল/কতিপয় রেকর্ডপত্র হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়ার কথা জানানো হয়। প্রমাণ হিসেবে থানায় ডায়েরি করা হয়েছে বলে জানানো হয়। এটি যথেষ্ট বলে গণ্য করা যায় না। এ ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল কিনা তা তদন্ত করতে হবে, ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ ঘটনার

পুনরাবৃত্তি না হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তার গাফিলতি তদন্তে প্রকাশিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চুরি যাওয়ার হিসাব এবং রেকর্ডপত্র অবশ্যই পুনর্গঠন করে পরিচালনা কমিটির প্রস্তাবের মাধ্যমে পাশ করাতে হবে। সরকারি অনুদানের মেমো, একুইটেন্স রোল, ব্যাংক হিসাব স্টেটমেন্ট, বিবিধ ভাউচারের অনুলিপি ইত্যাদি তৈরি করে নিতে হবে। কোনো ব্যয়ের পরিচালনা কমিটির প্রস্তাবের মাধ্যমে ব্যয়ের অংঙ্কের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপ ব্যবস্থা একমাস সময়ের মধ্যে গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানাতে হবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, শৃঙ্খলা, দণ্ড, ছুটি, ভবিষ্যৎ তহবিল, অবসর, গ্র্যাচুইটি, যৌথবিমা বিষয়ক চাকরি বিধির সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়

১। শিক্ষক নিয়োগ

(ক) শূন্য পদের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগ বিধি এবং নীতিমালা অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করবেন।

(খ) নিয়োগকৃত শিক্ষক প্রথমে ২ বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

(গ) সন্তোষজনক ২ বছর অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে চাকরি করার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হবে।

(ঘ) যদি ২ বছর পর কোনো শিক্ষকের চাকরি সন্তোষজনক বিবেচিত না হয় তবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে আরও এক বছর অস্থায়ী হিসেবে চাকরির সুযোগ দিতে পারেন।

(ঙ) নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের চাকরি স্থায়ীকরণ কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(চ) পত্রিকার সকল তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।

২। বেতন ভাতাদি ও নিয়োগকালীন শর্ত

(ক) নিয়োগপত্রে শিক্ষকের বেতন ভাতাদির পরিমাণ উল্লেখ থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ভাতাদি পাবেন।

(খ) নিয়োগপত্রে অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ ও অন্যান্য শর্তাবলি থাকলে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩। শিক্ষকগণের দায়িত্ব ওকর্তব্য

(ক) পাঠ্যক্রম, সিলেবাস এবং ক্লাশ রুটিন মোতাবেক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান, নোট প্রদান, দলগত আলোচনা, টিউটোরিয়াল, সেমিনার, প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষাদান করবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের গাইড বা পরিচালনা করবার জন্য তাদের সঙ্গে শিক্ষকগণ সরাসরি সংযোগ রাখবেন।

(গ) পরীক্ষা পরিচালনা, গবেষণার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য পাঠ্যসূচির অন্তর্গত সকল ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করবেন।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের উৎসাহ প্রদান, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা করবেন।

(ঙ) প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বার্থে প্রদত্ত যে কোনো কাজ সম্পন্ন করবেন।

(চ) সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে যে কোনো কাজ সম্পাদন করবেন।

৪। গৃহ শিক্ষকতা

(ক) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো নিয়মিত শিক্ষক গৃহ শিক্ষকতা বা কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতা করতে পারবেন না।

৫। প্রকাশনা

কোনো সাময়িকী/পত্রিকা কিংবা বই প্রকাশের জন্য শিক্ষকগণের অনুমতির প্রয়োজন হবে।

৬। পদত্যাগ

কোনো শিক্ষক ইচ্ছা করলে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পদত্যাগ করতে পারবেন।

(ক) কোনো স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষা বছরের ১ম অর্ধাংশে পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি যে তারিখ হতে পদত্যাগপূর্বক অব্যাহতি পেতে চান কমপক্ষে তার এক মাস পূর্বে এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের নিকট আবেদন পেশ করবেন।

(খ) কোনো স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষাবর্ষের শেষ অর্ধাংশে পদত্যাগ করতে চাইলে, তার কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের নিকট আবেদন পেশ করতে হবে।

(গ) কোনো অস্থায়ী শিক্ষক পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক হলে তিনি যে তারিখ হতে অব্যাহতি পেতে চান সে তারিখের কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের নিকট তাকে আবেদন করতে হবে।

(ঘ) উপরে বর্ণিত শর্ত ছাড়া কোনো শিক্ষক পদত্যাগ করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালনা পরিষদ উক্ত শিক্ষককে তার চাকরি হতে অব্যাহতি তথা ছাড়পত্র প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন না এবং এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করলে তিনি যে মাসে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করবেন, সে মাসের বেতন-ভাতাদি দাবি করতে পারবেন না।

(ঙ) বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ ইচ্ছা করলে বর্ণিত শর্তাদি পূরণ ছাড়া পদত্যাগে ইচ্ছুক শিক্ষককে তার পদ হতে অব্যাহতি তথা ছাড়পত্র প্রদান করতে পারবেন।

৭। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান

(ক) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো শিক্ষক অন্যকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপত্র পেলে তিনি আবেদন করত তার বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অব্যাহতি লাভ করে ছাড়পত্র গ্রহণ করত নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করবেন।

(খ) ছাড়পত্রে সুস্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কার্যকাল, যোগদানের তারিখ, অব্যাহতির তারিখ, বেতন স্কেল ও মোট বেতন-ভাতাদির উল্লেখ থাকতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের সার্ভিস বুক বা চাকরির খতিয়ান বহি থাকা বাঞ্ছনীয়। কর খতিয়ান বহি থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮। শৃঙ্খলা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিম্নোক্ত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হতে পারেন।

(ক) শ্রেণিকক্ষে পাঠদানসহ অন্যান্য অর্পিত দায়িত্ব সঠিক সময়ে পালন না করা।

(খ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই কর্তব্য কাজে অনুপস্থিত থাকা।

(গ) বিধি বহির্ভূতভাবে ছুটি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।

(ঘ) দলীয় বা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিংবা পরিচালনা পরিষদের বিধিসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ পালনে অনীহা প্রকাশ করা।

(ঙ) পরিচালনা পরিষদের সদস্য, প্রধান শিক্ষক, সহকর্মী এবং ছাত্রদের অভিভাবকের প্রতি রূঢ় আচরণ করা।

(চ) শারীরিক বা মানসিক বৈকল্য অথবা অসুস্থতার জন্য নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে।

(ছ) ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে।

(জ) কোনো কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা তাদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটানো।

(ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা।

(ঞ) কোনো আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের কোনো আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশাবলিকে অবজ্ঞা করা।

(ট) জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকারক কোনো কর্মে লিপ্ত হওয়া।

(ঠ) প্রকাশ্য আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করা।

(ড) দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়া।

(ঢ) কোর্ট কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত বা সাজাপ্রাপ্ত।

৯। দন্ডের প্রকারভেদ

একজন শিক্ষক/কর্মচারীকে নিম্নরূপ সাজা প্রদান করা যেতে পারে—

(ক) তিরস্কার;

(খ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিতকরণ;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সরকারি আদেশ অমান্য বা অবহেলা করার দরুন সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অংশ বেতন বা আনুতোষিক হতে আদায়করণ;

(ঘ) চাকরি হতে অপসারণ;

(ঙ) চাকরি হতে বরখাস্ত।

বি. দ্র. সরকারি বিধান মতে অপসারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ভবিষ্যতে অন্য কোনো পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারেন। এক্ষেত্রে তার চাকরির পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবেচিত হয় না। কোনো শিক্ষক চাকরি হতে বরখাস্ত হলে তিনি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

১০। তদন্ত পদ্ধতি

(ক) শিক্ষকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা বিষয়ে এক বা একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত হলে পরিচালনা পরিষদের সম্মতিক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ লিখিতভাবে অভিযুক্তকে জানাবেন এবং ৭টি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগের জবাব প্রদানের জন্য অভিযুক্তকে নোটিশ প্রদান করবেন। এ ব্যাপারে তদন্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একজন শিক্ষক প্রতিনিধিসহ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও একজন সদস্য সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১১। বেসরকারি শিক্ষকের ছুটি বিধি

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সরকারি চাকরি বিধি এবং ১৯৫৯ সনের নির্ধারিত ছুটি বিধি মোতাবেক ছুটি ভোগ করেন। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ শিক্ষা বোর্ডের আইন মোতাবেক ছুটি প্রাপ্য হন এবং ভোগ করেন।

(এ)ছুটি অধিকার নয়

ছুটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা হলেও তা অধিকার হিসেবে দায়ী করা যাবে না। প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুরির আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এমনকি মঞ্জুরিকৃত ছুটির আদেশ বাতিল করে শিক্ষক/কর্মচারীকে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

(বি) ছুটি প্রাপ্তির ন্যূনতম চাকরিকাল

শিক্ষক হিসেবে ২ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিক্ষকের নৈমিত্তিক ছুটি ও পনেরো দিনের চিকিৎসা ছুটি ব্যতীত অন্য কোনো ছুটি প্রাপ্য হবে না।

(সি) ছুটির প্রকারভেদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারী নিম্নোক্ত ধরনের ছুটি প্রাপ্য হবেন— নৈমিত্তিক ছুটি, অর্জিত ছুটি, চিকিৎসা ছুটি, প্রসবকালীন ছুটি, শিক্ষা/অধ্যয়ন ছুটি, ডিউটি লিভ/কর্তব্য ছুটি, অসাধারণ ছুটি ও অবকাশ ছুটি।

(ডি) নৈমিত্তিক ছুটি

নৈমিত্তিক কারণে যে ছুটি পাওয়া যায় তাকে নৈমিত্তিক ছুটি বলে। এখানে নৈমিত্তিক বলতে ছোটখাটো অসুস্থতা, স্বল্প সময়ের জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইত্যাদির প্রয়োজন বোঝায়। গুরুতর অসুস্থতা অথবা দীর্ঘদিনের প্রয়োজন নৈমিত্তিক হিসেবে গণ্য নয়। সৌর বছরে নৈমিত্তিক ছুটি ২০ দিন। প্রয়োজনে এক সঙ্গে ১০ দিন পর্যন্ত মঞ্জুরযোগ্য। এই ছুটির সঙ্গে যে কোনো একদিকে সরকার/সাপ্তাহিক ছুটি সংযুক্ত করা যায়। নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে বিদেশ গমন করা যাবে না। নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষককে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(ক) একজন শিক্ষককে এক পঞ্জিকা বর্ষে সর্বাধিক ২০ (বিশ) দিন (সরকারি নির্দেশ মোতাবেক এই দিনের সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে) নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(খ) নৈমিত্তিক ছুটিজনিত অনুপস্থিতিকে কাজে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হয় না এবং কর্তব্যে কর্মরত হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিধায় কোনো শিক্ষকের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না।

(গ) কোনো শিক্ষককে একসঙ্গে ১০ (দশ) দিনের বেশি নৈমিত্তিক ছুটি দেওয়া যাবে না।

(ঘ) কোনো শিক্ষক আবেদন জানালে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এক বা একাধিকবার কোনো সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটি বা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত তালিকাভুক্ত অন্যান্য ছুটির পূর্বে অথবা পরে সংযুক্তির অনুমতি দেওয়া যাবে।

(ঙ) নৈমিত্তিক ছুটির উভয় দিকে অন্য কোনো প্রকার ছুটি সংযুক্ত করা যাবে না।

(চ) কর্তৃপক্ষ বা পরিচালনা পরিষদ-এর পূর্বানুমতি ছাড়া নৈমিত্তিক ছুটি ভোগকারী কোনো শিক্ষক নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।

(ছ) নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং দেশের ভিতরে নিজ কর্মস্থল থেকে এমন দূরত্বে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না যেখান হতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কর্মস্থলে পৌঁছতে স্বাভাবিকভাবে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে।

(ই) অর্জিত ছুটি

(ক) শিক্ষা বিভাগ অবকাশ বিভাগ বিধায় কোনো শিক্ষক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত ছুটির অধিকারী হবেন না। তবে কোনো শিক্ষক যদি সরকারি নির্দেশে বা যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের নির্দেশে কোনো পূর্ণ অবকাশ বা অবকাশের অংশবিশেষ ভোগ করতে না পারেন, তবে তিনি অবকাশ ভোগ করেন নাই এমন দিনের জন্য অর্জিত ছুটির অধিকারী হবেন।

(এফ) মেডিকেল ছুটি/স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি

(ক) স্বাস্থ্যগত কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে রেজিস্ট্রার্ড মেডিকেল অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে পূর্ণ গড় বেতনে এক মাস ও অর্ধ গড় বেতনে তিন মাস মোট চার মাস মেডিকেল ছুটি/স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(খ) ৭ (সাত) দিনের অতিরিক্ত স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির ক্ষেত্রে যোগদানের পূর্বে রেজিস্ট্রার্ড মেডিকেল অফিসার/মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয়।

(গ) ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালনা পরিষদ কোনো শিক্ষককে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিনা বেতনে চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুর করতে পারে।

(জি) সংক্রামক রোগ নিরোধ ছুটি

(ক) সরকারি শিক্ষকের পরিবারের কোনো সদস্য সংক্রামক ব্যাধি (যথা— গুটিবসন্ত, কলেরা, প্লেগ, টাইফয়েড জ্বর, সেরিব্রাল মেনিনজাইটিস) দ্বারা আক্রান্ত হলে রেজিস্ট্রার্ড মেডিকেল অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক **২১** দিন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৩০ দিন সংক্রামক রোগ নিরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(এইচ) প্রসূতি ছুটি

(ক) কোনো শিক্ষিকা পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক একসাথে চার মাস এবং সারা চাকরি জীবনে আট মাস পূর্ণ বেতনে প্রসূতি ছুটি গ্রহণ করতে পারেন।

শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ ১১/ ৩-৯/ ২০১১/৬৮২ তারিখঃ ৩০-০৯-২০১২ খ্রি. এর পরিপত্র মোতাবেক প্রসূতি ছুটি ৬ মাস করা হয়।

(খ) কোনো শিক্ষিকা তার চাকরিকালে ২ (দুই) বারের বেশি প্রসূতি ছুটি ভোগ করতে পারবেন না।

(গ) প্রসবের দিনের পূর্বদিন পর্যন্ত যে শিক্ষক কমপক্ষে ৯ (নয়) মাস চাকরি করেছেন তার প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(আই) অধ্যয়ন ছুটি

(ক) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত মোতাবেক অথবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোনো বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(খ) সরকারি বা পরিচালনা পরিষদের মনোনয়নক্রমে বিএড, বিপিএড, এমএড ইত্যাদি কোর্সে ভর্তির সুযোগ থাকলে প্রশিক্ষণবিহীন জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির জন্য মনোনয়ন প্রাপ্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে।

(গ) সরকার/কলেজ পরিচালনা পরিষদ/মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ যদি মনে করে যে, কোন প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক কোনো বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি (এম/ফিল, পি এইচডি ইত্যাদি) লাভ করলে তাঁর পেশাগত জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে তাঁর অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করতে পারে।

(ঘ) ছুটিপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এ মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করবেন যে অধ্যয়ন শেষে তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর চাকরি করবেন।

(জে) কর্তব্যরত ছুটি

নিম্নোক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে কর্তব্যরত ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(ক) পরীক্ষা পরিচালনা।

(খ) সরকারি পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনো আইনসঙ্গত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্ভাব্য সেমিনারে যোগদান।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আদালতের আদেশ বলে আদালতে জুরি বা রাজসাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়া।

(ঘ) পারিশ্রমিক ছাড়া সরকার বা সরকারি সংস্থা বা শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির সভায় সদস্য হিসেবে যোগদান।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা শিক্ষা বোর্ডের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আইনসঙ্গত কোনো সংস্থা বা সমিতিতে যোগদান।

(কে) অসাধারণ ছুটি

(ক) কোনো শিক্ষককে বিধি মোতাবেক ছুটি মঞ্জুর করা সম্ভব না হলে বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজে আবেদন করলে তার অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(খ) অসাধারণ ছুটি ভোগকালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বেতন ও ভাতাদি পাবেন না এবং উক্ত সময়কাল তার চাকরির জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে বিবেচিত হবে না। যে ছুটির সময় বেতন ভাতাদি পাওয়া যায় না তাকে অসাধারণ ছুটি বলে। প্রাপ্য ছুটি না থাকলে অথবা অনুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকলে অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময় (তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে) বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(এল) অবকাশ ছুটি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত দীর্ঘ অবকাশ ছুটি ভোগ করে। যে সকল শিক্ষক অবকাশ ভোগ করে তারা গড় বেতনের ছুটি অর্জন করবে না। তবে শর্ত সাপেক্ষে অর্ধ গড় বেতনের ছুটি অর্জন করবে। অবকাশ ছুটি শুরু হওয়ার পূর্বে শেষ কর্মদিবসে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দিন কর্মস্থলে উপস্থিত থাকা সাপেক্ষে অবকাশকালীন সময় কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে। যে সকল শিক্ষক অবকাশ ভোগ করবেন না তারা সংশ্লিষ্ট বছরের পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করবেন।

১২। ভবিষ্যৎ তহবিল

(ক) প্রত্যেক স্থায়ী শিক্ষকের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা থাকবে। উক্ত তহবিলে প্রত্যেক শিক্ষক তার মাসিক মূল বেতনের ০.১০% এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমপরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে জমা দিবেন।

১৩। সার্ভিস বুক বা চাকরি খতিয়ান বহি প্রত্যেক শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। এ খতিয়ান বহিগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান সংরক্ষণ করলে ভালো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১৪। অবসর গ্রহণের সময়

(ক) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তার বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হলে অবসর গ্রহণ করবেন।

(খ) (১) কোনো শিক্ষকের ৬০ বছর বয়স হওয়ার পরও পরিচালনা পরিষদ তাকে যোগ্য মনে করলে রেজিস্ট্রার্ড মেডিকেল অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শারীরিক এবং মানসিক যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ২ বছর+২ বছর+১ বছর এ নীতিতে মোট পাঁচ বছর তার চাকরিকাল বর্ধিত করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বেতন ও ভাতাদির সরকারি অংশ পাবেন না।

(২) ৬০ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো শিক্ষকের চাকরিকাল একবার ২ (দুই) বছরের অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না এবং প্রতিবার চাকরিকাল বৃদ্ধিতে মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

(৩) ৬৫ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো শিক্ষকের চাকরিকাল কোন ক্রমেই বৃদ্ধি করা যাবে না।

১৫। গ্রাচুইটি

(ক) কোনো শিক্ষকের মৃত্যু হলে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে/দীর্ঘদিনের অসুস্থতার কারণে চাকরি করতে অক্ষম হলে, চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংকুলানের ভিত্তিতে বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে গ্রাচুইটি দেওয়া যাবে।

১৬। যৌথ বিমা

প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জন্য যৌথ বিমার ব্যবস্থা থাকবে। সরকার/শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/প্রস্তাবিত নীতি এবং পদ্ধতি মোতাবেক যৌথ বিমার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিয়োগ পদ্ধতির সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়

১। পত্রিকা বলতে দৈনিক জাতীয় পত্রিকা বোঝাবে। কিন্তু থানা, জেলা বা অঞ্চলভিত্তিক প্রকাশিত বা স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত পত্রিকা গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হবে।

২। **(ক) রেজুলেশন:** বাছাই কমিটি কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের ভাষা বোধগম্য না হলে বা অস্পষ্ট থাকলে বা ঘষামাজা ইত্যাদি জনিত কারণে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

(খ) যিনি সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে বাছাই কমিটিতে কাজ করবেন তার যথারীতি মনোনয়ন থাকতে হবে।

(গ) বৈধ রেজুলেশন: নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে রেজুলেশন বৈধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

১) বিজ্ঞপ্তি ও বাছাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া না হলে।

২) বাছাই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হতে হবে, যেমন— একটি বিষয়ে একজন প্রার্থী উপস্থিত থাকলে তা বিবেচনায় আসবে না।

৩) যে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো, যেমন—ইংরেজি, সে বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের প্রার্থীকে যেমন অর্থনীতি বিজ্ঞাপিত বিষয়ের বিপরীতে নির্বাচন করা যাবে না।

(ঘ) সরকারি প্রতিনিধি: প্রার্থী নির্বাচনের সময় যে বিষয়ে সরকারি প্রতিনিধি সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত থাকবেন তাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক হতে হবে, যেমন— ইতিহাস বিষয়ে প্রভাষক নিয়োগকালে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে ইতিহাস ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে শিক্ষক বাছাই কমিটিতে মনোনয়ন পাবেন না। এমনকি উপরিউক্ত বিষয়ে ইসলামের ইতিহাস থাকলেও। এই নিয়মটি কলেজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩। **অভিজ্ঞতা:** অভিজ্ঞতা গণনার মূল ভিত্তি হলো এমপিওভুক্তি। যে দিন হতে শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়েছে সেদিন তার অভিজ্ঞতা গণনা করা হবে। চাকরিরঅভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এমপিওভুক্তি না হলে পূর্বের চাকরিকাল অভিজ্ঞতা হতে বাদ যাবে।

৪। **নিয়োগ বোর্ড বা কমিটি গঠন:** পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নিয়োগ বোর্ড পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে পারে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে সভাপতি, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বিষয় বিশেষজ্ঞহিসেবে বোর্ডের প্রতিনিধি সদস্য আবশ্যিকভাবে থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নং:শা.-১১/বিবিধ-৩৯/৯৬ (অংশ-১)/৩৪ (৬৫০) শিক্ষা, তারিখ : ১৩-০১-৯৯ইং।

৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে: বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা। নির্দেশক্রমে উপরিউক্ত বিষয়ে উল্লিখিত নীতিমালাটি আংশিক সংশোধনক্রমে ৪(৭) নং ক্রমিকের পর নিম্নোক্ত দুটি ক্রমিক সংযোজন করা হলো। উল্লেখ্য, নীতিমালার অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

(ক) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী বিদ্যমান শিক্ষকেরপদসমূহের মধ্যে ৩০% মহিলা থাকতে হবে।

(খ) ইতোমধ্যে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষকের পদের ৩০% মহিলা না থাকলে মৃত্যুজনিত বা অবসর গ্রহণজনিত বা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্যতার ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ৩০% মহিলা কোটা পূরণ হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা:-১১/৫-১(অংশ)/৫১৬ তারিখ: ১৪-০৫-২০০৯ এর এক প্রজ্ঞাপনে মহানগর ও পৌর এলাকার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মহিলা শিক্ষক পদসংখ্যা মোট পদের ৪০% করা হয়েছে।

বর্তমানে এনটিআরসিএ-র মাধ্যমে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। তাই নিয়োহের ক্ষেত্রে এনটিআরসিএ-র নিয়োগ বিধি/নীতিমালা প্রযোজ্য।

৬.২ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ভূমিকা ও দায়িত্ব

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, দায়িত্ব-কর্তব্য

ব্যানবেইজ সর্বশেষ ২০১৬ খ্রি. 'Educational Survey 2016’ বা শিক্ষামূলক জরিপ ২০১৬ পরিচালনা করে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৬৭,৪৫৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পায়, ২০১৫ সালে যার সংখ্যা ছিল ১,৬২,৫১২টি।

২০১৬ সালে বাংলাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২০,৪৪৯টি যার মধ্যে ৬০২টি সরকারি বিদ্যালয় যেখানে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। ১৯৯৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ১২,০১২টি। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠান প্রতি গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৪৯৮ জন, মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০.১৮ মিলিয়ন (১ কোটি ১৮ লক্ষ) যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫.৪৭ মিলিয়ন (৫৩.৭৭%) এবং নারী শিক্ষার্থীর সূচক ১.১৬%।

ব্যানবেইজের ২০০৪ সালের পকেট বুক অন এডুকেশনাল স্ট্যাটেসটিকস-এর হিসাব অনুযায়ী দেশে ৩১৭টি সরকারি ও ১৭,০৬৯টি বেসরকারিসহ মোট ১৭,৩৮৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যদি মাধ্যমিক স্তরকে শিক্ষা কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে এই কাঠামোর সিংহভাগের অধিকারী (৯৮.১৭%) বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোই প্রকৃতপক্ষে আসল মেরুদণ্ড। এই সব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্ব-স্ব ম্যানেজিং কমিটি (SMC) দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। SMCমূলত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই কমিটি একটি বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে পারে এবং এর ওপর শিক্ষার মান উন্নয়ন বিশেষ করে গুণগত মান উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি নানা কারণে অত্যন্ত দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত, বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একেবারে অকার্যকর। স্কুল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ট আইনকানুন, বিধিবিধান, রুলস-রেগুলেশন, সার্কুলার; ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রকৃতি, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্য, সদস্য সচিব এবং সভাপতির সম্যক ধারণার অভাবের কারণে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা কমিটির এই দুরবস্থা। কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব ও সদস্যবৃন্দের কি কি করণীয়, কিরূপে সেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়, তাদের ক্ষমতা, ক্ষমতার সীমা, স্কুল প্রধানের ক্ষমতা, ক্ষমতার সীমা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়

ম্যানেজিং কমিটি তথা এর সভাপতি, সদস্য সচিব এবং সাধারণ সদস্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

- **ম্যানেজিং কমিটির আইনগত ভিত্তি ও গঠনতন্ত্র :** সরকার আইনের মাধ্যমে (অধ্যাদেশ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলসমূহের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এই শিক্ষা বোর্ডগুলো আবার SMC Regulations,১৯৭৭-এর Regulation-৩ এর মাধ্যমে অধীনস্থ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলগুলোর ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব স্ব-স্ব স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত করেছে। মূলত SMC Regulations,১৯৭৭ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির আইনগত ভিত্তি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালনার গঠনতন্ত্র।
- **কমিটির কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান :** শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন কানুন, বিধিবিধান, রুলস-রেগুলেশনস, সার্কুলার এবং প্রশাসনিক অর্ডার জারি এবং বলবৎ করেছে। এসব আইনকানুন এবং বিধিবিধানগুলো পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে সংশোধন করা হয়েছে। ঝগঈ-এর কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব আইনকানুন, বিধিবিধান অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নিম্নরূপ-

(ক) The Board of Intermediate and Secondary Education (Managing Committee of the Recognized Non-Goverment Secondary Schools) Regulations, 1977এবং এর বিভিন্ন সংশোধনীসমূহ।

(খ) The Recognized Non-Govt. Secondary Teachers Terms and Conditions of Service Regulatons, 1979.

(গ) Conditions of Admission and Transfer of Students Regulations, ১৯৬৬।

(ঘ) বেসরকারি স্কুল শিক্ষক-কর্মচারীর বেতনের সরকারি অংশ ও জনবল কাঠামো সংক্রান্ত নীতিমালা-১৯৯৫ এর পরবর্তী সংশোধনীসমূহ।

(ঙ) BISE Ordinance, ১৯৬১।

(চ) অনুদান মঞ্জুরির গাইড লাইন এবং হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও ফিনানসিয়াল রুলস।

(ছ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ, ২০০৯।

ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা: SMC Regulations, ১৯৭৭-এ কমিটির কাঠামো, গঠন পদ্ধতি, চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব ও অন্যান্য সদস্যগণের নির্বাচন/মনোনয়ন পদ্ধতি, সদস্য ক্যাটাগরি, সদস্য সংখ্যা, সদস্য যোগ্যতা, কমিটির মেয়াদ, কমিটি বাতিল, কমিটির ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা, কমিটির সভা আহ্বান, পরিচালনা, কর্মপদ্ধতি, কোরাম ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক ও আইনগত দিকনির্দেশনা রয়েছে।

স্কুল কমিটির সদস্যপদ, যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা (SMC Regulations, 1977): ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনসহ স্কুলের জন্য সুষ্ঠু নীতি এবং দিকদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সমাজের সুখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি কমিটির সদস্য হতে পারেন। তাকে যথেষ্ট উদ্যোগী, শিক্ষানুরাগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কমিটি যাতে অসৎ, দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত, রাজনৈতিক দলঘেষা টাউট, সন্ত্রাসী ব্যক্তি সদস্য হতে না পারে, সেদিকে লক্ষ লাখতে হবে। স্মরণীয় যে, দুর্জন সর্বদাই পরিত্যাজ্য। কমিটির সদস্য নির্বাচনে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে নিতে হবে যিনি স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা এবং অবদান রাখতে সক্ষম হন। প্রত্যেককে যে উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে এমন নয়, তবে ন্যূনতম একাডেমিক যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণও প্রয়োজন। যোগ্য, গঠনমূলক মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষিত মহিলাকে কমিটিতে সম্পৃক্ত করা সমীচীন। দেশের আইন দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত নন এমন সাবালক ব্যক্তি কমিটির সদস্য হতে পারেন। তিনি অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হবেন এবং স্কুল যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকার বাসিন্দা হবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তি সদস্য পদের যোগ্য হবেন না যদি তিনি—

- ফৌজদারি অপরাধের অপরাধী এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা না পেয়ে থাকেন।
- দেউলিয়া হয়ে থাকেন এবং দায়মুক্ত না হয়ে থাকেন।
- নাবালক, মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি হয়ে থাকেন।
- রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে সহযোগিতা করেন বা জড়িত হয়ে থাকেন।
- চারিত্রিক স্খলনের জন্য আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।
- আর্থিক বা ব্যবসায়ী সূত্রে কমিটি বা স্কুলের সাথে জড়িত থাকেন।
- সভাপতির অনুমতি ব্যতীত পরপর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

ম্যানেজিং কমিটির সভা পরিচালনা: ম্যানেজিং কমিটির গঠনতন্ত্রে সভা পরিচালনা ও কার্যনির্বাহী পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিবিধান ও পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির গঠনতন্ত্রে এমন কিছু নীতিগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে কমিটির কার্যাবলি সম্পাদন ঐ কাঠামোর মধ্যে থেকেই পরিচালনা করা হয়। স্কুলের কিছু উপবিধি/পদ্ধতি থাকতে পারে। তবে এসব উপবিধি, পদ্ধতি অবশ্যই বোর্ডের এতদসংক্রান্ত রেগুলেশনে বর্ণিত বিধানাবলির পরিপন্থি বা বহির্ভূত হবে না। SMC Regulations, ১৯৭৭-এর রেগুলেশন-১২তে সভা আহ্বান, পরিচালনা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

- ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান, তার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান উভয়ের অনুপস্থিতিতে শিক্ষক প্রতিনিধি এবং সদস্য সচিব ব্যতীত অন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচন করবেন।
- পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভায় কোরাম হবে। তবে কমিউনিটি স্কুলের ক্ষেত্রে ৭ জন প্রয়োজন। কমিটি প্রয়োজনে বছরে যতবার ইচ্ছা ততবার কমিটির সভা আহ্বান করতে পারবে। তবে বছরে ন্যূনতম ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। যে কোনো দুই সভার মাঝখানের ব্যবধান ৬০ দিনের বেশি হবে না।
- সদস্য সচিব চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সভার সময়, তারিখ ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করবেন। চেয়ারম্যান নিজের উদ্যোগেও সভা আহ্বান করতে পারেন। সভা আহ্বানের জন্য ৭ দিনের নোটিশ প্রয়োজন হবে।
- চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সদস্য সচিব, অথবা প্রয়োজনে চেয়ারম্যান নিজে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে জরুরি সভা আহ্বান করতে পারেন। ছুটির সময়েও জরুরি সভা আহ্বান করা যায়। তবে জরুরি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদিত হতে হবে।
- ন্যূনতম ২/৩ অংশ সদস্যের লিখিত তলবি নোটিশে, বিশেষ সভা আহ্বান করা যেতে পারে। সদস্য সচিব সভার লিখিত চাহিদা প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এই বিশেষ সভা আহ্বান করবেন।
- সভার নোটিশ আলোচ্যসূচি (এজেন্ডা) আকারে প্রদান করতে হবে। নোটিশে বর্ণিত আলোচ্যসূচি বহির্ভূত কোনো কার্যক্রম সভায় বিবেচিত হবে না, তবে ২/৩ অংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে সভায় আলোচ্যসূচি বহির্ভূত বিষয় বিবেচিত হতে পারে।
- শিক্ষক নিয়োগ, অপসারণ/বরখাস্ত, ছাত্র বহিষ্কার/রাস্টিকেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলো সভার নোটিশে লিখিতভাবে এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত না থাকলে তৎবিষয়ে কোনো আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।
- সভার সভাপতি অথবা যিনি সভায় সভাপতিত্ব করবেন তিনি কোনো ক্ষেত্রে ভোট সমান হলে সেখানে নিজে দ্বিতীয় ভোট বা কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন।

- প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী সদস্য সচিব বাঁধাই করা পাকা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন। প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় স্থায়ী/কমফারমড হতে হবে এবং সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।
- কমিটির সকল সভা স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

- প্রতিনিধিত্ব: স্কুল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই স্কুল কমিটি সর্বদা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্কুলের কল্যাণ এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে কমিটিতে যত অধিকসংখ্যক উৎসাহী, উদ্যোগী এবং গঠনমূলক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে কমিটির জন্য ততই ভালো। কমিটিতে সদস্য সংখ্যা কাম্য মাত্রায় থাকা উচিত। কমিটি ছোট হলে অপ্রতিনিধিত্ব বা অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। আবার বড় হলে মতপার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি হয়, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা ও বিলম্ব ঘটে। কমিটিতে নিম্নলিখিত দল/গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন :]

- জনসাধারণ;
- স্থানীয় সরকার/পরিষদ;
- অভিভাবক;
- প্রাক্তন ছাত্রী;
- শিক্ষকমণ্ডলী;
- স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি;
- স্থানীয় শিক্ষিত মহিলা ইত্যাদি।

স্কুল প্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটির সম্পর্ক: প্রধান শিক্ষক একাধারে স্কুলের প্রধান কার্যনির্বাহী, অন্যদিকে স্কুল ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যানেজিং কমিটিতে পদাধিকার বলে সদস্য সচিব। তিনি কমিটির সদস্য হিসেবে কমিটির পক্ষে সকল কাজ করবেন এবং কমিটির যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। স্কুল প্রধানের সঙ্গে কমিটির সম্পর্ক হচ্ছে পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক। প্রধান শিক্ষক দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করবেন, তিনি প্রতিষ্ঠানের 'একাডেমিক প্রধান' হিসেবে কাজ করবেন। অধিকন্তু প্রধান শিক্ষক স্কুল ও ম্যানেজিং কমিটি; স্কুল ও মন্ত্রণালয়, বোর্ডসহ অন্যান্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ মাধ্যম। প্রধান শিক্ষক স্কুল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, স্কুলের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে, সকল সমস্যার বিষয়ে কমিটিতে তথা কমিটির সভাপতিকে অবহিত করবেন, যথাযথ পরামর্শ দেবেন এবং কমিটিকে সচল ও গতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ করবেন। প্রধান শিক্ষকের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো ম্যানেজিং কমিটিকে কমিটির বিধিগত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং কমিটির সকল কর্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্রগুলোকে সহজতর করে দেওয়া, সহযোগিতা প্রদান করা।

প্রধান শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, স্কুলের প্রশাসনিক কার্যাবলি, একাডেমিক কার্যাবলি, আর্থিক কার্যাবলি, উন্নয়নমূলক কার্যাবলি, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিধান, লেখাপড়ার মান নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনের জন্য ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং বিদ্যালয়ের সকল সম্পত্তির সংরক্ষক। তাই প্রধান শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটির কার্যসম্পাদনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহায়তা দান করা উচিত। প্রধান শিক্ষক/সদস্য সচিব হিসেবে তার কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব নিম্নরূপ :

(ক) কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বান করা;
(খ) কমিটির অনুমোদনক্রমে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন;
(গ) স্কুলের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব তৈরি এবং কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
(ঘ) স্কুল কার্যাবলি সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সভায় উপস্থাপন।

অপরদিকে ম্যানেজিং কমিটি এবং এর সকল সদস্যকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রধান শিক্ষক আইনগতভাবে স্কুলের নির্বাহী প্রধান, একাডেমিক প্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য। প্রধান শিক্ষক স্কুল ফান্ড, মালিকানা সংক্রান্ত দলিল, আইনগত ডকুমেন্টস এবং স্কুল সম্পর্কিত সকল রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (রেগুলেশন-১৬(১))। একাডেমিক প্রধান হিসেবে প্রধান শিক্ষককে স্কুলের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা, ছাত্রছাত্রী ভর্তি, শ্রেণি প্রমোশন, বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় প্রার্থী নির্বাচন, সময়সূচি প্রণয়ন ইত্যাদি দায়িত্বগুলো পালনের একচ্ছত্র এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। কমিটিকে এই সকল ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই হস্তক্ষেপ করা চলবে না। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটি উভয়কে সম্মিলিতভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে একে অন্যের পরিপূরক ও সম্পূরক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, প্রধান শিক্ষক এবং কমিটির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, কলহ, দলাদলি বিদ্যালয়ের সর্বনাশ ডেকে আনে।

ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা : স্কুল পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা এবং তার সীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতার বণ্টন বিবেচনাপ্রসূত হওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় কমিটির নিকট ক্ষমতা অধিক মাত্রায় কেন্দ্রিভূত থাকলে কমিটির স্বেচ্ছাচারিতায় এবং অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের কারণে স্কুলের প্রশাসনিক, একাডেমিক এবং আর্থিক অঙ্গনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, প্রধান শিক্ষক ও কমিটির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সামগ্রিকভাবে স্কুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাই ক্ষমতার সীমা বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা থাকা প্রয়োজন। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন-১৯৭৭ এর রেগুলেশন-১৮তে ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতার বিবরণ দেওয়া হলো-

(ক) স্কুলের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা ;
(খ) শিক্ষকগণের নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ ও বরখাস্ত;
(গ) নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত অন্য ছুটি মঞ্জুর;
(ঘ) উন্নয়ন প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেট ও বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;
(ঙ) টিচার্স কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি;
(চ) ছুটির তালিকা অনুমোদন;
(ছ) কমিটির নিকট উপস্থাপিত স্কুল প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াবলি বিবেচনা;
(জ) ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান ও শিক্ষকগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা;
(ঝ) বিদ্যালয়ের জন্য জমি, ভবন, খেলার মাঠ, বই-পুস্তক, লইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা;
(ঞ) রিজার্ভ ফান্ড, জেনারেল ফান্ড, বিল্ডিং ফান্ড, খেলাধুলার ফান্ড, লাইব্রেরি ফান্ড, পুরস্কার ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ফান্ড, পরীক্ষা ফান্ড, রেনেভলেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
(ট) স্কুলের যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে কাজ করা;
(ঠ) স্কুল ভবন, খেলার মাঠ এবং স্কুলের অন্যান্য সম্পত্তি যথাযথভাবে সংরক্ষণ;
(ড) মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিতভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
(ঢ) স্কুলের কার্যক্রম সন্তোষজনক ও সুচারুরূপে সম্পাদন নিশ্চিত করা;
(ণ) অনাদায়ী ঋণ মওকুফ, ক্ষয়প্রাপ্ত/ব্যবহার অনুপযোগী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি নিষ্পত্তি এবং দায় পরিশোধ করা;
(ত) প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলীর সহযোগিতায় প্রাক-শিক্ষাবর্ষ কনফারেন্স আয়োজন করা এবং পরবর্তী বছরে কার্যক্রম আলোচনা করা;
(থ) সরকার ও বোর্ড কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত রুলস, রেগুলেশন এবং নির্দেশনাবলি আলোকে ম্যানেজিং কমিটি উপরিউক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা বহির্ভূত ক্ষেত্র: ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণকে ম্যানেজিং কমিটির গঠনতন্ত্র/রেগুলেশন ভালোভাবে পড়া দরকার এবং কমিটির ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তৎবিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন। কমিটিকে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, স্কুলে প্রধান শিক্ষক বোর্ডের বিধিমূলে [(রেগুলেশন-১৬)২] স্কুলের একাডেমিক প্রধান। ছাত্রভর্তি, শ্রেণি প্রমোশন, বোর্ড পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী নির্বাচন, সময়সূচি প্রণয়ন এবং অন্যান্য একাডেমিক বিষয় প্রধান শিক্ষকের এখতিয়ারভুক্ত। এসব একাডেমিক বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির হস্তক্ষেপ করা চলবে না। শ্রেণি প্রমোশন এবং বোর্ড পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী নির্বাচন বিষয়ে প্রধান শিক্ষক শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে সভায় বসে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া কমিটি স্কুলের সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে পারবে না অথবা কোনো সম্পত্তির অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারবে না। কমিটির সদস্যগণকে মনে রাখতে হবে যে, তাদের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে কমিটির যৌথ অস্তিত্ব। তিনি কমিটির সদস্য হিসেবে কমিটির পক্ষে সকল কাজ করবেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কমিটির পক্ষে কোনো কাজ করতে পারবেন না।

কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় এবং তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে চলতে হবে। কারণ স্কুল প্রধানের সঙ্গে কমিটির সম্পর্ক হচ্ছে পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক।

ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

SMC Regulation, ১৯৭৭-এর Regulation-৩ (The management of a recognized non-government secondary school shall vest in the committee) মাধ্যমে বেসরকারি স্কুলের এই রেগুলেশন SMC-এর দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকনির্দেশক।

স্কুল ব্যবস্থপনার প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ-

- স্কুলে যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু দায়বদ্ধ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- স্কুলের অবকাঠামো/ভৌত সুবিধার উন্নয়ন;

- স্কুলের প্রশাসন ও ব্যবস্থপনা উন্নয়ন;
- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা উপকরণের সফল বাস্তবায়ন;
- স্কুলের একাডেমিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- শিক্ষকগণের পেশাগদ দক্ষতার উন্নয়ন;
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি, শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কলাকৌশলের মান উন্নয়ন;
- অর্থ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ উন্নয়ন;
- স্কুল কর্মকাণ্ডে সমাজ সম্পৃক্তি/গণঅংশায়নের ব্যবস্থা।

স্কুল ব্যবস্থাপনার উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলোর সুসমন্বিত উন্নয়নই হচ্ছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মৌলিক দায়িত্ব। এই মৌলিক দায়িত্ব/ভূমিকাকে সম্প্রসারণ করলে ম্যানেজিং কমিটির নিম্নলিখিত কর্তব্য ও দায়িত্বগুলো পাওয়া যাবে-

- আইন বলে ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের অভিভাবক এবং যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তির জিম্মাদার তাই কমিটির প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো স্কুলের জন্য মানসম্পন্ন সম্পদ সংগ্রহ এবং যাবতীয় সম্পদসমূহের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- বর্তমানে প্রচলিত এবং সময় সময় প্রচলনযোগ্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত আইন, বিধিবিধান, রুলস-রেগুলেশন ও সার্কুলারের আলোকে সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনা করা। কমিটির গঠনতন্ত্র এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রবিধির সীমার মধ্য থেকে স্কুল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ নীতিমালা, উপবিধি ইত্যাদি প্রণয়ন করা।
- নিয়মিতভাবে ম্যানেজিং কমিটির সভা আহ্বান করা (বছরে ন্যূনতম ৬টি সভা)।
- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে যথাযথ নিয়োগবিধির আলোকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সকল প্রকার চাপ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষকগণের কর্মকাণ্ড এবং বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার গুণগত মান পর্যালোচনা করা এবং উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া। শিক্ষকগণের বিরুদ্ধে বিধিবিধানের আলোকে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া।
- স্কুলের বিভিন্ন ফান্ড/তহবিল যথাযথভাবে সংগৃহীত, সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। সকল হিসাবপত্র, আয়-ব্যয় যথানিয়মে সংরক্ষণসহ স্কুলের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- স্কুলের সকল তহবিল প্রধান শিক্ষক কর্তৃক যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং সকল হিসাবপত্র, আয়-ব্যয় যথাযথ নিয়মে সংরক্ষণ করা হয় কিনা তা নিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের চাহিদা মতো বিভিন্ন রিপোর্ট, অফিস কর্মকাণ্ড সম্পর্কীয় রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি যথাসময়ে যথানিয়মে সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা তা দেখা।
- স্কুলের প্রধান স্কুলের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে এবং কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে কমিটির কাছে প্রয়োজনীয় হালফিল তথ্য উপস্থাপন করা।
- বিগত বছরের ব্যয়ের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য বছর শেষে বিভিন্ন সম্পদ, পরিসম্পদ ও ভৌত সুবিধার জরিপ চালনার ব্যবস্থা করা।
- ম্যানেজিং কমিটি আইনগতভাবে স্কুলের যাবতীয় সম্পদের কাস্টডিয়ান বা সংরক্ষক। তাই মানসম্মত সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন, সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন উপায়, পদ্ধতি, কলাকৌশল বের করে স্কুলের সম্পদ, আর্থিক তহবিল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
- স্কুলের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নসহ উন্নয়ন বাজেট, বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা। অর্থ-উপকমিটি গঠন করা, বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা এবং এসব সাব-কমিটিগুলোর কমকাণ্ড তদারকি করা। স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্যালয়ের যাবতীয় আর্থিক অনিয়মের জন্য ঝগঈএবং প্রধান শিক্ষক আইনগতভাবে দায়বদ্ধ।
- স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সকল প্রকার ভৌত সুবিধা এবং পরিবেশ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ SMC এর অন্যতম দায়িত্ব।
- স্কুলের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আগমন/নির্গমন এ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- স্কুলে বিনোদনমূলক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা করা।
- খেলার মাঠ, খেলার সামগ্রী সংগ্রহ করা, স্কুলের জন্য লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা।
- আর্থিক ক্ষেত্রে যাবতীয় অপচয় ও অনিয়ম রোধের ব্যবস্থা করা।
- বেতনের সরকারি অংশের টাকা ছাড় করার ব্যবস্থা, তা গ্রহণ এবং বিতরণের দায়িত্ব পালন করা। ভুয়া শিক্ষক দেখিয়ে MPO গ্রহণের প্রবণতা বন্ধ করা।

- প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকমণ্ডলী, অভিভাবক এবং কমিটির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ দূর করে স্কুলের স্বার্থে সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- স্কুল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সমাজ সম্পৃক্তি/গণঅংশায়ন নিশ্চিত করা।

গঠনতন্ত্রে কমিটিকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে একটি শক্তিশালী কমিটি বিদ্যালয়ের সামগ্রিক মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান রাখতে সক্ষম।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ ২০০৯-এর ১৯ নং ধারায় পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব ৬টি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রগুলো হলো-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা,

(খ) আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাদি

(গ) লেখাপড়ার মান ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ

(ঘ) শৃঙ্খলা রক্ষা,

(ঙ) উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

(চ) বিবিধ।

৬.৩ অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি

সামাজিক জীব হিসেবে জন্মগ্রহণের পর থেকে মানুষের সামাজিকীকরণ শুরু হয়। ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার আত্মীয়তার বন্ধন যেমন বাড়তে থাকে তেমনি পরিবার থেকে শুরু করে পাড়া, মহল্লা, গ্রাম, ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, প্রদেশ, দেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঘটে। অপরদিকে একই সাথে সমাজের বুকে বিদ্যমান স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গির্জা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে তার অংশগ্রহণ শুরু হয়। যখন সে কর্মক্ষম হয় তখন পেশাভিত্তিক জীবন বন্ধন গড়ে ওঠে এমনকি আন্তপেশার মানুষের সাথে বিস্তৃত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরূপে একজন ব্যক্তি তার জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

Wikipedia-র মতে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি হলো - A parent-teacher association/organization is a formal organization composed of parents, teachers and staff that is intended to facilitate parental participation in a school.

সামাজিকীকরণ ও সর্বজনীনতা লাভের শুরু থেকে একজন ব্যক্তির কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। আর সেই অবলম্বন আসে অভিভাবকের নিকট থেকে। মাথার ওপর ছাতা যেমন মানুষকে রোদ-বৃষ্টির আপদ থেকে রক্ষা করে তেমনি অভিভাবক তার ছেলে-মেয়ে বা পোষ্যকে সামাজিক নানা দায়-দেনা, বিপদ-আপদ ও বালা-মুছিবত থেকে নিরাপদ রেখেঅর্থ সম্পদ ও মনোবল দ্বারা গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

PTA is an organization of local groups of teachers and the parents of their pupils that works for the improvement of the schools and the benefts of the pupils.

অভিভাবক (Gardian)

ব্যাপক অর্থে বাবা, মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, খালা, খালু, শ্বশুর-শাশুড়ি অর্থাৎ রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ আত্মীয়স্বজন এমনকি আত্মীয়তার বন্ধনমুক্ত দত্তক অথবা দরদী ও স্বজন ব্যক্তির সাহায্যপুষ্ট রক্ষা ব্যবস্থাকে অভিভাবক বলে। সীমিত অর্থে আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক বন্ধন ও দায় সমৃদ্ধ পরিচালনা দ্বারা কাউকে গড়ে তুলতে যিনি সদা প্রস্তুত থাকেন তিনিই অভিভাবক। তবে সাধারণ অর্থে বাবা-মাকে এবং অতি নিকট জনকে অভিভাবক বলা হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ, ২০০৯ মতে অভিভাবক হলো-

(অ) কোন শিক্ষার্থীর পিতা বা মাতা

(আ) কোন শিক্ষার্থীর পিতা বা মাতা জীবিত না থাকিলে Guardians and words Acts 1890 (Act no. v111 of 1890) এর বিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তি, অথবা

(ই) কোন নারী শিক্ষার্থী বিবাহিত হইলে তাহার স্বামী, তবে তাহার স্বামী একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হইলে পিতা বা মাতা.

অভিভাবকের প্রকারভেদ (Types of Gardian)

অভিভাবকের শ্রেণিবিভাগ করা কঠিন কাজ। তবে অভিভাবক সাধারণত চার ধরনের হয়ে থাকে। যেমন—

ক) জন্মসূত্রে অভিভাবক,

খ) রক্তের সম্পর্কযুক্ত অভিভাবক;

গ) বৈবাহিক সূত্রে অভিভাবক;

ঘ) সামাজিক ও আর্থিক বন্ধনযুক্ত অভিভাবক। তবে কাউকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ও সতর্ক পরিচালনকারী অভিভাবকের শ্রেণিবিভাগ করা দুরূহ ব্যাপার।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠন ও কার্যাবলি (Formation of PTA and Activities)

বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষেই অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠন করা হয়। হংকং ১৯৯৩ সালে 'Committee on Home School Co-operation (CHSC)' গঠন করে। CHSC- কর্তৃক প্রকাশিত 'Parent-Teacher Association Handbook' অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, অর্থের উৎস, বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ ইত্যাদির একটি গঠনমূলক কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত হ্যান্ডকুক এর থিম (theme) হলো-'Unity of home and school, life with love and care.' বিদ্যালয়, সমাজ ও সমাজের মানুষের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানগত ও আত্মিক বন্ধন তৈরি করে PTA. বিগত শতবর্ষ ধরে নিউজিল্যান্ডের শিক্ষা উন্নয়নে PTA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদের মতে, বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের কেন্দ্রই হলো শিক্ষার্থী। PTA গঠনের মূল উদ্দেশ্যই বিদ্যালয়-শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, যা শিক্ষায় উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

New Zealand এর কৌশলগত শিক্ষা পরিকল্পনায় (Strategic plan) PTA -এর ভূমিকা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

- The Role of Board is to **Govern** the school
- The role of Principal is to manage **The School**
- The Role of **PTA, Parents, Family, and community is to support These** by being involved in the school.

বিদ্যালয়ে PTA-র সম্ভাব্য ভূমিকা/কার্যাবলি (Possible Roles of the PTA in School)

বিদ্যালয়ে PTA যেসকল ভূমিকা রাখতে পারে তা হলো-

- অভিভাবকদের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা
- বিদ্যালয়ের নীতিগঠনে উপদেষ্টার মত সহায়ত করা
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট এবং অভিভাবকভিত্তিক আলোচনায় ভূমিকা রাখা
- বিদ্যালয়ে আর্থিক উন্নয়নে কাজ করা
- সামাজিক কার্যক্রমে বিদ্যালয়কে সংযুক্ত করা
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের অভিভাবক/যাজক (Pastoral) সুলভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া
- বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের মুখপাত্ররূপে কাজ করা।

PTA-র প্রয়োজন কেন (Why have a PTA)

বিদ্যালয়ের বহুমুখী প্রয়োজনে PTA ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি PTA-র মত একটি সংগঠন খুবই কার্যকর হতে পারে। কারণ বিদ্যালয়ে অনেক সময় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার সাথে অভিভাবকদের সংশ্লিষ্টতা থাকে। যেমন- বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মতি বেতন প্রদান না করা, অসদুপায়ের দায়ে শাস্তি প্রদান, বার্ষিক প্রমোশন, বিভিন্ন পরীক্ষায় কর্মফিলাভ, বিভিন্ন দিবস পালন ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে PTA খুবই কার্যকরভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যালয়ে PTA-র ভূমিকাকে নিম্নরূপভাবে শনাক্তকরা যায়। যথা-

- বিদ্যালয়ে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করে
- শিক্ষার্থীর সমস্যা ও শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন বুঝতে সহায়তা করে
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সর্বোত্তম শিক্ষা অর্জন করছে-এ জন্য তাদের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক সহায়তা প্রদান

- অভিভাবকদের ‘অভিভাবক’ হওয়ার সহায়তা করা যার জন্য পৃথিবীতে কোন প্রশিক্ষণ নেই
- অভিভাবক, শিক্ষক ও সম্প্রদায়ককে তাদের আগ্রহ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক আলোচনার সুযোগ করে দেয়া
- বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিয়ে কোন ধরনের কর্মকান্ড চলছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি অভিভাবকদের জ্ঞাত করা
- বিদ্যালয়ের তহবিল বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। যেমন-এককালীন অর্থদান, মাসিক, বার্ষিক চাঁদা প্রদান, কোন সম্পদ দান করা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে অভিভাবক- শিক্ষক সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য (Prime goals) হলো বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের মধ্যে একটি যোগাযোগ জাল (Communication Network) গড়ে তোলা। অভিভাবগণ স্থানীয় অধিবাসী হওয়ায় দ্রুত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে PTA-কে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Gardians and School)

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সামাজিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা যত সহজে দূর করা সম্ভব প্রশাসনিকভাবে তা সম্ভব নয়। কারণ সমাজের মধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান। তাই সমাজের স্পর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেহে সদাসর্বদা লেগে থাকে। অপরদিকে প্রশাসনের হাত লম্বা হলেও সে হাতের মূল থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক দূরে। আর তাই এর স্পর্শ ঘনিষ্ঠ হয় না, আলগা থাকে। ফলে সমাজের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা একটু বেশি। এ চাহিদার সুবর্ণ ক্ষেত্র নিবিড় হয়ে গড়ে না উঠলেও আজ স্কুল ও শিক্ষক এবং অন্যদিকে বাড়ি ও অভিভাবক ও দুয়ের অবস্থানগত সুবিধার কারণে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। এটা সময়ের দাবি। এদের সহযোগিতা শুধু ছাত্র-ছাত্রীর জন্যই কল্যাণকর নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। বাড়ি ও স্কুলে নৈকট্য, শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতা শিক্ষার্থীর প্রয়োজন নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন-শ্রেণিকক্ষে উন্নত পাঠদান, স্কুলে উপস্থিতি, ঝরে পড়ার সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বল কাঠামো ইত্যাদির সমাধান দুপক্ষ মিলেই করতে পারে।

স্কুলের আর্থিক অভাব অনটন কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। শিক্ষক অভিভাবক-মিলে এ সমস্যার সমাধান করা খুবই সহজ। কথায় আছে-‘দশের লাঠি একের বোঝা।’ উন্নত দেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পালনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকাই সিংহভাগ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা জোরদার করার ব্যাপারে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সকল পথ অন্বেষণ করতে হবে। সঠিক পথ ও পন্থা হলো শিক্ষক-অভিভাবক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এবং মিলেমিশে কাজ করা।

শিক্ষার্থীর ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগরণে অভিভাবকের ভূমিকা

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। মূল্যবোধহীন শিক্ষার্থী সমাজের দায়-সম্পদ নয়। শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা একদিকে বাড়িতে এবং অন্যদিকে বিদ্যালয়ে চর্চা করা হয়ে থাকে। সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও লজ্জা দেখানোর শিক্ষা পরিবার থেকেই ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে। অপরদিকে গুরুজনকে সম্মান করা, সমাজের শৃঙ্খলা মেনে চলা, পরার্থে আত্মত্যাগের মনোভাব গড়ে তোলা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্রমের প্রতি আগ্রহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ অর্জন করে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষার প্রথম পাঠ হয় বাড়িতে। বাবা-মায়ের কাছ থেকে শিশুরা সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা জানতে পারে। বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে শিশুরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো পালন করে থাকে। এরূপে গড়ে ওঠে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পাঠ শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষাকে মজবুত করে এবং বিশ্বাসের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তোলে।

সুতরাং বাড়ি ও বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অভিভাবক বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। বরং শিক্ষার্থীর নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে এদের অবদান সমান্তরাল। তাদের এ অবদানের কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলতে শিখে। যেখানে এর সুফল প্রয়োগ দেখা যায় সেখানে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ হয় সুশৃঙ্খল।

অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর প্রতি যেমন অভিভাবকদের দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি শিক্ষকদের প্রতিও অভিভাবকদের দায়িত্ব রয়েছে। তবে ব্যাপারটি একতরফা কিছু নয়, বরং পারস্পরিক। অর্থাৎ শিক্ষকদেরও অভিভাবকদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষ করে অভিভাবককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান ও প্রধান ও শিক্ষকদের ভূমিকা নিতে হবে। এ ভূমিকা কীভাবে নেওয়া যায় সেটিই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে নানা দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

১) শিক্ষক-অভিভাবকের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকের যোগাযোগ ও দেখা-সাক্ষাৎ, মেলামেশা সহজ, সরল ও অবাধ হওয়া প্রয়োজন।

২) শিক্ষক ও অভিভাবক ফোরাম গঠন করা। এ ফোরামে প্রাপ্ত পরামর্শ ও গৃহীত উদ্যোগসমূহকে বাস্তবায়ন করার জন্য যৌথ প্রয়াস গ্রহণ করা।

৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে তাদের সুপরামর্শ মতো কাজ করা।

৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে অভিভাবকদের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের স্ব-স্ব ভূমিকা যথাযথ পালনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা গড়ে তোলা।

৫) অভিভাবকদের পরামর্শ ও সহযোগিতার মূল্যায়ন করা এবং তাদের দায়দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা।

৬) স্থানীয়ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের জন্য অভিভাবকদের নিয়ে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭) শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নয়নের অগ্রগতির জন্য অভিভাবক শিক্ষক মতামত বিনিময় সভা আহ্বান করা।

৮) বার্ষিক ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, বিজ্ঞান মেলা, সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনপূর্বক অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা।

৯) অনুপস্থিতি ও দুর্বল শিক্ষার্থীর ব্যাপারে অভিভাবকদের সাথে সরাসরি ও খোলামেলা আলোচনা করা।

১০) শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতির অগ্রগতির রিপোর্ট কার্ডে অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১১) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডিকে সম্পৃক্ত করা।

১২) বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর করে তোলার জন্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সাথে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা।

১৩) শিক্ষার্থীরা যাতে নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা যাওয়া করতে পারে সে ব্যাপারে সকল অভিভাবকের সদা সতর্ক দৃষ্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ অভিভাবক শুধু তাদের সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হবেন তাই নয় বরং পাড়া-প্রতিবেশীর সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতিও যত্নবান হবেন এবং বখাটে ছেলেমেয়ে যাতে কোনো শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত না করে সেদিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪) বিদ্যালয় গৃহ মেরামত, বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বিদ্যালয়ের সম্পদ ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি অভিভাবকবৃন্দের আগ্রহী করে তুলতে হবে।

১৫) বিদ্যালয়কে স্থানীয় পেশাজীবী মানুষ এবং এলাকাবাসীর গঠনমূলক সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাজের জন্য শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিতে হবে।

সহজভাবে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন

অভিভাবক যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব পালনের কাজকে দুরূহ মনে না করেন সেদিকে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের হাতে এমন কাজ ন্যস্ত করা যাবে না যা তারা বোঝেন না বা করতে পারবেন না। অভিভাবকের কোনো সন্তান দ্বারা বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, লেখাপড়ার উন্নয়নে মতামত গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নে যথাসাধ্য আর্থিক ও সামাজিক সহযোগিতা প্রদান করার কাজ তাদের ওপর দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে তার নিজের ছেলে বা মেয়ে ঠিকভাবে বাড়িতে লেখাপড়া করে কিনা এবং বিদ্যালয়ে যাতে নিয়মিত উপস্থিত থাকে সেদিকে অভিভাবককে বেশি বেশি জড়ানো যেতে পারে। তাছাড়া পথেঘাটে শিক্ষার্থীবৃন্দ বিশেষ করে ছাত্রীরা যাতে কোনো বখাটের উৎপাতের শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য তাদের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব

মানুষ যেমন পরম বিশ্বাসে তার অর্জিত অর্থ নিরাপদ করার জন্য ব্যাংকে হিসাবে রেখে দেয় তেমনি একজন অভিভাবক তার সন্তানকে মানুষ করার প্রত্যয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। বিদ্যালয়ের পাঠোন্নতির জন্য সুপরামর্শ দেওয়া এবং সাধ্যমতো বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া একজন সুঅভিভাবকের দায়িত্ব।শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, সেজন্য রাস্তাঘাট মেরামত ও সংস্কার, রাস্তার মাঝে কোনো নোংরা আবর্জনা না রাখা, বখাটের উৎপাত বন্ধ করার ব্যবস্থা করা, পরীক্ষার সময় পরীক্ষার পরিবেশ যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা, সরকারি যে কোনো উদ্যোগ যেমন-বৃত্তি, উপবৃত্তি, উন্নয়নমূলক কাজ, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম যাতে না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা সকল অভিভাবকের মৌলিক দায়িত্ব।

পরিবেশ উন্নয়ন ও অভিভাবক

বাংলাদেশে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বিশেষ করে রাজনীতির অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ দলীয় রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসনকে কলুষিত করে তুলছেন। ছাত্রছাত্রীরাও রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান, শিক্ষার পরিবেশ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় নানারকম অনিয়ম দেখা যায়। অপরদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষকদের উদাসীনতার কারণে শিক্ষাঙ্গন ও শ্রেণিকক্ষে ধূলাবালি ও ময়লা আবর্জনা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলারঅভাব লক্ষ্য করা যায় যা শিক্ষাঙ্গনকে দৃষ্টিনন্দন না করে দৃষ্টিকটু করে তুলছে। ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ ও আনন্দ পাচ্ছে না, আরামবোধ করছে না। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রানজীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারেন।

৬.৪ একাডেমিক পরিকল্পনা

শিক্ষার কেন্দ্র শিক্ষালয় বা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে ঘিরেই আবর্তিত হয় শিক্ষা কার্যক্রম। বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত থাকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি। বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী জনসাধারণও বিদ্যালয়ের একটি উপাদান। এছাড়া বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন সংস্থাসমূহও বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত থাকে। সঠিক ও সুন্দরভাবে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা একটি দুরূহ কাজ, তবে অসম্ভব নয়। বিদ্যালয় পরিচালনার সাথে জড়িত প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ যদি প্রজ্ঞাবান হন তাহলে বিদ্যালয় পরিচালনা কাজটি সহজ হয়ে যায়।

সঠিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা নির্ভর করে কতকগুলো পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ওপর। যেমন-বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিকল্পনা, শিক্ষাদান পরিকল্পনা, বিদ্যালয়ের সময়সূচি, একাডেমিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান, পেশাগত উন্নয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ, নতুন প্রবর্তিত ধারাবাহিক মূল্যায়নইত্যাদির ওপর।

বিদ্যালয়ের মান অনেকাংশে নির্ভর করে বিষয় শিক্ষক (Subject teacher)-এর ওপর। বিদ্যালয়ের অনেক বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। একজন শিক্ষককে প্রতিদিন একাধিক বিষয়ে পাঠদান করতে হয়। ফলে কোনো বিষয়েই একজন শিক্ষক সম্পূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠেন না। বিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ে কোনো বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। ফলে সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের মান ভালো হয় না।

একাডেমিক পরিকল্পনা (Academic Plan)

কোনো শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক অথবা বিশেষ রাজকীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান হলো একাডেমি। একাডেমির কাজ সুষ্ঠু ও উদ্দেশ্যানুগতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার রূপরেখা একাডেমিক পরিকল্পনা। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার ও পদ্ধতি হচ্ছে কর্মপরিকল্পনা। উৎপাদন বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তেমন একটি লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্যভিত্তিক সার্বিক সাধারণ পরিকল্পনা থাকে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহীতব্য ও সম্পাদিতব্য কার্যাবলির সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত অনুসূচিকে কর্মপরিকল্পনা বলা যায়। এটি করণীয় কাজের একটি সময়াবদ্ধ ছক (Time bound table) ।

An academic master plan is a core component of robust integrated university planning linking visions, priorities, people, services, resources, and the physical institution in a flexible process of evaluation, decision making and action.-Wikipedia

একাডেমিক পরিকল্পনার উপাদান

বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিকল্পনার মূল উপাদান ৩টি। এগুলো হলো—

১. বার্ষিক কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার বা বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ছক
২. দৈনন্দিন ক্লাস রুটিন
৩. পাঠ পরিকল্পনা।

বার্ষিক কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার: বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ছক তৈরির বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো—ছুটির তালিকা, শিক্ষক সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা,পাঠের বিষয়বস্তুর পরিমান, ক্লাসের স্থিতিকাল, কর্মদিবসের সংখ্যা, বিদ্যালয়ের সময়সূচি, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যথা-ছাত্র ভর্তি, রুটিন তৈরি, পরীক্ষা, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিভাবক সভা, শিক্ষক সভা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, বিশেষ কোচিং, বর্ধিত ক্লাস ইত্যাদি।

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ছক (নমুনা)

কাজের ধরন বা আইটেম	কাজের বর্ণনা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	প্রত্যাশিত কর্ম
একাডেমিক/ প্রশাসনিক	রুটিন তৈরি, পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফল প্রকাশ					

দৈনন্দিন ক্লাস রুটিনের নমুনা

শিক্ষক	দিন ঘণ্টা	শনিবার				রবিবার				সোমবার				মঙ্গলবার				বুধবার				বৃহস্পতিবার			

প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক উভয়বিধ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। এজন্য তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের সহায়তা করবেন। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্মিলিত, সকলে মিলেই এগুলো সম্পন্ন করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দেবেন বিদ্যালয়ের প্রধান।

প্রধান শিক্ষক অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বছর শুরু হওয়ার আগেই অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছর শেষ হওয়ার আগেই কতকগুলো কমিটি গঠন করবেন। কমিটিগুলোর উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলকে বুঝিয়ে দিবেন।

প্রধান শিক্ষক নিয়মিত কমিটিগুলোর কাজকর্ম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। বিভিন্ন কমিটির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। প্রত্যেক কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। সম্ভাব্য কমিটির নাম–

১. একাডেমিক কাউন্সিল
২. শৃঙ্খলা কমিটি
৩. রুটিন কমিটি
৪. বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
৫. ক্রীড়া কমিটি
৬. সাংস্কৃতিক কমিটি
৭. মিলাদ কমিটি/ পূজা কমিটি
৮. অর্থ কমিটি
৯. ক্রয় কমিটি
১০. ভর্তি কমিটি
১১. পরীক্ষা কমিটি
১২. জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন,
১৩. হোস্টেল কমিটি (সম্ভাব্য ক্ষেত্র)।

বার্ষিক পাঠ বা শিক্ষাদান পরিকল্পনা (Annual Academic Plan)

পাঠ্যসূচি অনুসরণে রচিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বছরব্যাপী পাঠদান এবং বছরের কোনো মাসে, কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইত্যাদি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাকে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বলা হয়।

কোনো শ্রেণির জন্য নির্ধারিত কোনো বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সারা বছরে সম্পূর্ণটি পাঠদান করে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হলে, আশা করা যায় যে, বিষয়টি ঐ শ্রেণিতে পাঠদানের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পাঠ্যসূচিতে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো যদি সারা বছর পড়িয়ে শেষ না হয় তবে শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণির পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে না। এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন যথাসময়ে শ্রেণি পাঠদান সম্পন্নকরণ, হাতে-কলমে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার লক্ষ্যেই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দরকার হয়।

শিক্ষাদান পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

১. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার অভাবে সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠের অগ্রগতিতে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।
২. আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ের পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। অপরদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বছরের শেষাংশে অসমাপ্ত পাঠ তাড়াহুড়ো করে শেষ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।
৩. এও দেখা যায় যে, একই বিদ্যালয়ে কোনো শ্রেণির কোনো বিষয়ের পাঠ সম্পন্ন করে একাধিকবার পড়ানো হয়েছে, অন্যদিকে কোনো বিষয় একবারও শেষ হয়নি।
৪. পাঠ পরিকল্পনার অভাবে শহরে ও পল্লি এলাকায় শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মাত্রার তারতম্য বেড়েই চলেছে।
৫. পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পঠন পাঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।
৬. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করার ফলে সকল বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন অগ্রগতি হচ্ছে এবং পাঠ অসমাপ্ত রাখার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে।

বার্ষিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

১। প্রথমে বর্ষপঞ্জি, ছুটির তালিকা ও ক্লাস রুটিন দেখে সারা বছরে কোনো বিষয়ে পাঠদানের জন্য কতটি কার্যদিবস পাওয়া যাবে তা হিসাব করে বের করতে হবে। বছরে ৫২ সপ্তাহে ৫২টি শুক্রবার ও ৮৫ দিন নানা উপলক্ষভিত্তিক ছুটি। তাহলে সাপ্তাহিক ও উপলক্ষভিত্তিক ছুটি বাদ দিয়ে থাকে {৩৬৫-(৫২+৮৫)}= ২২৮ দিন। এ থেকে জানুয়ারি মাসে শিক্ষা সপ্তাহ, বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি বাবদ ১২ দিন এবং ডিসেম্বর মাসের দুই সপ্তাহে শ্রেণি বহির্ভূত কার্যাবলি হাতের কাজ, বিতর্ক, অভিনয়, আবৃতি, বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির জন্য ১২ দিন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সুতরাং সারা বছরে ২২৮- (১২+১২) = ২০৪টি কার্যদিবস পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব যে বিষয়ে রুটিনে প্রতিদিন একটি করে পিরিয়ড আছে সে বিষয়ের জন্য সারা বছরে ২০৪টি কার্যদিবস পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে যে সব বিষয়ে সপ্তাহে ৩টি ও ২টি পিরিয়ড আছে এগুলোর কার্যদিবস হবে যথাক্রমে ২০৪-এর অর্ধেক (২০৪/২) = ১০২ এবং (২০৪/৩) = ৬৮ দিন। এভাবে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য কার্যদিবস হিসেব করতে হবে।

২। প্রণিধানযোগ্য যে কেবলমাত্র পাঠদানের জন্য এবং কিছুদিন পাঠ পর্যালোচনার জন্য সবগুলো কার্যদিবস ব্যবহার করা যাবে না। এসব দিবস থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দিন পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করতে হবে। বছরে পরীক্ষার জন্য মোট ১২ + ১২ + ১২ = ৩৬ দিন। ২০১৭ খ্রি. জন্য মাউশি নির্ধারণ করে দিয়েছে অর্থাৎ প্রথম সাময়িক পরীক্ষার জন্য ১২ দিন, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার জন্য ১২ ও প্রাক নির্বাচনি পরীক্ষার জন্য ১২ দিন এবং বার্ষিক পরীক্ষা ও নির্বাচনি পরীক্ষার জন্য ১২ দিন। সুতরাং পরীক্ষার দিনগুলো বাদ দিয়ে মোট শ্রেণি পাঠদানের জন্য কার্যদিবস হলো (২০৪-৩৬) = ১৬৮ দিন। কিন্তু জানুয়ারি মাসের ১২ দিন এবং ডিসেম্বরের শেষ ১২ দিন শ্রেণি পাঠদান বহির্ভূত কার্যাদির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ৩টি পরীক্ষার জন্য মাউশি কর্তৃক নির্ধারিত ৩৬ দিন বিদ্যালয়ের কার্যদিবসের আওতাভুক্ত রয়েছে।

৩। এখন সারা বছরটিকে ৩টি পরীক্ষার জন্য ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে। ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম সাময়িক পরীক্ষার জন্য, ১ মে থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার জন্য এবং ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাউশি-এর ২০১৭ সালের পরিপত্রে নির্ধারণ করে দিয়েছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক ও উপলক্ষভিত্তিক ছুটি বাদে কার্যদিবস হিসাব করে দেখান হলো।

প্রথম সাময়িক	দ্বিতীয় সাময়িক	তৃতীয় সাময়িক
১-১-২০১৭ থেকে ৩০-৪-২০১৭ পর্যন্ত	১-৫-২০১৭ থেকে ১৪-৮-২০১৭ পর্যন্ত	১৫-৮-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭ পর্যন্ত
জানুয়ারি-১৭ দিন ফেব্রুয়ারি-২৪ দিন মার্চ-২৩ দিন এপ্রিল-২৩ দিন	মে-১৮ দিন জুন-০৭ দিন জুলাই-২৭ দিন আগষ্ট-১২ দিন	আগষ্ট-১৩ দিন সেপ্টেম্বর-২৫ দিন অক্টোবর-১৬ দিন নভেম্বর-১১ দিন ডিসেম্বর-১৩ দিন
মোট-৮৭ দিন	মোট-৬৪ দিন	মোট-৭৭ দিন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জানুয়ারি মাসের **১২** দিন পাঠদান বহির্ভূত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য। ডিসেম্বরের শেষ **১২** দিন অন্যান্য কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৪। এবার নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের বার্ষিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রথমত, শিক্ষকবৃন্দ মিলিতভাবে উপরের ক ও খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হিসাব অনুসারে বছরের মোট কার্যদিবস তিনটি সাময়িকীর সময়, পর্যালোচনা এবং পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় ঠিক করবেন।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক শিক্ষক ক্লাসে রুটিন অনুসরণ করে স্ব-স্ব বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং সম্মিলিত সভায় বসে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করবেন।

তৃতীয়ত, ছকের শেষ দুই কলাম পাঠ শেষ করে শিক্ষক পূরণ করবেন।

বার্ষিক শিক্ষাদান পরিকল্পনার একটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো-

বার্ষিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা-২০১৭

ষষ্ঠ শ্রেণি, বিষয়ঃ বাংলা (চারুপাঠ)

সাময়িক পরীক্ষা ও কার্য দিবস	**বিষয়বস্তু/পাঠ**	**পিরিয়ড সংখ্যা**	**পাঠ সমাপ্তির তারিখ**	**মন্তব্য**
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা ১-১-২০১৭ থেকে ৩০-৪-২০১৭ পর্যন্ত জানুয়ারি .... ১৭ দিন ফেব্রয়ারি .... ২৪ দিন মার্চ .... ২৩ দিন এপ্রিল ....২৩ দিন মোট = ৮৭ দিন	শিক্ষা সপ্তাহ, বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির জন্য	১২ দিন		
	গদ্য			
	আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ	৫ ”		
	সততার পুরস্কার	৩ ”		
	রক্তেলেখা মুক্তিযুদ্ধ	৫ ”		
	নতুন দা	৬ ”		
	মাদার তেরেসা	৫ ”		
	সাগর জলের নানা প্রাণী	৭ ”		
	নীলনদ আর পিরামিডের দেশ	৭ ”		
	কবিতা			
	জন্মেছি এই দেশে	৩ ”		
	পরিচয়	৩ ”		
	ওদের জন্য মমতা	৩ ”		
	বাংলা ভাষা	৩ ”		
	সুখ	৩ ”		
	পর্যালোচনা	১২ ”		
	পরীক্ষা	১২ ”		
	মোট	৮৭ দিন		

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা মে .... ১৮ দিন জুন ....০৭ দিন জুলাই ....২৭ দিন আগষ্ট ....১২ দিন মোট = ৬৪ দিন	**গদ্য** এক সূত্রে জানা অজানার সুন্দরবন মহাকবি আলাউল পাখিদের নিয়ে **কবিতা** সকাল প্রিয় স্বাধীনতা ঠিকানা মৈত্রী পর্যালোচনা পরীক্ষা মোট	 ১০ দিন ৫ ” ১০ ” ৬ ” ৩ ” ৪ ” ৩ ” ৩ ” ৮ ” ১২ ” ৬৪ দিন		
তৃতীয় সাময়িক (বার্ষিক) পরীক্ষা আগস্ট ....১৩ দিন সেপ্টেম্বর..........২৫ দিন অক্টোবর ....১৬ দিন নভেম্বর ....১১ দিন ডিসেম্বর ....১৩ দিন মোট = ৭৭ দিন	**গদ্য** পায়ের নিচে এভারেস্ট মহান বিজ্ঞানী জগদীশ জীবনের জন্য গাব্রোভো বাসীর রসরসিকতা ইলেকট্রনিকস এর যাদুর ছোঁয়ায় **কবিতা** নোলক জীবনের হিসাব মানুষ জাতি হে কিশোর শোনো পর্যালোচনা পরীক্ষা মোট	 ৭ দিন ১১ ” ৫ ” ৬ ” ৮ ” ৩ ” ৪ ” ৪ ” ৪ ” ১৩ ” ১২ ” ৭৭ দিন		

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সংশ্লিষ্ট গদ্য কিংবা কবিতা পাঠদানের মধ্যে শব্দার্থ, পাঠ পরিচিত, লেখক পরিচিতি ও অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদানের পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বার্ষিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

১. এরূপ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারের জন্য মহাপরিচালকের অধিদপ্তর থেকে একটি নির্বাহী আদেশ আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের মাধ্যমে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ সংলগ্ন নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য জারি করতে হবে।
২. এরূপ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার পুস্তিকা/নমুনা প্রতি বছর সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং পরবর্তী বছরগুলোর পরিবর্তিত ছুটির তালিকা (সাপ্তাহিক ও উপলক্ষভিত্তিক) এবং পাঠ্যপুস্তকের/পাঠ্যসূচির পরিবর্তনের নিরীখে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার সংশোধন করে ব্যবহার করতে হবে।
৩. এ পরিকল্পনায় জানুয়ারি মাসের **১২** দিন এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ **১২** দিন বিদ্যালয় বহির্ভূত কার্যদিবসের জন্য নির্ধারিত। এ জন্য স্ব স্ব বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বাস্তব সুবিধাদির ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলি শনাক্ত করে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করবেন।
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কর্মকর্তাগণ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণে পাঠদান করা হচ্ছে কিনা এবং বাস্তবে পাঠের অগ্রগতি শ্রেণিকক্ষের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের ব্যবস্থা নেবেন।
৫. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকল্পভুক্ত সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রকল্প কর্মকর্তা, পিটিএ সভাপতি ও জেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ সম্মিলিত সভায় আহ্বান করে স্ব-স্ব দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অবহিতকরণে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন।
৬. প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক মূল্যায়নে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ এবং তদনুসারে শিখনের অগ্রগতিকে একটি অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হবে।
৭. এছাড়া প্রকল্প কর্তৃক করণীয় কার্যাদির সাথে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়ক পদক্ষেপগুলো একই মানদন্ডের নিরিখে গণ্য করতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায় ?

২. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা গঠন উল্লেখ করুন।

৩. বিদ্যালয়ের ধরণ অনুসারে কত ধরণের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হতে পারে ? উল্লেখ করুন।

৪. নৈমিত্তিক ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি কী?

৫. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দুইটি প্রশাসনিক ও দুইটি আর্থিক দায়িত্ব উল্লেখ করুন।

৬. বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ে শিক্ষক-অভিভাবকের ভূমিকা বর্ণনা করুন ।

৭. 'বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান' বিশ্লেষণ করুন।

৮. একাডেমিক পরিকল্পনা কী?

৯. একাডেমিক পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয় কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।

২. ছুটি কী ? 'ছুটি কী অধিকার'- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. বিভিন্ন প্রকার ছুটি বিধি আলোচনা করুন।

৪. বিদ্যালয় পরিচলনায় একজন প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৫. বিদ্যালয় পরিচলনায় শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।

৬. আপনার বিদ্যালয়ের ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করুন।

ইউনিট ৭ : বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই বয়ঃকাঠামোর মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী,পথশিশু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী-এদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারলে ভবিষ্যতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝড়ে পড়া ও গুণগত শিক্ষা অর্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের বহুবিধ চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে করণীয় প্রণয়নে বিষয়বস্তুকে ৪টি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো-

৭.১ জেন্ডার ন্যাযতা ও সমতা টেকসইকরণ এবং গ্রামীন ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠি

৭.২ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী

৭.৩ পথশিশু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

৭.৪ ঝড়ে পড়া ও গুণগতশিক্ষা

৭.১ জেন্ডার ন্যাযতা ও সমতা টেকসইকরণ এবং গ্রামীন ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠি

শিক্ষাক্ষেত্রে একেক সময় কিছু শব্দ এবং শব্দগত অর্থ বিশেষ আলোড়ন তোলে–‘জেন্ডার’ শব্দটি তেমনি বর্তমানে একটি আলোচিত ও আলোড়িত শব্দ। ‘জেন্ডার’ শব্দটি দেশের শিক্ষিত মহলে বহুল পরিচিত। বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণে ‘জেন্ডার বা লিঙ্গ’ বিষয়ে বিষয়গত জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এ শব্দটি আলোচনায় আসার কারণ হলো এর অর্থগত ভিন্নতা। জেন্ডার (Gender) অর্থ লিঙ্গ না হয়ে এটি দ্বারা ‘সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের সৃষ্ট ভূমিকা বা দায়িত্ব’কে বোঝায়। আর লিঙ্গ বোঝাতে 'ঝবী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'Sex'শব্দটি উচ্চারণে এখনও আমরা এক ধরনের লজ্জা অনুভব করি। ১৯৭০ খ্রি.Ann Oakley ‘জেন্ডার’ শব্দটি প্রথম ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন। PROMOTE-প্রকল্পের কল্যাণে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে ‘জেন্ডার’ শব্দটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। PROMOTE জেন্ডার গ্রুপ, জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে। এ ব্যাপারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সচেতন করে।

জেন্ডার কী

অভিধানে ‘জেন্ডার’ শব্দটি কোনো বিশেষ্য বা বিশেষ্যবাচক শব্দের লিঙ্গ বা লিঙ্গহীনতা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গচিহ্নিত করার জন্য যেমন—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে জেন্ডার শব্দের ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সমাজবিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দটিকে ব্যবহার করেন। আর তাই জেন্ডার এবং লিঙ্গকে আপাতদৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও এর ব্যবহারিক পার্থক্য অনেক। সে কারণে জেন্ডার ও লিঙ্গ এ প্রত্যয় দুটির ব্যাখ্যা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্যতা; কিংবা শারীরবৃত্তিয়ভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য–যা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়; সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী-পুরুষের ভূমিকা–যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে/বিভিন্ন হয়ে থাকে।

‘মেয়ে’ বা ‘নারী’ এ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গকে বোঝা যায়। কিন্তু যখন ‘মেয়েলি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় বা বলা হয় তখন তা জেন্ডারকে নির্দেশ করে–যা একজন নারীর লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে আরো অনেক কিছু প্রকাশ করে যা কিনা সামাজিকভাবে সৃষ্ট। কিন্তু জেন্ডার সেক্স/লিঙ্গ এর পরিণতি নয়। কেননা নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য কখনও তার সারাজীবন গৃহকর্মে আবদ্ধ থাকার কারণ হতে পারে না, কিংবা তা তার বাইরের কাজে অংশগ্রহণের জন্য কোনো বাধাও নয়। একইভাবে পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য তার গৃহকর্ম সম্পাদনে কোনো বাধা নয়। এ বাধা বা বিধির সৃষ্টি সমাজে যা কিনা নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র, বিচরণক্ষেত্র, আচরণ, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদিকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে রেখেছে আর এটাই হচ্ছে জেন্ডার। জেন্ডার তাই নারী-পুরুষের মধ্যকার সমাজ সৃষ্ট সম্পর্ক এবং লিঙ্গ হচ্ছে নারী ও পুরুষের জন্মগত বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য।

জেন্ডার সাম্যতা/ন্যায়পরায়ণতা (Gender Equity)

জেন্ডার সাম্যতা বা ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হলো নারী-পুরুষের চাহিদা অনুযায়ী অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্বগত দিক থেকে সমতুল্য সুযোগ যা নারী ও পুরুষের একই ধরণের কাজে ঐতিহাসিক ও সামাজিক সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ দূর করে পরিপূর্ণমূলক স্বচ্ছ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

অন্যভাবে বলা যায়, জেন্ডার সাম্যতা বা ন্যায়পরায়ণতা নারী-পুরুষের চাহিদাকে পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনায় রেখে এমন একটি অবস্থা তৈরি করে যেখানে নারী-পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে সকল অধিকার লাভে সক্ষম হয়।

Gender equity denotes the equivalance in life outcomes for women and men recognizing their different needs and interests, and requiring a redistribution of power and resources, the gaol of gender equity, sometimes called substantive equality, moves beyond equality of oppotunity, by requiring transformative change. It recognizes that women and men have different needs, preference, and interests and that equality of out comes may necessitate different treatment of men and women. [DAC, 1998]

জেন্ডার সাম্য হচ্ছে নারী-পুরুষকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখার একটি প্রক্রিয়া। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষে উন্নয়নের সুফলের ন্যায্য শরিকানা এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানই হচ্ছে জেন্ডার সাম্য। এর অর্থ হচ্ছে যাদের চাহিদার তুলনায় কম আছে, তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে সম্পদের ভাগ দেওয়া এবং প্রয়োজনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারীর সামজিক ও ঐতিহাসিক বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করা। এসব বঞ্চনা এবং অসম ব্যবস্থার প্রভাবে নারী ও পুরুষ সমাজে সমভাবে ভূমিকা পালনে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, জেন্ডার সাম্য হচ্ছে জেন্ডার সমতা অর্জনের একটি সহায়ক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নগণ্য। সরকারি সেক্টরে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নারীর জন্য সংরক্ষিত পদ সৃষ্টি করে কোটা পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ সরকারি খাতে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় নারীর অংশ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটা বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এটি বিশেষ ব্যবস্থা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীগণ যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, সেগুলোর দূর করতে বাংলাদেশ সরকার এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মোর্দাকথা, জেন্ডার সাম্যতার দৃষ্টিতে উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ন্যায় সঙ্গত সমঅধিকার থাকবে। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে সর্বত্র পুরুষের ও নারীর অধিকারের সাম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এসব ক্ষেত্রে বাস্তবতা ও আগ্রহকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে জেন্ডার সাম্য হচ্ছে জেন্ডার সমতা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। জেন্ডার সাম্য অর্থ নারী ও পুরুষের চাহিদা অনুযায়ী অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্বগত দিক থেকে সমতুল্য সুযোগ বা নারী পুরুষের একই ধরণের কাজে ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভাবে তৈরি অসুবিধাসমূহ দূর করে পরিপূরকমূলক স্বচ্ছ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা স্পষ্ট করা- বাংলাদেশে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। কিছু বাস্তব ক্ষেত্রে চাকুরীপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে, সরকার তাই চাকুরীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করেছে যেন একসময় চাকুরীতে পুরুষ-নারীর অনুপাত সমান হয়। সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে সরকারি চাকুরীতে মেয়েরা অনেক এগিয়েছে।

Development Assistance Committee (DAC), 1998 তাঁদের Evaluation of the Thinking and Approaches on Equality Issues'রিপোর্টে জেন্ডার সাম্যতার লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন-Gender equity goals are seen as being more political than gender equality goals, and are hence are generally less accepted in mainstream development agencies.

জেন্ডার সমতা/সমঅধিকার (Gender Equality)

জেন্ডার সাম্য/সম-অধিকার পরিপূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে এবং এর সুবিধাভোগ নারী-পুরুষের সম অবস্থান নিশ্চিত করে। অর্থাৎ এটি সমাজে নারী-পুরুষের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও তাদের সম্পাদিত ভূমিকার সম-মূল্যায়ন করে। এটি তাদের পরিবারে এবং সমাজে সম-অংশীদারিত্বের উপর নির্ভরশীল। মূলত জেন্ডার সমঅধিকার শুরু হয় ছেলে-মেয়ের সমমূল্যায়নের মাধ্যমে।জেন্ডার সাম্য হচ্ছে সমাজে নারী পুরুষের এমন একটি সম অবস্থান যা কিনা তাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিপূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে এবং তার ফল ভোগে সহায়তা করে। অর্থাৎ এটি সমাজে নারী-পুরুষের, নারী-পুরুষের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও তাদের সম্পাদিত ভূমিকার সম-মূল্যায়ন করে। এটি তাদের পরিবার এবং সমাজে সম-অংশীদারিত্বের উপর নির্ভরশীল। মূলত জেন্ডার সম-অধিকার শুরু হয় ছেলে-মেয়ের সম-অধিকার মূল্যায়নের মাধ্যমে।

Gender equality denotes women having the same opportunities in life as men, including the ability to participate in the public sphere. This expresses a liberal feminist idea that removing discrimination in opportunities for women allows them to achieve equal status to men. In effect progress in women's status is measured against male norm. Equal opportunities policies and legeslation tackle the problem through measures to increase women's participation in public life. *[DAC, 1998]*

জেন্ডার সমতা নারী-পুরুষের মাঝে সমতার নীতিতে এ ধারণার উদ্রেক করেছে যে, সমাজে প্রচলিত অনিয়ম ডিঙ্গিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উন্নয়ন ও স্বেচ্ছায় তাদের পছন্দের বিষয় নির্বাচন করতে পারবে। জেন্ডার সমতা হল নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন আশা- আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া ও চাহিদাগুলো একই রকমভাবে বিবেচিত ও মূল্যায়িত হবে। এর মানে এই নয় যে তারা একই স্রোতে মিশে যাবে। প্রত্যেকের নিজস্বতা বজায় রেখে পাশাপাশি অবস্থান করে পরস্পরকে শ্রদ্ধাশীলভাবে সহায়তা করবে।জেন্ডার সাম্যতা (Gender equity)ও জেন্ডার সমতা (Gender Equality) এক কথা নয়। সাম্যতা বা ইক্যুটি থেকে আমরা সমতায় (Equality)আসতে পারি। এর সাথে জড়িত প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতা। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হোটেলে দুপুরে খেতে বসলে সাধারণত দেখা যায় পুরুষ মানুষটি বেশি খাচ্ছে। এখানে সাম্যতার নীতি মানলেও সমতা আনা সম্ভব নয়। কারণ জৈবিকভাবে তাদের যে ভিন্নতা তা অনতিক্রম্য। অন্যদিকে, একই সময়ে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা যদি একই কাজ করে তাহলে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মজুরী দেয়া যাবে না, দিলে তা সাম্যতার বরখেলাপ হবে।

জেন্ডার সমতা ও সাম্যতার পার্থক্য

জেন্ডার সমতা হলো সুযোগের সমতা। অর্থাৎ নারী-পুরুষ বা মেয়ে-ছেলে সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেন কোন বৈষম্যর সৃষ্টি না হয়। আইনগত দিক থেকে- Gender equality is reffered to as formal equality.

Gender equality denotes women having the same opportunities in life as men, including the ability to partipate in the public sphere. Gender equity denots the equivalence in life outcomes for women and men, recognizing their different needs and interests, and requiring a redistribution of power and resources.

জেন্ডার সমতা হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন ও বিকাশ ঘটাতে নারী-পুরুষকে একই সুযোগ সমানভাবে দেওয়া। সহজ কথায়, জেন্ডার সমতার অর্থ হচ্ছে-নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান সুযোগের অধিকার নিশ্চিত করা। এই ধারণার মাধ্যমে বলা হয় যে, নারী ও পুরুষের রয়েছে একই-

অধিকার(Rights): সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত অধিকার অর্জন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জমির মালিকানা, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা পরিচালনা কিংবা চলাফেরার সমান সুযোগ।

সম্পদ (Resources): শিক্ষা, ভূমি, তথ্য ও আর্থিক সম্পদসহ উৎপাদনমূলক সম্পদগুলোর ওপর কর্তৃত্ব অর্জন।

কণ্ঠস্বর (Voice): পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পদ বিনিয়োগ ও বরাদ্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা কিংবা মতামত প্রকাশ করার অধিকার অর্জন। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।" এ ছাড়াও দেশের মৌলিক আইন বলেছে-"রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার থাকবে।" এ কথা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জেন্ডার সমতা থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যায়

১. একজন নারীকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে একটি জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা যায়। একজন শিক্ষিত নারীপরিবারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

২. একজন শিক্ষিত মেয়ে শিশুর মাধ্যমে একটি শিক্ষিত পরিবার গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্কুলে অধ্যয়নরত মেয়ে শিশুর বিবাহিত জীবন দেরি করে শুরু করার ফলে সে কম সন্তানের মা হয় এবং পরিণতিতে মায়ের স্বাস্থ্য সমস্যার আশংকা কমে যায়। এর ফলে মা ও শিশুর জীবনের মান উন্নত হয়।

৩. নারীদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ দেওয়া হলে, বিভিন্ন কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/বৃত্তি নারীরা সমানভাবে পেলে, উৎপাদন মাধ্যমের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ পেলে, কর্মজীবী মায়েদের পর্যাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতা করলে অন্যান্য সুবিধার মধ্যে অন্যতম যে সুবিধা সৃষ্টি হবে, তা হচ্ছে-তারা উৎপাদনমূলক কাজে পুরোমাত্রায় অংশ নিতে পারবেন এবং এ থেকে প্রাপ্ত সুফল কাজে লাগিয়ে তারা জীবন মান উন্নত করার সুযোগ পাবেন। অর্থনৈতিক কাজগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেককে, অর্থাৎ নারীদেরকে পুরোমাত্রায় অংশ নেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হলে তা দেশে দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক হবে।

৪. নারী-পুরুষ তথ্য এবং প্রযুক্তি গ্রহণের সুবিধা সমানভাবে পেলে সমাজের সকল অংশের মানুষ দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে। পরিবারের ও কর্মক্ষেত্রে সহিংস আচরণ থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষা করা হলে তা সার্বিকভাবে সহিংসতার সামাজিক ক্ষতি ও অর্থনৈতিক মাশুল দুই-হ্রাস করতে পারে।
৫. নারী ও কিশোরীদের জনপরিসরে চলাফেরা স্বাধীনতা দেওয়া হলে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারবেন। এর ফলে তারা আয় বর্ধনমূলক কাজ গুলোতেও অংশ নিতে সক্ষম হবেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাবেন যা তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করতে সহায়ক হবে। সর্বোপরি, তারা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন যা তাদের জীবনমান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে।
৬.

জেন্ডার ন্যাযতা ও সমতা টেকসইকরণের উপায়

বিদ্যালয়ে জেন্ডার ন্যাযতা ও সমতা টেকসইকরণে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেওয়া যায়—

১. শিক্ষকদের জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা দানের জন্য ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা করা;
২. জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ প্রদান;
৩. শিক্ষকদের মানসিকতায় পরিবর্তন;
৪. জেন্ডার সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা;
৫. বিদ্যালয়ে ৪০% মহিলা কোটা পূরণ করা;
৬. প্রধান শিক্ষকের উদার দৃষ্টিভঙ্গি;
৭. শিক্ষার জন্য Gender 'Friendly Environment' বন্ধুত্বভাবাপন্ন পরিবেশ তৈরি।

গ্রামীন ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠি

বাংলাদেশ একটি জনবহুল গ্রামপ্রধান দেশ। দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যায় ঘনত্ব খুবই বেশি। বর্ধিত জনসংখ্যার ভারে বাংলাদেশের উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক খাতসমূহ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়ন করতে পারছে না। অন্যদিকে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে রয়েছে প্রকট বৈষম্য। দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০/৭৫ ভাগ গ্রামে বাস করে। কিন্তু উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের সামান্য অংশই ব্যয় হয় গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার হার দ্রুত বাড়লেও গ্রাম ও শহরে শিক্ষার হারের পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়ে ১৯৯২ সাল থেকে কার্যকর হলেও তার প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায় নি। নিচের উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

প্রাইমারি শিক্ষার সাফল্যের ওপর নির্ভর করে মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য। কারণ প্রাথমিক শিক্ষার আউটপুট (Out put) হলো মাধ্যমিক শিক্ষার ইনপুট (In put)। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষায় কোনো সমস্যা থাকলে মাধ্যমিক শিক্ষায় তার প্রভাব পড়বেই।

গ্রামীণ এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষায় অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং তাদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ অসচেতন হওয়ায় তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নন। আবার এসব অভিভাবক ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তারা গররাজি থাকেন। অন্যদিকে বিদ্যালয় ও শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কিত ব্যয় সম্পর্কেও তারা উদাসীন থাকেন। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় বেতন ও অন্যান্য ফ্রি, যাতায়াত খরচ, টিফিন, পোশাক, বই-পুস্তক, সুষম খাদ্য, বাড়তি টিউটর রাখা ইত্যাদি খাতে তারা খরচের ব্যাপারে কার্পণ্য করে থাকেন।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। এ সময় প্রযুক্তিগত বিনোদন গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। টিভি, ইন্টারনেট,ভিডিও গেম ও গ্রামীণ সকল খেলা তাদের হাতের নাগালে। ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যাতায়াত পথে যেকোনো খেলায় নিমগ্ন হতে পারে। ফলে তাদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

গ্রামীণ মাধ্যমিক শিক্ষার অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা যায়—

১. বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব।
২. শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব।
৩. শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সহায়ক পরিবেশের অভাব। যেমন–বৈদ্যুতিক পাখা, বাতি, জানালা, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি।
৪. বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকা।
৫. শিক্ষকদের নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা।
৬. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।
৭. শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব।
৮. নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত না হওয়া।

৯. পাঠে উপকরণ ব্যবহার না করা।
১০. পাঠ পরিকল্পনা ও পদ্ধতি মোতাবেক পাঠদান না করা।
১১. একাডেমিক তত্ত্বাবধান না থাকা।
১২. শ্রেণিতে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকা।
১৩. শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতির অভাব।
১৪. অভিভাবকগণ শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী না হওয়া।
১৫. শিক্ষক-অভিভাবক মতবিনিময়ের বা যোগাযোগ না থাকা।
১৬. বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির তদারকি না থাকা।
১৭. গ্রামে যত্রতত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
১৮. লাইব্রেরি, বিজ্ঞানাগার না থাকা।
১৯. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গ্রামীণ বিদ্যালয়ের প্রতি উদাসীনতা।
২০. শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধাদান ইত্যাদি।

গ্রামীণ মাধ্যমিক শিক্ষার অসুবিধা দূর করার উপায়

সমস্যা থাকলে তার সমাধানও থাকবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সকল সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে এর সমাধান অসম্ভব নয়। গ্রামীণ মাধ্যমিক শিক্ষার সমাধানকল্পে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা হলো—

১. বিদ্যালয়ের ভৌত ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন।
২. জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন।
৩. বিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা সামগ্রীর সংস্থান করা।
৪. উপযুক্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা।
৫. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটিকে সক্রিয় করা।
৭. শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন করা।
৮. শিক্ষার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতন করা।
৯. পাঠদানের মান উন্নয়ন দ্বারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
১০. বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করা।
১১. বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণকে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি।

শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী (Poor People of Urban Region)

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ শহরে বাস করে। স্বাধীনতার পর এদেশের জনসংখ্যার ২০% গ্রামে বসবাস করলেও বর্তমানে তা অনেক বেড়েছে। আশির দশকে বাংলাদেশের জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সময় ঘটে যায় এক ধরনের বিপ্লব। সাবেক ২১টি জেলা পরিণত হয়েছে ৬৪টি জেলায়। উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় নাগরিক সুবিধা পৌঁছে গেছে মানুষের হাতের নাগালে। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিস্তার না ঘটায় শহরমুখী জনস্রোত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকা, নদী ভাঙন, ফি বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রামের লোকজন কর্মসন্ধানে দ্রুত শহরমুখী হচ্ছে। গ্রামের জনগোষ্ঠীর পরিবার প্রতি জনসংখ্যার আধিক্য ও তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠী আশ্রয় নিচ্ছে নিকটবর্তী কিংবা বড় বড় শহরে। শহরে জীবনযাপন ব্যয় গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে গ্রাম থেকে আগত জনগোষ্ঠী শহরের নিম্ন আয়ের এলাকা বা বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এ সকল বস্তিতে কোনো নাগরিক সুবিধা নেই বললেই চলে। যেখানে জীবনধারণই বড় কথা সেখানে শিক্ষার বিষয়টি একেবারেই গৌণ।

বাংলাদেশের বড় শহরগুলো যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, যশোরসহ অন্যান্য শহরগুলোতে মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আশি লক্ষ থেকে এক কোটির বেশি। এ জনগোষ্ঠীর আবার একটি বড় অংশ বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থী। এ সকল জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে রয়েছে। যেহেতু তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য নয় সেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষার হারও অনুন্নত।

শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার অসুবিধাসমূহকে নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা যায়-

১. **শিক্ষার অধিক ব্যয়:** শহরে শিক্ষার ব্যয় গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রাম থেকে যারা শহরে আসে তারা এমনিতেই দরিদ্র। আবার অনেকেই শহরে আসে নিঃস্ব হয়ে। ফলে তারা যা আয় করে তা দিয়ে জীবনযাপনের খরচ শেষে শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়, টিউটরের বেতন ইত্যাদির খরচ জোগাতে না পেরে তার পড়ালেখা বন্ধ করাকেই অভিভাবকগণ শ্রেয় বলে মনে করেন।

২. **অভিভাবকদের নিম্ন আয়:** শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দৈনিক বা মাসিক আয় খুব বেশি নয়। রিকশা চালানো, ঠেলা-গাড়ি চালানো, মজুর খাটা, ঝিয়ের কাজ করা, গার্মেন্টস শিল্পে কম মজুরির চাকরিতে তারা নিয়োজিত থাকে। ফলে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. **শিক্ষার ব্যাপারে অজ্ঞতা:** দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষার গুরুত্ব ভালো মতো বুঝতে পারে না। একজন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে কাজে পাঠানোকেই তারা উত্তম বলে মনে করেন। দীর্ঘমেয়াদি লাভের চেয়ে স্বল্পমেয়াদি লাভই তাদের কাম্য।

৪. **শিক্ষার পরিবেশের অভাব:** শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেসব এলাকায় বাস করে সেখানে শিক্ষার কোনো পরিবেশ থাকে না। অল্প জায়গায় বেশি মানুষ গাদাগাদী করে বাস করে। চিৎকার, হইচই সব সময় লেগেই থাকে। এছাড়া অনেক বস্তিতে মাদকদ্রব্য সেবনসহ নানারূপ নেশার আড্ডা জমে। ফলে শিক্ষায় পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।

৫. **বিদ্যালয়ের অভাব:** শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কোনো বিদ্যালয় নেই যেখানে তারা কম খরচে বা বিনা খরচে পড়ালেখা করতে পারে। শহরের নামি বা ভালো স্কুলগুলোতে তারা ভর্তি হতে পারে না। ফলে ইচ্ছে থাকলেও স্কুলের অভাবে তাদের পড়াশোনা করা সম্ভব হয় না।

৬. **উদ্যোগের অভাব:** যেকোনো কাজের সফলতা আসে যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ সেখানে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই। তাদের সমস্যা ও সমাধানে কোন বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনো পদক্ষেপ নিলেও অনেক ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয় না।

৭. **প্রকৃত তথ্যের অভাব:** শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা কত, তারা কোন কোন এলাকায় বসবাস করছে, তাদের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার হার কত, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত, এদের মধ্যে কতজন ছেলে, কতজন মেয়ে, কতজন বিদ্যালয়ে যায়, কতজন যায় না, বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ কি–এরূপ কোনো সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান না থাকায় কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় না।

৭.২ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী

যেকোন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদানশিক্ষার্থী তাদের কেন্দ্র করেই যাবতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতাগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। এই শিক্ষার্থীদের সকলেই একই মেধা, যোগ্যতা ও সুবিধাপ্রাপ্ত তাও নয়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক, মানসিক ও দূর্ঘটনার কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। একজন সাধারণ পথশিশুর শিক্ষা চাহিদা আর প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা চাহিদা এক রকম নয়। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চাহিদার ভিন্নতা মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বিশেষ সমস্যা। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর ধারণা

অনেক ধরনের চাহিদা-সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া বা ক্লাসে পাঠ পরিচালনাকালে এমন অনেক শিক্ষার্থীরা দেখা যায় যারা অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় আলাদা। এ সকল শিক্ষার্থীরা দেরিতে বোঝে, উদাসীন থাকে, শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে না, বয়সের সাথে ভাষা দক্ষতা কম, বিক্ষিপ্ত আচরণ করে ইত্যাদি।

সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্নতর চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদেরকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী বা ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থী বলে বিবেচনা করা হয়। এমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চাহিদাও ভিন্ন হয়ে থাকে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অনেকে আছে বুদ্ধি সমস্যা সম্পন্ন শিশু। এছাড়াও রয়েছে কম বোঝার সমস্যা থেকে চরম সমস্যা, কম দেখার সমস্যা থেকে একবারে অন্ধ শিশু, কম শোনার দক্ষতা থেকে একদম না শোনার অসক্ষমতা, মৃদ ভাষার দক্ষতা থেকে বলতে না পারার অক্ষমতা। এদেরকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বলা হয়ে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, প্রতিভাবান শিক্ষার্থী, বিচ্যুত আচরণ বা অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থী, পথশিশু শিক্ষার্থী, বস্তিবাসী শিক্ষার্থী, চা বাগানের শিক্ষার্থী, পাহাড়ী এলাকার শিক্ষার্থী সবাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী। যাদের শিক্ষা চাহিদায় রয়েছে বিভিন্নতা। যেমন অনগ্রসর বা স্বম্প বুদ্ধির শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয় তেমনি প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বাড়তি চাহিদা পূরণে অতিরিক্ত কাজের পরিকল্পনা ও ভিন্ন কৌশলের প্রয়োগ করতে হয়। তাই প্রয়োজন বিশেষ পাঠ পরিকল্পনা ও শিখন-শেখানো পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর কথা হলে সাধারণভাবে অনেকেই মনে করেন শিক্ষার্থী বা শিশুটি কী কী করতে পারে না। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী মানে শুধু "না পারার সমষ্টি না" বরং তারও সামর্থ্য ও সক্ষমতা রয়েছে এবং সে ভিন্নভাবে সক্ষম। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকাটা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধী নয়-বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী

সাধারণভাবে সমাজে অন্ধ, কানা, বোবা, খোড়া, পাগল, কালা, ঠসা ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত আছে যা প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহার করা হয়। যে ব্যক্তির যে সমস্যা আছে তাকে ঐ নামে অনেক ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয়। এ সকল শব্দ নেতিবাচক অর্থ বা দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে এবং যাকে এই নামে সম্বোধন করা হয় সে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। এ জন্য বিশেষ চাহিদার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় আনতে সমস্যা হয় এবং তারা শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ে। এই সকল শিশুদের প্রতিবন্ধী বলা হলেও প্রতিবন্ধী শব্দটিতে নেতিবাচক ধারণা পাওয়া যায়। কোন কাজ করার ক্ষেত্রে এ সকল শিক্ষার্থীদের বাধা আছে বলেই তারা প্রতিবন্ধী । তবে তারা পারে না তা গুরুত্ব দিয়ে বলা যায় না। তাদের ভিন্নভাবে কাজ করার সামর্থ্য ও বিশেষ চাহিদা আছে। তাই তারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী। তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলে তারাও অন্যদের মত সাধারণ জীবন-যাপন করতে পারে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ কারণে এসব শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধী বা অন্যান্য নেতিবাচক শব্দে বিশেষায়িত না করে 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' শিক্ষার্থী বলে অভিহিত করা প্রয়োজন যার ফলে সকলের মাঝে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী
খ) অপরাধ প্রবণ শিক্ষার্থী
গ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী
ঘ) ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী
ঙ) অনগ্রসর শিক্ষার্থী

ক) প্রতিবন্ধীশিক্ষার্থী: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একটি শ্রেণি হল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বাভাবিক বা পরিপূর্ণ নয় । যেমন কেউ হয়ত চোখে কম দেখে, কারো বাক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কারো শ্রবণশক্তির সমস্যা আছে, কারো শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিকাশ স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। আবার এমনও আছে যাদের মেধার বিকাশ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। এদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বলা হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যেমন-

১. শারীরিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী
২. দৃষ্টিগত সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী
৩. শ্রবণ সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী
৪. বাক্ সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী
৫. আবেগিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী

এসকল শিক্ষার্থীদের যারা মধ্যে যারা মৃদু প্রতিবন্ধী তারা সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে লেখাপড়া করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ আগ্রহ ও সহযোগিতা। এছাড়াও যে সকল শিক্ষার্থী বেশি মাত্রায় প্রতিবন্ধী তারা বিশেষ স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যেখানে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।

১) **শারীরিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী:** শারীরিক অক্ষমতা বা শারীরিক বিকলাঙ্গতাকে শারীরিক সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। এই অক্ষমতা বা বিকলাঙ্গতা পোলিও, শিশুকালীন পুষ্টির অভাব, নানা রকম দূর্ঘটনা বা জন্মগতভাবে ত্রুটির কারণে দেখা যায়। এই অক্ষমতা জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য কাজ এমনভাবে বাধাগ্রস্থ হয় যে তাদের বিশেষ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধার প্রয়োজন পড়ে। এই ধরনের শিক্ষার্থীরা শারীরিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী। হাতের বিকলাঙ্গতা জন্য লিখতে অসুবিধা হয়। পায়ের সমস্যার জন্য চলাফেরা ও সিড়িঁ ব্যবহার করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। মেরুদন্ডের হাড়ের অধিক বৃদ্ধির জন্য বসতে অসুবিধা হয়। আবার কুঁজো হওয়ার কারণেও শিক্ষার্থীদের চলাফেরা সীমিত হয়ে যায়। শরীরের ওজন, বইয়ের ব্যাগ বহন করতে অসুবিধা বোধ করে।

২) **দৃষ্টিগত সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী:** দৃষ্টি সমস্যা হচ্ছে কোন শিক্ষার্থীর দুচোখেরই কমবেশি দেখার সমস্যা। তারা স্বাভাবিক মানুষের চাইতে কম দেখে বা একেবারেই দেখতে পায় না। তাদের এই দৃষ্টি শক্তির ক্ষতিগ্রস্থতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাই স্বাভাবিক জীবনধারাকে বাধাগ্রস্থ করে পরনির্ভরশীল করে তোলে। যাদের স্বল্প দেখার সমস্যা আছে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ালেখা করতে পারে। আর যারা একেবারেই দেখতে পারে না তাদেরকে বিশেষ স্কুলে ভর্তি করে পড়ালেখার ব্যবস্থা করা যায়। স্বল্প দৃষ্টির শিক্ষার্থীরা কোন কিছু দেখার সময় কাছে নিয়ে দেখে। পড়ার সময় বই কাছে চোখের কাছে নিয়ে আসে। চোখ বড় বড় করে তাকায়। ভ্রু কুঁচকায় বা উপর-নিচ করে থাকে। কিছু পড়তে দিলে ভুল পড়ার সম্বাবনা থাকে। পড়ার গতি অন্যদের তুলনায় কম হয়। অল্পতেই মাথা ব্যথা শুরু হয়। ক্লাসে বোর্ডের লেখা স্পষ্ট

দেখতে পারে না। এ কারণে মুখে শব্দ করে বড় বড় অক্ষরে বোর্ডে লিখতে হবে। ফলে স্বল্প দৃষ্টির শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কী লেখা তা সহজে বুঝতে পারে না। দর্শন ত্রুটির কারণে এই শিক্ষার্থীরা কালার ব্লাইন্ড হয়ে থাকে। এরা ক্লাসে ও ক্লাসের বাহিরে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না, হোঁচট খায়। অন্যের সাহায্যে নিয়ে থাকে বা সাদাছড়ি সাহায্য নিয়ে চলাফেরা করে। যারা দৃষ্টিশক্তি অধিক মাত্রায় হারিয়েছে তাদেরকে বিশেষ স্কুলে *ব্রেইল পদ্ধতিতে* শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করা যায়। এমন শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রবণ নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ যেমন- অডিও, টেপরেকর্ডার, সাউন্ড বক্স ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

৩) **শ্রবণ সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী:** শোনার সমস্যা শ্রবণ সমস্যা নামে পরিচিত। একই মাত্রার শব্দ যা অন্যেরা শোনে, শ্রবণ সমস্যা-সম্পন্ন শিশুরা তা শুনতে পায় না। খুব কম সংখ্যক শ্রবণ প্রতিবন্ধী আছে যারা কিছুই শুনতে পায় না। অধিকাংশই কিছু না কিছু শুনতে পায়। শ্রবণ সমস্যার জন্য যদি কোন শিক্ষার্থী অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বা স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্থ হয়, তবে সেই শিক্ষার্থীকে শ্রবণ সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলা হয়। এমন শিক্ষার্থীদের প্রধান সমস্যা হল ভাবের আদান-প্রদানের সমস্যা। যেহেতু তারা বক্তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় না তাই কী উত্তর করবে সেটাও ঠিক মত বুঝতে পারে না। শিক্ষকের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে অসুবিধা বোধ করে। এ ধরণের শিক্ষার্থীরা কোন আলোচনা থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের জন্য দর্শনমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উত্তম। যেমন-কোন বিষয় উপস্থাপনে ছবি, মডেল, মানচিত্র ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া যায়। কোন কিছু লিখিতভাবে পড়তে দেওয়া যায়। যেমন- পাঠ্যবই, ম্যাগাজিন, হ্যান্ডনোট ইত্যাদি। অনেক সময় বোঝার সুবিধার্থে বার বার প্রশ্ন করে থাকে। বক্তা কিছু বললে তার মুখের দিকে কান পেতে কথা শুনতে চেষ্টা করে। এমন শিক্ষার্থীদের ক্লাসে প্রথম সারিগুলোতে বসতে দিতে হয়। যেন শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর ভাল যোগাযোগের স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে হেয়ারিং ডিভাইস অনেক বেশি ফলপ্রসূ। শ্রবণ সমস্যাজনিত কারণে তাদের ভাষা বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়ে মিসকমেউনিকেশন হয়ে থাকে।

৪) **বাক্ সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী:** কথা বলতে না পারা বা কথা বলতে অস্পষ্টতা বাক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত। এই ধরনের অবস্থায় জন্য তার দৈনন্দিন জীবনধারণ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাই বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধার প্রয়োজন পড়ে। এ ধরণের শিক্ষার্থীরা ঠিকমত যোগাযোগ করতে পারে না বিধায় অন্যান্য শিক্ষার্থীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং শ্রেণিকক্ষে চুপচাপ থাকে। দলগত কাজে স্বতংস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বোবা, তোতলা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য বুঝতে না পারলেও প্রশ্ন করতে চায় না, সংকোচ বোধ করে।

৫) **আবেগিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী:** এরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত আচরণ করতে পারে না। সমবয়সের শিক্ষার্থীদের আচরণের চেয়ে কম বয়সের শিক্ষার্থীদের মত আচরণ করতে দেখা যায়। স্বল্প বুদ্ধির প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখনের গতি তুলনামূলক কম হয়ে থাকে। এদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়, ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারে না, বিষয়বস্তুর প্রতি অনাগ্রহ দেখা যায়, ভাবলেশহীনভাবে তাকায়, কৌতূহল প্রবৃত্তি দেখা যায় না। ক্লাসের সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা করতে পছন্দ করে না, ক্লাসে আত্মকেন্দ্রিক এবং বয়সে ছোট শিক্ষার্থীদের সাথে খেলাধূলা ও মেলামেশা করতে পচ্ছন্দ করে।

খ) অপরাধ প্রবণ শিক্ষার্থী: অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থী বলতে তাদের বোঝায় যারা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পরিপন্থী কাজ করে থাকে। এমন শিক্ষার্থীরা সাধারণ একটু চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজে নানাবিধ উশৃঙ্খল আচরণ করে যা প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতির পরিপন্থী। এমন শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় জেদি প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিশোর বয়সে অর্থ্যাৎ ১২-১৯ বছর এই অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়। কিশোর বয়সে চুরি করা, মারামারি করা, ভালবাসা নিবেদন করা, ইভ টিজিং করা, অন্যদের উত্যক্ত করা, স্কুল পালানো, নেশাগ্রস্থতা, মাদকাসক্ত হওয়া, আক্রামণাত্মক ভাব, অবাঞ্চিত আচরণ করা ইত্যাদি এই বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যাদের মধ্যের এই প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করা যায় তাদেরকে অপরাধ প্রবণ শিক্ষার্থী বলা হয়।

গ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী: উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ ধরনের মানসিক চাহিদার জন্য বিদ্যালয়ে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণর যাদের বুদ্ধাঙ্ক ১১০ এর উপর তাদের উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থী বলা হয়। ১১০ থেকে ১২০ পর্যন্ত বুদ্ধাঙ্ক সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে তেমন সমস্যা করে না। যাদের বুদ্ধাঙ্ক ১২০ এর উপরে তাদের সমস্যা ভিন্নতর। আগে এদের নিয়ে তেমন চিন্তা না করলেও বর্তমানে এসব শিশুদের নিয়ে ভাবা হচ্ছে। এদের দৈহিক বিকাশ খুব তাড়াতাড়ি হয়। এরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে হাঁটতে শেখে। ভাষা বিকাশ দ্রুত হয় এবং শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে শেখে। এরা পড়তে ও গণনা করতে শিখে তাড়াতাড়ি। অল্প বয়সে যুক্তিসম্পন্ন কথা বলে। অনেক সময় বয়সে বড় ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করে।

ঘ) ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী: সাধারণত যে সব শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক ৭৫-এর নীচে তাদের ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলা হয়। এই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ও সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

বুদ্ধাঙ্ক ২৫ বা ৩০-এর নিচে তারা জড় বুদ্ধি সম্পন্ন

বুদ্ধাঙ্ক ৫০-৫৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে তারা বোধহীন

বুদ্ধাঙ্ক ৭০-৭৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে তারাস্বল্প/ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন ।

যারা জড় বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের শিক্ষার তেমন সুযোগ থাকে না। কারণ জন্মাবস্থা থেকেই এদের জীবনে সমস্ত অক্ষমতা দেখা যায়। তারা বিদ্যালয়ের আসার সুযোগ পায়। বোধহীন শিক্ষার্থীদের জীবনে চলার জন্য কিছু কৌশন শেখানো যায়। এ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণযোগ্য বলে মনে করা হয়। স্বস্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গতি মন্থর হয়ে থাকে। মনোবিদরা এমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করছেন। এমন শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশের হার স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে কম থাকে। ভাষার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ধীর গতির হয়। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণের ত্রুটি দেখা যায়। নতুন জিনিস জানার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় না। অর্থ্যাৎ কৌতূহল প্রবৃত্তি কম থাকে।

ঙ)অনগ্রসর শিক্ষার্থী: শিক্ষার্থীদের মানসিক বা বুদ্ধির দিক থেকে তিন শ্রেণিতে যেমন-সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন আবার শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাগত অগ্রগতির দিক বিবেচনায়ও তাদের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেসব শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে গড় ফলাফল বজায় রাখতে পারে তাদেরকে সাধারণ অগ্রগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলা হয়। আর যাদের ফলাফল সাধারণের অগ্রগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি এবং দ্রুত ও অধিক পরিমাণে হয় তাদের অগ্রসর শিক্ষার্থী বলা হয়। অন্যদিকে যেসব শিক্ষার্থী ক্লাসের সাধারণ অগ্রগতি ধারা থেকে পিছিয়ে পড়েছে তাদের অনগ্রসর শিক্ষার্থী বলা হয়। বিশেষজ্ঞগণ অনগ্রসরতার জন্য বৌদ্ধিক স্বল্পতাকে চিহ্নিত করে থাকেন। তাঁদের মতে ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা ঠিক নয়। শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতা বুদ্ধীহীনতার জন্য হতে পারে, তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। সামাজিক ও পারিবারিক কারণেও শিক্ষার্থীরা অনগ্রসর হয়ে থাকে। যে শিশু তার বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক শিক্ষাস্তরের এক বছর নীচের জন্যও যোগ্য নয় সেই অনগ্রসর শিক্ষার্থী। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা যায়। চোখ ও কানের সমস্যার জন্য শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুসরণ করতে না পারায় তারা অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। ভয়, আশঙ্কা, ভীরুতা ইত্যাদির প্রক্ষোভিক কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা দেয়। পারিবারিক কারণেও শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। গৃহে পড়ালেখার সুযোগের অভাব, পিতামাতার আর্থিক অস্বছলতা, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, অস্বাভাবিক পরিবেশে জীবনযাপন করতে গিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভাল পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবেশও অনেক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা জন্য দায়ী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিদ্যালয়ের অবস্থান, শিক্ষকের সহানূভূতিহীন আচরণ, পাঠ্যক্রমের অবাস্তবতা, শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করতে না পারার কারণে তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এমনকি বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে অব্যাহতি পেতে চায়। এসকল কারণে শিক্ষার্থীরা অনগ্রসর হয়ে যায়।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় শিখন-শেখানো কাজে পিছিয়ে থাকে।
- অধিক সময় কোন কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- বয়সের সাথে সাথে ভাষা দক্ষতার বিকাশ হয় না।
- শিক্ষকের বা অন্যের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে না।
- একই নির্দেশনা বার বার দিতে হয়।
- বৌদ্ধিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীরা বিমূর্ত বিষয়গুলো বুঝতে পারে না।
- কোন বিষয়ে ধারণা দিতে হলে বিষয়টি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে শিক্ষা দিতে হয়।
- কোন সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে না।
- আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং সামাজিক যোগাযোগে পিছিয়ে থাকে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষা চাহিদা

সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা চাহিদা আলাদা। স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের যে সকল কলা-কৌশল বা পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। এই চাহিদাগুলোকে শিক্ষামূলক চাহিদা ও ভৌত চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শিক্ষামূলক চাহিদা পূরণেকিছু সহায়ক দিক হতে পারে-

- বিশেষায়িত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা;
- চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- শিক্ষকের বিশেষ প্রশিক্ষণ থাকা;
- স্কুল ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা;
- উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করা;
- শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ শিখন পরিবেশ গঠন করা;
- শিক্ষকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা;

- শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা রাখা;
- সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার জানা;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনায় দক্ষ হওয়া;
- বিদ্যালয়ে ও ক্লাসে প্রবেশ পথ সুগম করা। যাতে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী সকল শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই চলাফেরা করতে পারে;
- ক্লাসের আসন বিন্যাস শিক্ষার্থীর উপযোগী করা;
- আইসিটি এর সুবিধা গ্রহণ করা;
- অডিও-ভিডিও শিক্ষা উপকরণে ব্যবস্থা রাখা।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকের করণীয়

সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে লেখাপড়া করতে পারে। এদেরকে মূল শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে ধরে রাখতে হলে শিক্ষকের ভূমিকা অনেক বেশি। শিক্ষকের আগ্রহ, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের চাহিদা বোঝা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। এজন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদেরকে যেন উপহাস বা উত্যক্ত না করে সে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে। শারীরিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অন্যান্যদের সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথ, মাঠ ও শ্রেণিকক্ষ যথাসম্ভব হুইল চেয়ার, ক্রাচ ইত্যাদি নিয়ে চলাচলের উপযোগী করতে হবে। কোন শ্রেণিতে হুইলচেয়ার বা ক্র্যাচ ব্যবহারকারী কোন শিক্ষার্থী থাকলে সে শ্রেণিকক্ষটি অবশ্যই নিচতলায় (বহুতল ভবন হলে) রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রবণ ও বাক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য স্পষ্টভাবে, ধীরে ধীরে ও তুলনামূলক জোরে কথা বলতে হবে। কথা বলা সময় শিক্ষককে প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি ও উপকরণের ব্যবহার, সহজ, সরল এবং সাবলীল ভাষায় পাঠ পরিচালনা এবং ক্ষেত্রে বিশেষে কথায় পুনরাবৃত্তি করতে হবে। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ছবি,চিত্র ইত্যাদি ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের সামনের সারিতে বসার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জিনিসের সাথে পরিচিত করিয়ে দেওয়া শিক্ষকের একটি দায়িত্ব। যেহেতু দৃষ্টি সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীরা শব্দ শুনে বুঝতে চেষ্টা করে, তাই শ্রেণিতে অহেতুক কোন শব্দ না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কম দৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষার্থী দেখার সুবিধার জন্য বোর্ডের চারিদিকে সাদা বা হলুদ রঙের বর্ডার দিতে হবে।

যে সকল শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও আবেগিক সমস্যা রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে। একই জিনিস পুনরায় বলা এবং বাস্তব উপকরণ ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ধরনের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে তাই কৌশলে এদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থী, ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের ব্যাপারেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যেন তারা কাজগুলো সম্পাদনে আনন্দ পায়। পাঠ্য বিষয় তাদের মানসিক ক্ষমতার অনুপাতে যদি সহজ হয় তাহলে পাঠে আনন্দ পায় না। এই ধরনের শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করতে ভালবাসে। তাদের জন্য শ্রেণিকক্ষে অতিরিক্ত কাজ বা কাজের পরিকল্পনা থাকতে হবে। অনেক সময় উন্নত বুদ্ধির জন্য আত্মসচেনতায় অত্যাধিক অহমিকা দেখা যায়। শিক্ষকের কাজ হল তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা ও তাদের মতামতের প্রাধান্য দেয়া। ক্ষীণ বুদ্ধির শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে সাহায্য করতে হবে। তাদের মধ্যে যে সকল ভাল গুণ রয়েছে তাদের তার বিকাশ ঘটাতে হবে। এমন শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে এবং যথাযোগ্য আচরণ করতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাদের মানসিক ক্ষমতা অনুয়ায়ী জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। আবার শ্রেণিকক্ষে পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের মানসিক ক্ষমতা অনুয়ায়ী বিদ্যালয়ের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। তাদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বোধ্যগমতার অভাব থাকলে তা দূর করার জন্য শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ বেশী ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য তাদের উপযোগী পদ্ধতি নির্বাচন করবেন ও কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করবেন। মনে রাখা ভাল শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার সমস্যা শিক্ষকের জন্য একটি স্থায়ী সমস্যা। কেননা আজ যে শিক্ষার্থীকে অগ্রসর মনে হচ্ছে, পরবর্তীকালে সে অনগ্রসর হয়ে পড়তে পারে। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষককে সব সময় সচেতন থাকতে হবে এবং যখনই সমস্যা দেখা দিবে, তখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.৩ পথশিশু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

পথশিশু

কোন জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পন হল শিশু। শিশুদের বলা জাতির কর্ণধার কারণ তাদের ওপরেই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এবং জাতি আশা-আকাঙ্খা, কল্যাণ ও শান্তি শিশুদের মাধ্যমেই বিকশিত হয়। একারণে সকল রাষ্ট্রই শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে চায়। যেকোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকে শিশু বা শিক্ষার্থী। কিন্তু বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে প্রতিবছর অনেক শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। অনেকে জীবন-জীবিকার তাগিদে বিদ্যালয়ে না এসে কর্মজীবন প্রবেশ করে। এদের অনেকে পথশিশু হয়ে অমানবিক জীবনযাপন করে। ইউনিসেফের (UNICEF) রির্পোট মতে, ২০১৪ খ্রি. বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা ১১,৪৪,৭৫৪ জন। দেশের প্রধান শহরগুলোত প্রতিনিয়ত পথশিশুর সংখ্যা বাড়ছে। দুঃখ-কষ্টে নিষ্পেষিত হয়ে একমুঠো খাবারের আশায় গ্রামের সাধারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সাইক্লোন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, অস্বচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে নিজ এলাকায় ছেড়ে শহরমূখী হয়ে উঠছে। শহরে এসে রাস্তার ধারে, রেল লাইনে, পার্কে, বস্তিতে বসবাস করতে শুরু করে। এখানে জন্মগ্রহণকারী নতুন শিশুটি পথশিশু হয়ে যায়, যে পায় না প্রয়োজনীয় খাবার, কাপড়, চিকিৎসা, আবাসন ও শিক্ষা।

শিশু ও পথশিশু

জাতিসংঘ শিশু সনদে বর্ণিত ঘোষণা অনুযায়ী ১৮ বয়সের কম বয়সীরা সকলেই শিশু। সে অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগই শিশু। বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীদের শিশু বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় শিশুশ্রম দূরীকরণ নীতি (২০১০) তে এই বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ বছর। আবার বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিশু বলতে অনধিক ১৬ বছর বয়সের কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। শিশু নির্ধারণে বয়স সীমায় মত পার্থক্য থাকতে পারে। তবে তা কখনোই ১৮ বছরের উর্দ্ধে নয়।

যে শিশুরা পথেই থাকে, পথেই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই পথশিশু। ইউনিসেফের (২০০৯) মতে ''who is of the street and on the street that means who works all day in the street pass their times, eat and go back to the family at night for sleep are children on the street and those who work, pass time and sleep on street are children of the street''.

এশিশুরা জনসুম্মখে, মার্কেটে বা খোলা জায়গাতে কাজ করে, ঘুমিয়ে পড়ে। কোন কারণে শিশুর এতিম অবস্থা, মা-বাবার বিচ্ছেদ, বাবা বা মায়ের দুরারোগ্য ব্যাধি, কিংবা পরিবারের আর্থিক অনটন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে শিশুরা এক সময় ঘরে বাহিরে চলে আসে। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তায় বসবাস শুরু করে। তখন পথ শিশু হয়ে ওঠে।

দারিদ্রতার জন্য অনেক পরিবার সঠিকভাবে শিশুদেরকে গড়ে তুলতে পারে না। তাদের সংসারে অভাব অনটন জন্য ছেলে-মেয়েদেরকে ঠিকমত খাবার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা প্রদানে করতে পারে না। এসব শিশুরাই তখন জীবন সংগ্রামে নেমে বিভিন্ন কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে-কুলি, হকার, রিক্সা শ্রমিক, ফুল বিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, হোটেল শ্রমিক, বুনন কর্মী, মাদক বাহক,বিড়ি শ্রমিক, ঝালাই কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি। এদের অনেক বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ কাজেও জড়িয়ে পড়ে।

শিশুর অধিকার

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (Convention on the Rights of the Child)১৯৮৯-এ শিশুর অধিকারসমূহ উল্লেখ করে বলা হয়, প্রতিটি রাষ্ট্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক, জাতীয়তা কিংবা সামাজিক পরিচয়, শ্রেণী, জন্মসূত্র কিংবা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।প্রতিটি শিশুই বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভ করবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে সব মানবসন্তানকে শিশু বলা হয়েছে, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।এই সনদের ৩৪টি অনুচ্ছেদে শিশুর অধিকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সনদের অনুচ্ছেদ ২৮-এ শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার এবং ২৯ অনুচ্ছেদে শিশুর শিক্ষা কেমন হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লিখিত শিক্ষা লাভের অধিকারগুলো হল-

ক) সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক এবং সহজলভ্য ।
খ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।
গ) যোগ্যতা অনুযায়ী সকলকে শিশুর জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া দিতে হবে।
ঘ) বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০১০) পথশিশু ও অতি বঞ্চিত শিশুদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়- 'এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনা ও ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার

জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'। সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চলের শিক্ষার্থী সম্পর্কে বলা হয়-'বিভিন্ন কারণে সংকুচিত সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সম-সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'।

শিক্ষানীতিতে যদিও সকল শিশুর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তথাপি কিছু পুশ ফ্যাক্টরের জন্য পথশিশুর মত সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ইউনিসেফ, ইউনোস্কো ও আইএলও (২০০৮)-এর গবেষণায় মতে এই পুশ ফ্যাক্টরগুলো হল-

- চরম দারিদ্র্য (Extreme poverty)
- পরিবারের সদসের মৃত্যু (Death of earning member in family)
- পিতামাতা বিচ্ছেদ (Parental divorce)
- পিতামাতার সন্তানকে ছেড়ে চলে যাওয়া (Abandonment of children)
- অর্থনৈতিক ধাক্কা (Economic shocks)
- পরিবারের সদস্যরা মারাত্মক রোগব্যাধি আক্রান্ত হওয়া (Catastrophic health problems in family)
- প্রাকৃতিক বিপর্জয় (Natural calamities)

পুশ ফ্যাক্টরগুলোর পাশাপাশি কিছু পুল ফ্যাক্টরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবেদিন (২০০৬) চিহ্নিত পুল ফ্যাক্টরগুলো হলো-

- দক্ষ না হয়েও কাজ করার সুযোগ থাকায় পথশিশুরা স্কুলে যেতে চায় না।
- স্কুলে যাওয়ার চেয়ে কাজে যাওয়া আর্থিকভাবে অধিক লাভজনক।

পথশিশুদের স্কুলে না আসার পিছনে আরো কিছু কারণ আছে। ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, আইএলও (২০০৮) এ এই কারণগুলো নির্দেশ করেছে। গবেষণায় দেখা যায় ১৬.৯ শতাংশ শিশু গৃহস্থলীয় অর্থনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকায় তারা স্কুলে আসতে পারে না, ৯.৬ শতাংশ শিশু মজুরির বিনিময়ে কাজ করে, ৮.২ শতাংশ শিশু নিজেদের লেখাপড়ায় দুর্বল মনে করে, এবং ৭.২ শতাংশ মনে করে তাদের পক্ষে লেখাপড়া সম্ভব না। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা যদিও শিক্ষালাভের পথে একটি বড় বাঁধা, সেখানে শিশুদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার ফলে তাদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থার স্কুলগুলো কতটা কার্যকর ও একীভূত প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধরে রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

পথশিশু হওয়ার কারণ

কোন একক কারণেকেউ পথশিশু হয়ে ওঠে না। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, প্রাকৃতিক, জৈবিক, দৃষ্টিভঙ্গি বা দূর্ঘটনাজনিত কারণে একটি শিশু পথশিশুর হয়ে ওঠে। একজন শিশুর পথশিশু হয়ে ওঠার প্রধানতম কারণ অর্থনৈতিক হলেও খাবারের অভাব, ভূমি হারানো, সুযোগের স্বল্পতা, উন্নত জীবনের আশা, বাবা-মার ছাড়াছাড়ি, বহুবিবাহ, দূর্ঘটনা, শিশুপাচার ইত্যাদি অন্যতম। দ্রারিদ্য সীমার নিচে বসবাস করায় অনেক পরিবারের পক্ষে তার সন্তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে না পারায় তারা ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে। আবার পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অভাব, পিতা-মাতার মৃত্যু ইত্যাদি কারণেও পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা যায়। এসব পরিবারের সন্তানেরা অনেক সময় জীবিকার তাগিদে পথশিশু হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি পথশিশু এভাবেই এক কঠিন ও নিষ্পেষিত অবস্থায় জীবনযাপন করছে। সকল শিশু সমান অধিকার নিয়ে জন্ম নিলেও সকলে সমান সুযোগ পায় না। এই শিশুরা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সারাদেশে এমন অনেক শিশু রয়েছে পথেই যাদের জন্ম ও বসবাস। পথে পথে বেড়ে ওঠা এমন শিশুদেরকে টোকাই, পথকলি, ছিন্নমূল বা পথশিশু বলা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, খড়া, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদির জন্য শিশুরা পথশিশু হতে দেখা যায়। নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী বন্যার কারণে শেষসম্বল নদীগর্ভে হারিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে শহরমুখী হয়। শহরে কাজ না পেয়ে ধীরে ধীরে পথশিশু হয়ে যায়। সহায় সম্বলহীন পরিবারে জন্ম নেওয়া শিশুটিও পথেই বড় হয়। অনেক সময় প্রতিবন্ধী শিশুরা পরিবার ও সমাজের কাছে অবহেলা পেয়ে দূরে সরে রাস্তার জীবনকে বেছে নেয়। এ রকম এতিম, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর শিশুদের দায়িত্ব কেউ নিতে চায়। তারা পথে পথেই ঘুরে বেড়ায়। সন্তানের প্রতি পিতামাতা অযত্ন-অবহেলার কারণে অনেক স্বাভাবিক পরিবারের সন্তানেরা নেশাগ্রস্থ হয়ে যায়। অনেক সময় এমন শিশুরাও পরিবার ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পথশিশুদের বঞ্চনা

পথশিশুদের জীবনযাপন অত্যন্ত দুর্বিষহ। ক্যাম্পির গবেষণায় (২০০৫) দেখা যায়,Street children are a particularly difficult group to monitor and perhaps the most vulnerable group inthe population। শহরের খোলা আকাশের নিচে, ব্রিজের নিচে, মার্কেট, পার্ক, বাস ও রেল স্টেশনসহ বিভিন্ন স্থান তাদের আশ্রয় বসবাস কেন্দ্র। তারা সামান্য যা

উপার্জন করে তাই দিয়ে রাস্তার ধারের খাবারের দোকান, ভ্রাম্যমাণ খাবারের দোকান থেকে খাবার কিনে খায়। আয় না হলে না খেয়েই দিনযাপন করে। এজন্য অধিকাংশ পথশিশু অপুষ্টিতে ভোগে এবং চর্মরোগ, ডায়রিয়া, ঠান্ডা, জ্বর, জন্ডিসসহ নানা রোগে তারা আক্রান্ত হয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে চুরি বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে পথশিশুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হয়। শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে, পথশিশুদের ৮৫ ভাগই কোনো না কোনো মাদক সেবন করে। বিবিএস এর তথ্য মতে, স্কুলে যায় না ২৪ লাখ শিশু, মজুরি পায় না ১৬ লাখ শিশু, পরিবারকে সহায়তা দিতে কাজ করে ৩০ শতাংশ শিশু, কৃষি ও কল কারখানায় কাজ করে ৬৫ শতাংশ শিশু। যারা মূল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অমানবিক জীবন যাপন করে। তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় থাকে।

পথশিশুর শিক্ষায় করণীয়

বাংলাদেশের অনেক ছিন্নমূল শিশু রয়েছে যারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, যাদের দিন কাটে অনেক কষ্টে। যারা ঠিকমতো খাবার যোগাতে পারে না তারা কিভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে? এজন্য এই সব শিশুদেরকে শিক্ষার জন্য সরকারের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

- পথশিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার প্রভাবেই তারা কুসংস্কার, অন্যায়, জড়তা ও হীনতা থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের মানুষ হতে পারে। পথশিশুরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। এসব শিশুরা যদি শিক্ষার সুযোগ পায় তাহলে তারা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করতে পারবে। তারা যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।
- যে সকল এলাকায় পথশিশু বেশি দেখা যায় সেখানে স্থানীয় উদ্যোগে পথশিশুদের জন্য স্কুল চালু করা যেতে পারে। এই স্কুলগুলো হতে পারে চাহিদাভিত্তিক ও নমনীয়। শিশুদের পছন্দমত সময়ে স্কুল পরিচালনা করতে হবে। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর চেয়ে ক্ষেতে-খামারে ও অন্য জায়গায় কাজ করানো অধিক লাভজনক বলে তারা মনে করেন। এতে তাদের পরিবারে কিছুটা সাহায্য হয় বলে তারা মনে করে। এজন্য পরিবারগুলোকে সচেতন করে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে পথশিশুদের দক্ষ করতে হবে। বৃত্তিলাভে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকল্প নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে শিশুদেরকে আগ্রহী করতে হবে। প্রয়োজনে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পথশিশুদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সকলের মাঝে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা তাদেরকে দিতে হবে। বিনা বেতনে ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তার যেন আত্মনির্ভশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজে ধনী-গরিবের মধ্যে সুর্স্পক তৈরি করতে হবে।
- অভিভাবকদের দারিদ্র্য দূরীকরণে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। উন্নত দেশে শিশুর সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করে। তেমনি আমাদের দেশের অবহেলিত শিশুদের সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্র নিতে পারে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬৫ লাখ (৬.৫ মিলিয়ন) যা পৃথিবীর মোট শিশু শ্রমিকের ২.৬ অংশ। দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশই শিশু, যাদের বয়স ষোল বছরের কম। ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ খ্রি. মধ্যে বাংলাদেশের রাস্তায় শিশুর সংখ্যা ১১ লাখ ৪৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এই বিপুল সংখ্যক পথশিশু দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই তাদের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পুনর্বাসন না করলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে।
- কর্মমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নে জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। স্বল্পমেয়াদী কোর্সে উপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে পথশিশুদের সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এসব কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি পথশিশুরা আগ্রহী করে তুলতে হবে এবং পথশিশুর পিতামাতাকেও কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ করে তুলতে হবে। তাহলে তারা সমাজের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে।
- পথশিশুদের উন্নয়নের ব্যাপারে শুধু সরকারি কার্যক্রম নয় জনগণকে সচেতন করতে হবে। অর্থাৎ কেউ পথশিশু হলে তাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা করতে হবে।
- যে সকল পথশিশু এতিম বা যারা অভিভাবকহীন তাদেরকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আশ্রয়নের ব্যবস্থা করে সেখানেই তাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা যেতে পারে। আবার সে সকল পথশিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক রয়েছে সেক্ষেত্রে অভিভাবক বা পিতামাতাকে দক্ষতা ও জীবনভিত্তিক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজের নিয়োজিত করতে হবে।
- Child to child approach-এর মাধ্যমে যে সকল শিশুরা স্কুলে যায় তাদের মাধ্যমে পথশিশুদেরকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। স্কুলগামী শিশুদের পথশিশুদের অধিকার ও শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশি নামে পরিচিতি হলেও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিচয়ে কেউ বাঙালি, কেউবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনাচার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ট্যাবু। ২০১১ খ্রি. আদমশুমারি তথ্য মতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশ। অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষা আছে যা বাংলা নয়। কিন্তু তারা তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে ভাষা সমস্যার জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও আরো কিছু শিক্ষা চাহিদা আছে যা পূরণ না হলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ‘সংস্কৃতি’ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংস্কৃতি বিভিন্ন উপ-উপাদানে বিভক্ত। যেমন- ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ এবং বিভিন্ন রকম কলা যেমন- চিত্রকলা, নৃত্যকলা, সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদি। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির কারণেই এক জাতি অপর জাতি থেকে আলাদা। নৃতাত্তিক গোষ্ঠী বলতে জাতিই বোঝানো হয়। যাদের আলাদা সংস্কৃতি, নিজস্ব ভাষা ও পোশাকের ঐতিহ্য,আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদিতে যারা অন্যদের তুলনায় ভিন্ন; তারাই ভিন্ন নৃগোষ্ঠী। যেমন-বাংলাদেশে বাঙালি, চাকমা, মারমা, খাসিয়া, গারো, সাঁওতাল, রাখাইন, পাংখোয়া বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বাস। বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি মত জাতিসত্তার উপস্থিতির দেখা যায়। নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বাংলাদেশ করছে একটি বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দেশ।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষা

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) ও সবার জন্য শিক্ষা (১৯৯০) ঘোষণাপত্রে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে, শিশুর শিক্ষা হবে মানসম্মত। EFA-Dakar Framework for Action (2000) সম্মেলনেআরো বলা হয় শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক, আবেগিক ও ভাষাগত কারণে কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। এখানে প্রতিবন্ধী, অতি মেধাবী, পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, দলিত জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রান্তিক গোষ্ঠির মানুষের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বিশেষ উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা বা Education for All মানে অধিকাংশের শিক্ষা নয়। এখানে সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্ভূক্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রান্তিক সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। শিশুর শিক্ষার উপর নির্ভরকরে আগামী শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার স্বপ্ন। তাই কোন শিক্ষার্থীই যাতে শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে, হোক না সে বাঙালি বা নৃগোষ্ঠি।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষা

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস করে। যাদের বৃহৎ অংশ পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতে দেখা যায়। এই নৃগোষ্ঠী গুলোর ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে জন্য এই অঞ্চলে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার যাচ্ছে না (ইউনিসেফ ২০০৫)। শিক্ষা ব্যবস্থায় আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিক প্রতিফলন না থাকায় তারা শিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে থাকছে। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। যার প্রতিফলন শিক্ষায় ব্যবস্থায় তেমন লক্ষ্য করা যায় না। স্কুলের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি মিল না থাকায় তারা স্কুলে আসতে চায় না। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহার করা হয় বলে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা বুঝতে অসুবিধা হয়। শিক্ষার্থীরা ঠিকমত বুঝতে পারে না কী পড়ানো হচ্ছে। তারা একসময় স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। এভাবে অনেক শিক্ষার্থীই ঝরে পড়ে। পাবর্ত্য এলাকায় এই ঝরে পড়ার হার অন্যান্য এলাকা থেকে বেশি। বাংলাদেশ সরকারে প্রতিবেদন (২০১৩) অনুযায়ী সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৯৮.৭ শতাংশ কিন্তু আদিবাসী শিক্ষার্থীর হার ৭০ শতাংশ। আবার যারা ভর্তি হয় তাদের ৬০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর শেষ হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। ভাষাগত দূর্বলতার জন্য তারা ক্লাস পারর্দশিতায় অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে তাদের নিচের ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হয়। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০১০) আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

- আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের মাতৃভাষায় শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

- আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোন কোন এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আবাসিক ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়া হবে।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির শিক্ষা সমস্যা

নৃগোষ্ঠির বিভিন্ন সমস্যার অন্যতম একটি হল ভাষা, তবে একমাত্র কারণ নয়। বেনসন (২০০৬) সালে তার গবেষণায় দেখিয়েছে ভাষা একটি হাতিয়ার যার মাধ্যমে সমাজের অসমতা দূর করা যায় এবং ভাষাগত পার্থক্য দূর করে শিক্ষাকে অধিকতর একীভূত করা যায়। কিন্তু শিক্ষাক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো জীবন, সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায় না। এছাড়াও বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সমস্যা। এই সমস্যাগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। সেগুলো হল- সুযোগের স্বল্পতা, নিম্নমানের শিক্ষা, সংস্কৃতিক বাধা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের সীমিত সুযোগ

- বাংলা ভাষায় কথা বলতে না পারায় স্কুল কর্তৃপক্ষ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চায় না।
- স্কুল ক্যালেন্ডারে নমনীয়তার অভাব দেখা যায়। যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোন প্রতিফলন দেখা যায় না।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বা আদিবাসীদের চাহিদাভিত্তিক স্কুলের অভাব। যেমন- তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্কুল।

নিম্নমানের শিক্ষা

- স্কুলগুলো আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেয় না।
- স্বল্প সংখ্যক আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ। আবার নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিজ এলাকায় নিয়োগ ও বদলির সুযোগ কম থাকায় শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
- আদিবাসী স্কুলগুলো তুলনামূলকভাবে কম সহায়তা পেয়ে থাকে।

সাংস্কৃতিক বাঁধা

- আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্য পরিচালনা করা হয় না।
- স্কুল কারিকুলামে স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ভাষায় প্রতিফলন দেখা যায় না।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে উন্নয়নের পরিকল্পনার অভাব।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অভাব

- স্কুলের কার্যক্রমে পিতামাতা বা অভিভাবক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না। অভিভাবক ও শিক্ষকের ভাষাগত পার্থ্যকের বাঁধা হয়ে দেখা দেয়।
- শিক্ষার্থীদের নিজ ভাষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সীমিত সুযোগ থাকে।
- অভিভাবকের মনে করেন তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে শিক্ষার সম্পর্ক কম।

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার সুবিধা

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিরশিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার জন্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি ভাষাগত ও সংস্কৃতিক বাধা উত্তরণের অন্যতম উপায় হল মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (mother tounge based multilingual education (MLE)। আদিবাসীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের মায়ের ভাষা হবে প্রথম ভাষা এবং বাংলা হবে দ্বিতীয় ভাষা। কারণ প্রতিটি মানুষই মাতৃভাষায় শিখতে শুরু করে, কোন কিছু বুঝতে শিখে এবং যোগাযোগ করতে শিখে। আদিবাসী শিক্ষার্থীরা যখন অন্যভাষা যেমন বাংলা ভাষা ব্যবহারে দক্ষ হয় ওঠে তখন আস্তে আস্তে তাদের মাতৃভাষার ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে। এক সময় তারা মাতৃভাষার মত বাংলা ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠে। তাই আদিবাসী শিক্ষার্থীর চাহিদার বিবেচনা করে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই কথা প্রযোজ্য। বেনসন (২০০৬) গবেষণায় দেখিছেন মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি ও উপস্থিতি হার বৃদ্ধি পায়। আবার ম্যালন (২০০5) এর গবেষণায় দেখা যায়, উভয় ভাষা ব্যবহারের ফলে শিক্ষা শিক্ষার্থীরা হয়ে ওঠে দোভাষী, দ্বৈত-সাক্ষরিক ও দ্বৈত-সাংস্কৃতিক।

দোভাষী (Bilingual): মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাত্যহিক জীবনে যোগাযোগ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহার আত্মবিশ্বাস হয়ে উঠে।

দ্বৈত-সাক্ষরিক (Biliterate): শিক্ষার্থীরা তাদের মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষায় স্বতংস্ফূর্তভাবে পড়তে ও লিখতে পারে। উভয় ভাষায় দক্ষতা থাকায় অনেক তথ্য জানতে পারে ও অনেক সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।

দ্বৈত-সাংস্কৃতিক (Bicultural): শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতিও সম্পর্কে জানতে পারে। তারা তাদের সম্প্রদায়ের বাহিরের জনগোষ্ঠির সাথে আত্মবিশ্বাসের সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

বিশ্বব্যাংক (২০০৫) শিক্ষায় মাতৃভাষায় ব্যবহারের ৫টি ইতিবাচক দিক চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো-

ক) শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পায় ও শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;
খ) শিখনফল ভালভাবে অর্জিত হয়;
গ) ঝরের পড়ার হার হ্রাস পায়;
ঘ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক সুফল পাওয়া যায়,
ঙ) সামগ্রিক শিক্ষা ব্যয় হ্রাস পায়।

মাতৃভাষা ব্যবহারে আরো কিছু বিশেষ দিক হল-

- শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যকর ও টেকসই হয়;
- শিখন-শেখানো কার্যে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অধিক হয়;
- শিক্ষার্থীরাপাঠের বিষয় সহজে আত্মস্থ করতে পারে;
- আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ সহজ ও সাবলীল;
- শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পায় ও ঝরে পড়ার হার কমে যায়;

তবে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের কিছু সমস্যাও আছে। সমস্যাগুলো হলো-

- প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় প্রদান করা হলেও পরবর্তীকালে তাদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যা তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জও বটে।
- প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করাও কঠিন কাজ। অনেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব লিখিত হরফ নেই। ফলে সকলের জন্য পৃথক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা সম্ভব নয়।
- প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষার শিক্ষক নিয়োগ একটি দূরুহ কাজ। অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে একটি বৈচিত্র্যময় দেশ যেখানে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী বসবাস করে যাদের আছে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক পরিচয় যা বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে। কিন্তু অনেকের অজ্ঞতা, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এজন্য সকলকে সচেতন হতে হবে এবং তাদের উন্নয়নে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসী সকল জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করে তাদের মূল উন্নয়ন স্রোতে নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় আদিবাসী সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়।

৭.৪ ঝরে পড়া ও গুণগত শিক্ষা

ঝরে পড়া

শিক্ষাক্ষেত্রে ঝরে পড়া নতুন কোন বিষয় নয়। শিক্ষার্থীরা কেন ঝরে পড়ে সে বিষয়ে বিশশতকের শুরু থেকেকারণ খোঁজা হচ্ছে। ঝরে পড়া শুধু বাংলাদেশের জন্য একক সমস্যা এমন নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাতেও শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি শিশু যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে, ঝরে না পড়ে এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায় সেজন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষাখাতের উন্নয়নের জন্য নানামুখী পদক্ষপে গ্রহণ করেছে। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে *সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা* অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঝরে পড়ার কারণে শতভাগ শিক্ষার্থী কাঙ্খিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারছে না। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তির সাফল্য আসলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তি পূর্বেই অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। একই চিত্র মাধ্যমিক স্তরেও দেখা যায়। কিন্তু কিছু পুশ ফ্যাক্টর, পুল ফ্যাক্টর ও ফেইলিং আউট ফ্যাক্টর এর জন্য শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। তাই ঝরে পড়া সমস্যা একটি শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতন একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সাধারণভাবে কোন কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে তা ঝরে পড়া বলে বিবেচনা করা হয়। কোন শিক্ষার্থী চলমান কোন শিক্ষা কার্যক্রম ভর্তি হয়ে তা সম্পূর্ণরুপে শেষ হওয়ার পূর্বেই থামিয়ে দিলে বা শিক্ষাগ্রহণ ছেড়ে দিলে ঐ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বলে বিবেচিত হবে। ক্যাম্বব্রিজ ডিকশনারি মতে drop out হল 'to stop doing something before you have completely finished'। ঝরে পড়া একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী খারাপ ফলাফল ঝরে পড়ার একটি অন্যতম নির্দেশক। ঝরে পড়া বা ড্রাপ আউট এই ধারণা দেশ ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। নর্থ ক্যারোলিনায় ঝরে পড়া বলতে 'কোন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে বদলিজনিত কারণে ভর্তি না হয়ে কোন শিক্ষার্থী যদি বর্তমান স্কুলের লেখাপড়া সমাপ্তির পূর্বে কোন কারণে স্কুলে ছেড়ে চলে যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে 'ঝরে পড়া' বিষয়টিকে 'স্কুল ত্যাগ' হিসেবে বিবেচনা করা হত (ফুলার ১৯২৭)।

ঝরে পড়ার কারণ

ঝরে পড়া নতুন কোন বিষয় নয়। ঝরে পড়ার সুনিদিষ্ট একক কোন কারণ নেই। যে কারণে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে সেগুলোকে ঝরে পড়ার পূর্ববর্তী অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন শিক্ষার্থী যেদিন থেকে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয় তার আগে থেকে এই প্রভাবগুলো কাজ করে। জর্ডান ও অন্যান্য (১৯৯৪) এবং ওয়াট ও রোসিং (১৯৯৪) সালে তাদের গবেষণায় ঝরে পড়ার কারণগুলোকে পুশ, পুল ও ফেলিং ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত করছেন।

- **পুশ ফ্যাক্টর:** বিদ্যালয়ের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবের জন্য শিক্ষার্থী চাপ অনুভব করে। এই উপাদানগুলোকে পুশ ফ্যাক্টর বলা হয়। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা নীতি, হোম ওয়ার্কের চাপ, পরীক্ষার চাপ, টয়লেট সুবিধা, শিক্ষকের খারাপ আচরণ ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীরা ঝরে পরে। এখানে স্কুল মূল প্রভাবকের কাজ করে যার প্রভাবে শিক্ষার্থীরা ঝরে যায়।
- **পুল ফ্যাক্টর:** স্কুলের বাহিরের প্রভাবকগুলো হল পুল ফ্যাক্টর যার ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা শেষ করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। অর্থনৈতিক চিন্তা, স্কুলের বাহিরে কাজ করা, পরিবার পরিবর্তন, শারীরিক অসুস্থতা, এলাকা/শহর পরিবর্তন, বিবাহ, দুর্বল স্বাস্থ্যে ইত্যাদির জন্য শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে।
- **ফেলিং ফ্যাক্টর:** পুশ ও পুল ফ্যাক্টিরের বাইরেও কিছু কারণ আছে যার ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা ভাল ফলাফল করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠান ভাল না লাগা, পারিবারিক কলহ, মাদকাক্তি, বিচ্যুত আচরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহতৈরি করে। ফলে স্কুলের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফলাফল খারাপ করতে থাকে। এগুলো ফেলিং ফ্যাক্টর। ব্যক্তিগত বা শিক্ষামূলক সহায়তায় অভাবের জন্য ফেলিং ফ্যাক্টরগুলো দেখা যায়। ফেলিং ড্রাপট আউট এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে একাডেমিক কাজে আগ্রহ হারিয়ে এক সময় স্কুল ছেড়ে দেয়।

১৯৬৬ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণায় পুল ফ্যাক্টরগুলোকে শিক্ষার্থী ঝরে অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা করা হলেও বর্তমানে পুশ ফ্যাক্টরের প্রভাব বেশি দেখা যায় (জোনাথন, ২০১৩)। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নানামূখী উদ্যোগের জন্য বিশ শতকে পূর্বে যেখানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার যেখানে এককের ঘরে ছিল তা দশকের ঘরে উন্নত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষার্থী ভর্তি হার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ৫০ শতাংশে থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ খ্রি.৮০ শতাংশে এবং ২০১০ খ্রি. নাগাত তা ৮৯.৯ শতাংশ পৌঁছেছে। কিন্তু শিক্ষার্থী ঝরে পড়া থেমে নেই (বেল্ড উইন ১৯৯২,চ্যাপম্যান ও অন্যান্য ২০১০)।
ঝরে পড়ার কারণগুলোকে আবার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুই ভাগে ভাগ করা যায় যা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

ক. ঝরে পড়ার অভ্যন্তরীণ কারণ

- বিদ্যালয়ের গঠন ও সুযোগ-সুবিধা অভাব;
- শিক্ষকের প্যাডাগোজিক্যাল জ্ঞানের অভাব;
- স্কুলের ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা;
- পর্যাপ্ত স্কুল ও শিক্ষকের অভাব;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত।

খ. ঝরে পড়ার বাহ্যিক কারণ

শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা পরিবারকে সাহায্য করার জন্য স্কুল চলাকালীন বাহিরে কাজ করা থাকে। বাবার কাজে সাহায্য করা, দোকানে বসা, মাছ ধরতে যাওয়া, মাঠে কাজ করা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। এই শিক্ষার্থীরা অল্প বয়সেই অর্থের মূল্য বুঝতে শেখে। ফলে লেখাপড়ার চেয়ে কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি আগ্রহ জন্মায়। ছেলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে এই কারণগুলো প্রভাব বিস্তার করে। আবার বাল্য বিবাহজনিত কারণে মেয়ে শিক্ষার্থীরা বেশি ঝরে পড়ে। শিক্ষার্থী কম ভর্তি ও উচ্চ ঝরে পড়ার আরেকটি কারণ হল ভৌগোলিক অবস্থান। দুর্গম এলাকা বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকা ও জলাবদ্ধ এলাকা, চরাঞ্চল শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বেশি। কোচিং বাণিজ্য ও নোট বই এর কারণে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং শিক্ষার সাথে কাজের নিশ্চয়তা না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে নেতিবাচক মানসিকতা দেখা যায়। শিক্ষার্থী ও অভিভাবক চাপ অনুভব করে। ঝরে পড়ার আরো কিছু কারণ হল-

- শিক্ষার্থীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের চাপ;
- পরিবারে সহায়তা করা;
- বুলিং বা ভ্যাংচানোর সংস্কৃতি;
- নিয়মিত খারাপ ফলাফল;
- অপরাধ প্রবণতা;
- আগ্রহের অভাব ও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কারিকুলামের সমন্বয়হীতা।

ঝরে পড়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক

পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের সাথে শিক্ষা গ্রহণের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। অনেক দরিদ্র পরিবার আছে যারা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠায়,আবার কেউ পাঠায় না। একই রকম আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্তেও অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্যেরজন্য এমনটা দেখা যায়।

- যে সকল পিতামাতার শিক্ষার কোন অভিজ্ঞতা নেই তারা শিক্ষার মূল্য বুঝতে না পেরে সন্তানদের স্কুলে যেতে কম আগ্রহ প্রকাশ করে।
- নিরক্ষর পিতামাতার সন্তানেরা স্কুলে যেতে চাইলে পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী হিসেবে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ শিক্ষার্থীরা পরিবারে সদস্যদের কাছে পড়ালেখার ব্যাপারে সহযোগিতা, উৎসাহ তেমন সহায়তা পায় না যা শিশুর শিখনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- সঠিক সময়ে সন্তানদের স্কুলে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা অল্প যোগ্যতা সম্পন্ন অভিভাবকের বুঝতে না পারার ফলে বেশি বয়সে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরে ঝরে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।
- প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র্য ও নিরক্ষর পরিবারের সন্তানের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাবের জন্য প্রান্তিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা স্কুলে বাঁধার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এক গবেষণায় (বাশার ২০১০) দেখা যায়, দরিদ্র্য পরিবারে শিক্ষার্থীরা স্কুলে ভাল না করলে শিক্ষকগণ তাদের সুযোগ ও সহযোগিতা না দিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। এমন শিক্ষার্থীরা মার্জিত আচরণ করতে ব্যর্থ হলে শিক্ষকেরা অধৈর্য্য হয়ে পড়েন এবং শাস্তি দিতে চান। কখন কখন হেয় প্রতিপন্ন করে থাকেন যা পরবর্তীতে স্কুল ত্যাগের কারণ হয়ে দেখা যায়।
- ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা, আসন বিন্যাস করার কারণেও দরিদ্র্য পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝে ভীতি কাজ করে। তাদের নিজেদের ছোট মনে। পড়ালেখা তাদের কাছে কঠিন ও অর্থহীন মনে হয়।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা ভাষা ও সাংস্কৃতিক কারণে ঝরে পড়ে। সামগ্রিকভাবে ভাষা যদিও ঝরে পড়ার অন্যতন কারণ নয়, তথাপি ভাষা পার্বত্য এলাকায় ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ।
- বাংলাদেশে নারীরা নানা কারণে পিছিয়ে আছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপর বাল্য বিবাহের চাপের কারণে অনেক সময় স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। ইউনিসেফের (২০১১) তথ্য মতে-এখনও বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। অভিভাবকগণ দুইটি কারণে তাদের মেয়েদের বাল্য বিবাহ দিতে উৎসাহিত হন। প্রথমত, মেয়ের বাল্য বিবাহ দিতে পারলে তাদের আর্থিক বোঝা কিছুটা কমে যাবে। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌতুকের টাকার পরিমাণ বাড়ে। দ্বিতীয়ত, যে পরিবারে অবিবাহিত বয়স্ক মেয়ে থাকে তাদের বিব্রতকর পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই পরিস্থিতি বেশি দেখা যায়। কম শিক্ষা গ্রহণের সাথে বাল্য বিবাহের সম্পর্ক আছে। এ ধরণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধার কারণে মেয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে।
- শিশু শ্রম ঝরে পড়ার আরেকটি অন্যতম কারণ। গৃহস্থালীয় কাজ, ওয়েলডিং মেশিন, বাটারি চার্জিং, পরিবহন হেলপার কাজ, পরিচ্ছনতার কাজ, কারখানায় কাজ, চিংড়ি শিল্পে কাজ, চা শ্রমিকের কাজ, গাড়ি মেরামতের কাজ-এরুপ অসংখ্য কাজে জড়িয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে।
- পিতামাতার বিচ্ছেদের কারণে পরিবারের শিশুটি পর্যাপ্ত সুরক্ষা পায় না পেয়ে কাজের সুযোগ খুঁজতে থাকে।

বাংলাদেশে ঝরে পড়ার চিত্র

সরকারের নানা উদ্যোগের পরও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া আশানুরূপ কমছে না। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে অস্বাভাবিক হারে ঝরে পড়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো'র (ব্যানবেইজ) তথ্য অনুযায়ী, এখনো প্রাথমিকে ২৬ দশমিক ২ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এর মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি। আর মাধ্যমিকে প্রায় ৪৬ ভাগ এবং কলেজ পর্যায়ে প্রায় ২২ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। প্রাথমিকে ছেলেদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি হলেও মাধ্যমিক ও কলেজে মেয়েদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি। মাধ্যমিক স্তরে ৪০.৪৪ % ছেলে এবং ৫১.৮৩% মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে।

অভিভাবকদের সচেতনতা ও উপবৃত্তি প্রদানের কারণে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার কমছে। মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রেও প্রাথমিকের মতো দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা হলে এ স্তরেও মেয়েদের ঝরে পড়ার হার কমানো যাবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির নীতিমালায় যে শর্তারোপ করা হয়েছে তাতে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বৃত্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে বৃত্তি না পাওয়ার কারণে স্কুলে আসছে না মাধ্যমিক ও কলেজে যাওয়ার উপযোগী মেয়েরা। এ কারণে এই দুই স্তরে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছেলেদের চেয়ে বেশি।

মাধ্যমিক স্তরে গ্রেডভিত্তিক ঝরে পড়া লক্ষ্য করলে দেখা যায়- ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৪.৫৯%, সপ্তম শ্রেণিতে ৫.০২%, ৮ম শ্রেণিতে ২০.৩৫%, নবম শ্রেণিতে ৭.৬% এবং দশম শ্রেণিতে ৭.৯৭% ঝরে পড়েছে। আর কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ২১.৮% শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়ার চিত্র তুলে ধরা হল-

ক. প্রাথমিক স্তর

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০১২-২০১৫

বছর	মেয়ে	ছেলে
২০১২	২৪.২০	২৮.৩০
২০১৩	১৭.৯০	২৪.৯০
২০১৪	১৭.৫০	২৪.৩০
২০১৫	১৭.০০	২৩.৯০

উৎস: বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ব্যানবেইজ

- প্রাথমিক শিক্ষার সকল স্তরে ২০১৫ সালে ৬ দশমিক ২ ভাগ পুনরায় ভর্তি হয়েছে। যা ২০১২ খ্রি. ১২ দশমিক ছয় ভাগ ছিল।
- ২০১৫ সালে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে থাকা শিক্ষার্থীর হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ৮১ দশমিক তিন ভাগে উন্নিত হয়েছি যা ২০১০ ছিল ৫২ ভাগ।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার ৬০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ ভাগে হয়েছে। যেখানে ৭৬ ভাগ ছেলে এবং ৮৩ ভাগ মেয়ে এই শিক্ষা স্তর সম্পন্ন করেছে।
- সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০ দশমিক চার ভাগ কমেছে, যা ২০০৫ ছিল ৪৭ দশমিক দুই ভাগ এবং ২০১০ ছিল ৩৯ দশমিক ৮ ভাগ।

খ. মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০১০-২০১৫

বছর	মেয়ে	ছেলে
২০১০	৫৩.৫৭	৫৭.২৯
২০১১	৫৬.৪৩	৪৬.৭৩
২০১২	৫২.৩৬	৩৪.৯০
২০১৩	৪৮.৮৯	৩৪.১৮
২০১৪	৪৭.৬৭	৩৪.৫২
২০১৫	৪৫.৯২	৩৩.৭২

উৎস: বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ব্যানবেইজ

গ. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০১১-২০১৫

বছর	মেয়ে	ছেলে	মোট
২০১১	২৫.০৭	২৬.৩৪	২৫.৭৭
২০১২	২৩.২৯	২০.৩১	২১.৮০
২০১৩	২৩.২৯	২০.৩১	২১.৮০
২০১৪	১৭.০৫	২৫.৩২	২১.৩৭
২০১৫	২৪.৬০	১৬.৮৩	২০.৭০

উৎস: বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ব্যানবেইজ

ঝরে পড়া রোধে বাংলাদেশে গৃহীত উদ্যোগ

সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ঝরে পড়া রোধ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সবার শিক্ষা জন্য নিশ্চিত করা, শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, শিক্ষায় সকলের সুযোগ সৃষ্টি করা, স্কুলের শিক্ষার্থীর ধরে রেখে ঝরে পড়া কমিয়ে আনা, জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ঝরে পড়া বন্ধ করতে হবে। এজন্য সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন-

- বিনামূল্যে বই বিতরণ করা।
- শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার।
- প্রাক-প্রাথমিক স্কুল চালু করা
- সহশিক্ষা কার্যক্রম- খেলাধূলা ও স্টুডেন্ট কাউন্সিল চালু করা
- স্কুল ফিডিং ও স্কুল মিল চালু করা
- প্রাইমারি স্কুলের দরিদ্র ছেলেমেয়ে এবং মাধ্যমিক স্তরে গ্রামের মেয়ে শিক্ষার্থীকে শর্ত সাপেক্ষে অর্থ সহায়তা প্রদান।
- মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রকল্প।
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ
- মাধ্যমিকে ইংরেজি ও গণিতের অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার সংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণে বিভিন্ন আইন, পলিসি, কৌশল ও পদক্ষেপ নিয়েছে যা ঝরে পড়া রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৯০
- সবার জন্য শিক্ষা জাতীয় পরিকল্পনা কার্যক্রম এক ও দুই (১৯৯২-২০০০, ২০০৩-১৫)
- জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি-২০০৬
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪
- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫-২০২০
- রূপকল্প/পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১১-২০২১

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০)-এ ঝরে পড়া সমস্যার সমাধানে উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

- দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।
- স্কুলের পরিবেশ আকষর্ণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলা। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মমত্ব ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরুপে বিলুপ্ত করা হবে।
- দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীন সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।
- পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের হোস্টলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হবে।
- হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকায় বিদ্যালয়ের সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহ পরিবর্তন করা সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনভাবে উত্তক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।
- বর্তমান পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণি শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণি শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

ঝরে পড়া রোধে করণীয়

- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের আবার শিক্ষার কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় 'আনন্দ স্কুল' কাজ করছে। এর বাইরে কর্মজীবী শিক্ষার্থীদের জন্যও আলাদা কাজ চলছে।
- ঝরে পড়া রোধের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে শিশুকে আনন্দদায়ক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষাকে বিনোদনমূলক করা গেলে তার পক্ষে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা বা লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া অসম্ভব হবে। সরকার শিশুশ্রেণীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উপকরণের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট দূর করতে হবে যাতে শিক্ষকগণ পরিকল্পনামাফিক ক্লাস নিতে পারে।
- স্কুলগামী দরিদ্র্য পরিবারের সন্তানদের সরকারিভাবে এক সন্তানের জন্য ১০০ টাকা, দুই সন্তানের জন্য ১২৫ টাকা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে বিচার করলে এই বরাদ্দ অপ্রতুল। প্রকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে দ্রব্যমূল্যের বিবেচনা করে অর্থ সহায়তা দিতে হবে।
- স্কুলে যেসব দরিদ্রের সন্তান নিয়মিত স্কুলে যায়, তাদের বিশেষ কোটায় সাহায্য দেয়া যেতে পারে। দুপুরের খাবার একনাগাড়ে একই বিস্কুট না দিয়ে খাবারের পরিবর্তন এবং টার্গেট এলাকার সম্প্রসারণ জরুরি।
- শিক্ষাখাতে বাজেট বাড়াতে হবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংক এক প্রতিবেদনে ঝরে পড়া রোধে কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। এতে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আরো বেশি সময় স্কুলে ধরে রাখার উপর জোর দিতে হবে। এদের মধ্যে প্রণোদনা সৃষ্টি করতে পারলে তা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। প্রতিটি শিশু যাতে শিক্ষণের আওতায় এসে একটি মজবুত ভিত গড়ে তুলতে পারে সে জন্য উদ্যোগ ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। আর এটি করতে হলে প্রয়োজন লক্ষ্যমুখী পরিকল্পনা। যে সব শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বস্তিবাসী, প্রতিবন্ধী এবং শিক্ষণে প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুরা। এছাড়া উচ্চশিক্ষাকে সুলভ করে তোলার উপায় বের করতে পারলে তা আরো নাগালের মধ্যে চলে আসবে।

শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ার ব্যাপকতা না কমলেও অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে আগের তুলনায় বেশ আগ্রহী। অভিভাবকরা দরিদ্র হলেও তাদের সন্তানকে শত কষ্টের বিনিময়েও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করাতে চান। নানা প্রতিবন্ধকতায় জন্য সে আলো যাতে নিভে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষালাভের পথে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো দূর করার মধ্য দিয়েই ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব।

গুণগত শিক্ষা

শিক্ষা হল পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার। কোন জাতি কত উন্নত তা নির্ভর করে ঐ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর। যে দেশের শিক্ষা যত উন্নত সে জাতি তত উন্নত। সে দেশের জনশক্তি তত দক্ষ। বাংলাদেশকে একটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে একটি স্থিতিশীল কল্যাণমুখী উন্নত রাষ্ট্রে পরিণিত করতে হলে জনশক্তি উন্নয়ন অপরিহার্য। এজন্য শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন করা আবশ্যক। এলক্ষ্যে শিক্ষার পরিমানগত দিকের চেয়ে গুণগত মানের দিকের অধিক নজর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। গুনগত শিক্ষা একুশ শতকের একটি অন্যতম চাওয়া।

গুণগত শিক্ষার ধারণা

সাধারণভাবে গুণগত শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়ন করা যায়। গুণগত শিক্ষার ধারণা দিয়ে জাতিসংঘের শিক্ষা বিভাগে বলা হয়-æObtaining a quality education is the foundation to improving people's lives and sustainable development"। অর্থ্যাৎ মানুষের জীবন মানের উন্নতি এবং টেকসই উন্নয়ন সাধন করা হল গুণগত শিক্ষা। একারণে যেকোন শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। অনেকে মনে করেন শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করা আর হিসাব-নিকাশ করতে পারাই গুণগত শিক্ষা। কিন্তু টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিকোন থেকে এই ধারণা সংকীর্ণ ও পুরাতন।

গুণগত শিক্ষা এমন কোন ব্যবস্থা নয় যা শুধু শিক্ষার্থীদের মাঝে বিষয়বস্তুর বিস্তরণ ঘটাবে এবং তাদের লিখতে-পড়তে শিখাবে। বরং এটি একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হল সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যেন শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে উঠে। তাই শিক্ষায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন প্রতিটি শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং স্কুলের লব্ধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের জন্য উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

যে শিক্ষা সমাজের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে তাই গুণগত শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব **বান কি মুনের** উক্তিটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন-æEducation must fully assume its central role in helping people to forgemore just, peaceful and tolerant societies".একটি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল সমাজ গঠনে মানসম্মত শিক্ষার বিশেষ

ভূমিকা রয়েছে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র বা বিশ্বের চাহিদা পূরণ সহায়ক হবে এবং প্রতিটি মানুষ বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠবে। এখানে উপকার ভোগীদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ বেরি (Bayer) বলেন- "Quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of the customers in the process and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process on the outputs from the process of educating''.

গুণগত শিক্ষায় শিশুর মানসিক বিকাশের সাথে জ্ঞানের বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে লক্ষ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর স্মৃতি শক্তির উপর গুরুত্ব না দিয়ে বৌদ্ধিক বিকাশের প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কত নাম্বর পেয়েছে, প্রতি মিনিটে কতগুলো শব্দ পড়তে পারে বা কোন বিষয় কত ভালভাবে মুখস্ত করতে পেরেছে গুণগত শিক্ষায় এ ধরনের পরিমাণগত দিকগুলো বিবেচনা করা হয় না। বরং এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করা হয়-কোন পরীক্ষার জন্য নয়। কোন রূপ বৈষম্য ছাড়াই শিশুর সুষম বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুর বিকাশে গুরুত্ব দিয়ে ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development)-এ বলা হয়েছে-æA quality education is one that focuses on the whole child-the social, emotional, mental, physical, and cognitive development of each student regardless of gender, race, ethnicity, socioeconomic status, or geographic location. It prepares the child for life, not just for testing".

গুণগত শিক্ষা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান থাকবে। প্রতিটি শিশু একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে, উন্নত জীবনের চর্চা করবে। শিখন পরিবেশ হবে ভীতিহীন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিখন-শেখানো কাজে অংশগ্রহণ করবে ওউচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজের কাজের সম্পৃক্ত হতে শিখবে। যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের সংস্পর্শে শিক্ষার্থীরা আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে। তারা কর্মজীবনের জন্য তৈরি হবে এবং বৈশ্বিক পরিবেশে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।
গুণগত শিক্ষা হবে একীভূত যেখানে সকল ধরণের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। এখানে সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে অতি মেধাবী, ক্ষীণ বুদ্ধি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী, পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, দলিত জনগোষ্ঠি যেমন পড়তে পারবে তেমনি বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন পরিচালিত হবে।
গুণগত শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে না বরং সমাজে শান্তি ও টেকসই উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে শিখবে। এখানে শিক্ষার্থীরা কী শিখছে তা মূল্যায়নের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে ও স্কুলে কী কী শিখন অভিজ্ঞতার অর্জন করছে সেগুলোও বিবেচনা করতে হয়। এসকল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অধিকতর যোগ্য ও দক্ষ হবে ও বহুমাত্রিক জ্ঞান লাভ করবে। একারণে স্কুল ও তার চারপাশের শিখন পরিবেশের মূল আগ্রহের বিষয় হল শিক্ষার্থীর শিখন। এখানে শিক্ষার্থীরা যথাযথ জ্ঞান, প্রায়োগিক দক্ষতা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের মাধ্যমে বিকশিত হতে শিখবে। এ প্রসঙ্গে বার্নাড (১৯৯৯) গুণগত শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়ে বলেন- "In all aspects of the school and its surrounding education community, the rights of the whole child, and all children, to survival, protection,development and participation are at the center. This means that the focus is on learning which strengthens the capacities of children to act progressively on their own behalf through the acquisition of relevant knowledge, useful skills and appropriate attitudes; and which creates for children, and helps them create for themselves and others, places of safety, security and healthy interaction".

ইউনিসেফের (২০০০) মতে, গুণগত শিক্ষা তখনই ঘটে যখন প্রতিটি শিক্ষার্থী সুস্থ ও শিখতে আগ্রহী হয়; শিক্ষার পরিবেশ হয় স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ, জেন্ডার সংবেদনশীল এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন; শিক্ষার বিষয়বস্তু কারিকুলামের আলোকে প্রণীত হয় এবং পর্যাপ্ত উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে মৌলিক স্বাক্ষরতা, হিসাব-নিকাশ দক্ষতা ও জীবন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ঘটে; জেন্ডার, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এইআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও শান্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়; প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা হবে যথাযথ যা শিখনে সাহায্য করে এবং শিক্ষায় বৈষম্য কমিয়ে আনে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ হয়ে জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষা মান বাড়ানোর জন্য ২০০০ খ্রি. জাতিসংঘ *মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল* বা সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে টেকসই রূপদানে লক্ষ্যে ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে *টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা* (এসডিজি) ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণাপত্রের ৪নং লক্ষ্যে গুণগত শিক্ষার বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে- To Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning.

আবার ইউনেস্কো (১৯৯৬) ঘোষিত **দেলর** কমিশনের Learning: The Treasure Within (শিখনঃ অর্ন্তনিহিত সম্পদ) রিপোর্টে শিক্ষার চার স্তম্ভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারটি স্তম্ভের সাথে গুণগত শিক্ষার ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো হল-

১) জানতে শেখা (learning to know)ঃ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য জানার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করবে। জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে।

২) করতে শেখা (learning to do)ঃ শিক্ষালাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলার যোগ্যতা লাভ করবে এবং সামাজিক কার্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে শিখবে।

৩) মিলেমিশে থাকতে শেখা (Learning to live together)ঃ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখতে শিখবে। অন্যের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করতে শিখবে এবং সকলে মিশে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজে গঠন করতে শিখবে।

৪) বিকশিত হওয়ার জন্য শিক্ষা (Learning to be)ঃ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে জানতে শিখবে। নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভাগুলো বিকশিত করতে শিখবে। মানুষের সামাজিক, আবেগিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে শিক্ষা ভূমিকা পালন করবে।

গুণগত শিক্ষা কাঠামোবদ্ধ ধারণা নয়। এটি জীবনব্যাপী ও বহুমাত্রিক শিক্ষা। এই শিক্ষায় প্রতিটি মানুষ জীবনের জন্য জানতে শিখবে, করতে শিখবে, মিলেমিশে বসবাস করতে শিখবে এবং নিজের বিকশিত করতে শিখবে। এরূপ শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বের জন্য নিজেকে একজন প্রজ্ঞাবান, মানবিক, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

গুণগত শিক্ষার উপাদান

গুণগত শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া যেখানে রয়েছে বিভিন্ন রকমের উপাদান। এই উপাদানগুলোর গুণগত মানের ওপর গুণগত শিক্ষা প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। কোন একটি মানসম্মত উপাদান সরবরাহ করলেই সমগ্র প্রক্রিয়া গুণগত হয়ে যাবে এমন নয়। এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি উপাদান যথাসম্ভব মানসম্মত হতে হবে। এ উপাদানগুলো হল-

- মানসম্মত শিক্ষকের পর্যাপ্ততা;
- যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন;
- মানসম্মত শিখন সামগ্রী ব্যবহার;
- শিখন-শেখানো পদ্ধতির ও কৌশলের কার্যকর ব্যবহার;
- নিরাপদ ও সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ;
- উপযুক্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা;
- প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক,কর্মকর্তার ও কর্মচারীর সুসম্পর্ক;
- শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধা;

শিক্ষার গুণগত মানন্নোয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি

বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এসকল উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। এমন কিছু উদ্যোগ বা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-

- প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-পিইডিপি-১ (১৯৯৭)
- দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-পিইডিপি-২ (২০০৫)
- মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-এসইডিপি (১৯৯০)
- ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট-এসএসএপি (১৯৯৪)
- প্রোগ্রাম ফর মোটিভেট, ট্রেইন এন্ড এমপ্লয় ফিমেল টিচার ইন রুরাল সেকেন্ডারি স্কুল-প্রোমোট (১৯৯৭)
- মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প-এসইএসডিপি (১৯৯৮)
- ফিমেল স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট-ফিএসএসএপিঃ দ্বিতীয় পর্যায় (২০০১)
- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট-টিকিউআই সেপ (২০০৫)
- সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (২০০৮)
- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্টঃ দ্বিতীয় পর্যায়(২০১২)
- হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-হেকেপ

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা

একুশ শতকের বিশ্বে গুণগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তবে এই শিক্ষা প্রদানে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হল-

- মানসম্মত শিক্ষকের অভাব
- শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা
- শিক্ষার সাথে কর্মের দুরত্ব
- ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা
- শিক্ষা বাজেটের অপ্রতুলতা
- শিক্ষাঙ্গনে অপরাজনীতির বিস্তার
- প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার
- অপর্যাপ্ত অবকাঠামো

এসকল প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে গুণগত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তখন শিক্ষা হবে গুণগত ও টেকসই। সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা অপরিহার্য উপাদানগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। একুশ শতকের পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন বহুমূখী। বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার জীবনকে করছে সহজ ও সুন্দর আবার সৃষ্টি করছে নানা রকম সংকট। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার ফলে প্রযুক্তি নির্ভর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল কাজের জন্য প্রয়োজন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিবর্তন মোকাবেলায় জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রয়োজন।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের (শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক) প্রধান উদ্যোগসমূহ-

- মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি পূর্ণঃপ্রতিষ্ঠা।
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদান মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ;
- মাদ্রাসা এবং কারিগরিসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বছরের ১ম দিনে বই বিতরণ;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম আধুনিকায়ন;
- বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর সুবিধা এবাং কল্যাণ ফান্ড প্রদান;
- ২৯টি বিদেশি ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২০০০০ কম্পিউটার বিতরণ;
- ২৩ হাজার ৩৩১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন
- মাধ্যমিক পযায়ের শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

পরিবর্তনশীল বিশ্বের এসকল সংকট মোকাবেলার জন্য আরো প্রয়োজন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতার অর্জন এবং মানবিকতার উন্নয়ন যা শুধু পরিমানগত শিক্ষা দিয়ে দূর করা সম্ভব নয়। তাই নতুন প্রজন্মকে গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও মানবিকতা উন্নয়ন ঘটিয়ে আগামী দিনের জন্য প্রস্তত করতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জেন্ডার বলতে কী বুঝায়?
২. জেন্ডার সমতা ও সাম্যতা কী?
৩. বিশেষচাহিদাসম্পন্নশিক্ষার্থী বলতেকী বোঝায়?
৪. বিশেষচাহিদাসম্পন্নশিক্ষার্থী কীভাবেচিহ্নিতকরাযায়?
৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরধারণাদিন।
৬. মাতৃভাষাভিত্তিকবহুভাষিকশিক্ষাসুবিধাগুলোলিখুন।
৭. জাতীয়শিক্ষানীতি ২০১০ এ উল্লখিতপথশিশুজন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোলিখুন।
৮. শিশু ও পথশিশুকারা?
৯. ‘ঝরেপড়া’শব্দযুগলব্যাখ্যাকরুন।
১০. ঝরেপড়ারফ্যাক্টরগুলোলিখুন।
১১. বাংলাদেশে ঝরেপড়া রোধে গৃহীত উদ্যোগগুলোলিখুন।
১২. গুণগতশিক্ষারধারণাব্যাখ্যাকরুন?
১৩. টেকসইউন্নয়ন লক্ষ্য(এসডিজি) -৪ ব্যাখ্যাকরুন।
১৪. ‘গুণগতশিক্ষায় গুণগতশিখন ঘটে’ ব্যাখ্যাকরুন।

রচনামূলকপ্রশ্ন

১. জেন্ডার, জেন্ডার সমতা ও সাম্যতা কী ব্যাখ্যা করুন।
২. বিদ্যালয়ে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার উপায়গুলো বিশ্লেষণ করুন।
৩. বিশেষচাহিদাসম্পন্নশিক্ষার্থীর শিখনচাহিদাপূরণেএকজনশিক্ষকের করণীয়দিকগুলোউল্লেখ করুন।
৪. বিশেষচাহিদাসম্পন্নশিক্ষার্থীদেরমূলধারায়রাখারজন্য শিক্ষাব্যবস্থায়কীকী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন- আপনারসুচিন্তিত মতামতদিন।
৫. বিভিন্নজাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরশিক্ষাঅধিকারসম্পর্কে আলোচনাকরুন।
৬. সাধারণশিক্ষার্থীর তুলনায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিরশিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকারকারণগুলোবিশ্লেষণ করুন।
৭. ‘সর্বস্তরেমাতৃভাষাভিত্তিকবহুভাষিকশিক্ষাপ্রচলনকরা প্রয়োজন’-উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
৮. পথশিশুদেরশিক্ষা প্রদানেকীকী উদ্যোগগ্রহণকরা যেতেপারেআলোচনাকরুন।
৯. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ঝরেপড়ারসামাজিক-সাংস্কৃতিকদিকগুলোবিশ্লেষণ করুন।
১০. শিক্ষারবিভিন্ন স্তরেঝরেপড়ারকারণ আর্থ-সামাজিকঅবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করুন।
১১. ঝরেপড়াসমস্যাসমাধানে শিক্ষানীতি-২০১০ এ উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোসম্পর্কে মতামতদিন।
১২. ইউনেস্কো ঘোষিত দেলরকমিশনেরLearning: The Treasure Within রিপোর্টেরআলোকে গুণগতশিক্ষারসম্পর্ক বিশ্লেষণকরুন।
১৩. গুণগতশিক্ষাউপাদানগুলোআলোচনাকরুন।
১৪. ‘গুণগতশিক্ষায়শিক্ষার্থী জীবনেরজন্য প্রস্তুতহয়পরীক্ষারজন্য নয়’-উক্তিটি বিশ্লেষণকরুন।

গ্রন্থপঞ্জি

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, এনসিটিবি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ ,ঢাকা, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট, ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মাসুদা আহমেদ, মোঃ আব্দুস সামাদ, "মাধ্যমিক শিক্ষা" সামাদ পাবলিকেশন এন্ড রিচার্স, ১৯৯৮

ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া, ড.এম.এ ওহাব, "মাধ্যমিক শিক্ষা" মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ডি.এম. ফিরোজ শাহ্, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০০৬।

ড. ডি.এম. ফিরোজ শাহ্, মাধ্যমিক শিক্ষা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০১৭

ড. ডি.এম. ফিরোজ শাহ্, জেন্ডার স্টাডিজ, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০১২

ডি.এম. ফিরোজ শাহ্, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানও নির্দেশনা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০০৪

ড. ডি.এম. ফিরোজ শাহ্, একীভূত শিক্ষা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০১৭

ড. আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা,

বিষ্ণুপদ নন্দ, সারওয়াতারা জামান, ব্যতিক্রমধর্মী শিশু,

জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার সামগ্রী, ষষ্ঠ- দশম শ্রেণি, এনসিটিবি,ঢাকা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, ড. ফজলুর রহমান, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা,২০১৭

ওয়েবসাইট ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়

Annual Primary School Census – 2015

Adam, W. (1941). *Report on the state of Education in Bengal, 1835 and 1838*. Edited by AnathNathBasu.Calcutta: Calcutta University.

Bangladesh Bureau of Statistics (2009).*Statistical Pocket Book Bangladesh-2009.*Dhaka: BBS.

Bangladesh Bureau of Statistics (2003). *Report on National Child Labour Survey 2002-2003'*. Dhaka: BBS.

Benson, C. (2005).*Girls, Educational Equity and Mother Tongue-based Teaching*. Bangkok: UNESCO Bangkok.

Baldwin, B., Moffett, R., & Lane, K. (1992). The high schooldropout: Antecedents, societal consequences and alternatives.*Journal of School Leadership, 2,* 355-362.

Convention on the Rights of the Child,1989

Chapman, C., Laird, J., &KewalRamani, A. (2010). *Trends inhigh school dropout and completion rates in the United States: 1972–2008*. Retrieved from http://0-nces.ed.gov.opac.acc.msmc.edu/pubs2011/2011012.pdf

Dakar Conference 2000

Education for All 1990

'Estimation of the Size of Street Children and their Projection for Major Urban Areas of Bangladesh 2005' commissioned to BIDS by ARISE, Cited from UNICEF 2009

Education Scenario in Bangladesh: Gender Perspective 2017

EmploymentGovernment of the People's Republic of Bangladesh March 2010

UNICEF (2009).*Protection of Children Living on the Street.*Dhaka: UNICEF Bangladesh.

Fuller, R. (1927). *Fourteen is too early: Some psychological aspectsof school-leaving and child labor*. New York, NY: NationalChild Labor Committee.

Directorate of Primary Education (2009).*Bangladesh Primary Education Annual SectorPerformance Report.*Dhaka: Directorate of Primary Education, Government of Bangladesh.

Jordan, W. J., Lara, J., &McPartland, J. M. (1994). *Exploring thecomplexity of early dropout causal structures*. Baltimore, MD:Center for Research on Effective Schooling for DisadvantagedStudents, The John Hopkins University.

Keay, F. E. (1959). *A History of Education in India and Pakistan*. 3rd Ed.Calcutta: Oxford University Press.

Miah, G. R. (1982). *Historical study of the Development of Science Education in Bangladesh*. Ph.D Thesis. Hiroshima Univeristy, Japan.

Malone, S. (2005). *Advocacy Toolkit on Multilingual Education Booklet for Programme Implementers*. Draft. Prepared for the Multilingual Advisory Committee National Constitution.

Nurullah, S.,&Naikj J.P. (1951). *A History of Educaiton in India*.Bombay: Macmillian and Company Ltd.

National Children policy-2011

National Child Labour Elimination Policy 2010 ,Ministry of Labour and

Proposal for Setting up of an Integrated Apex Body on Teacher Education, TQI-SEP,p.3,2007.

UN Sub-Group on Indigenous Children and Young People (ISG) (2006). æIndigenous Children: Rights and Reality – a report on indigenous children and the U.N. Convention on the Rights of the Child" Prepared to assist the UN Committee on the Rights of the Child in the development of a General Comment on the topic. Ottawa: First Nations Child and Family Caring Society of Canada

UNICEF (2006). *Multilingual Education in Bangladesh*. Report of the Symposium on Multilingual Education5-7 June 2005, Dhaka, Bangladesh.

UN Convention on the Rights of the Child, General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 http://www.crin.org/docs/resources/treaties/uncrc.asp, cited 18 December 2006

United national convention on children rights policy-1989

Vakil K.S. (1954).*Educaiton in India*.Kucknow: T.C.E Journals and Publications ltd.

World Bank. (2005). *Education Notes: In Their Own Language,,Education for All*. Retrieved May 15, 2011, from

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/Education-Notes/EdNotes_Lang_of_Instruct.pdf

Watt, D., &Roessingh, H. (1994). Some you win, most you lose:Tracking ESL dropout in high school (1988-1993). *EnglishQuarterly, 26*, 5-7.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/drop-out